পরমার্থ প্রসঙ্গে

মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ

প্রথম খণ্ড I - Vol I

Parmarth - e - Pransangee
by Pandit Gopi Nath
Kaviraj

বাণী সঞ্চয়ন ও সংকলন
শ্রীজগদীশ্বর পাল

পরমার্থ প্রসঙ্গে

মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ

প্রথম খণ্ড

বাণী সঞ্চয়ন ও সংকলন
শ্রীজগদীশ্বর পাল

[illegible]

পশ্যন্তী প্রকাশনী
ক লি কা তা - ৩

প্রকাশক
শ্রীজগদীশ্বর পাল
১০, গ্যালিফ স্ট্রীট
(সুইট নং ১৩, ব্লক নং ১)
কলিকাতা-৭০০০০৩

প্রথম প্রকাশ : উত্তরায়ণ সংক্রান্তি, ১৩৮৪
দ্বিতীয় প্রকাশ : রাসপূর্ণিমা, ১৩৯০
মূল্য : ১০.০০ মাত্র

— প্রাপ্তিস্থান —

১। মহেশ লাইব্রেরী
২।১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩

২। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার
৩৮, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

মুদ্রক
শ্রীমিহিরকুমার মুখোপাধ্যায়
টেম্পল প্রেস
২, ন্যায়রত্ন লেন
কলিকাতা-৭০০০০৪

পরমার্থ প্রসঙ্গে

মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ

নিবেদন

তিনি চলে গিয়েছেন কিন্তু রেখে গিয়েছেন তাঁর শাশ্বত বাণী। গঙ্গার পাবনী ধারার মত অবিকল নির্মল তা'র প্রবাহ বয়ে যেত বারাণসীর পুণ্য ক্ষেত্রে। তা'রই কিছু মঙ্গল-কলসে পূর্ণ ক'রে ঘরে তুলে আনতেন নানা জ্ঞানার্থী, বিদ্যার্থী, পরমার্থী পান্থ। বন্ধুবর শ্রীজগদীশ্বর পাল এ বিষয়ে সবচেয়ে তৎপর ছিলেন ঃ কখনও টেপ্-রেকর্ডারে, কখনও শ্রুতি-লিখনে তাঁর নানা বাণী ধরে রাখতেন এবং নানাভাবে নিজেও প্রশ্ন ক'রে আচার্যদেব অর্থাৎ তাঁর গুরুজির কাছ থেকে পথের নির্দেশ চাইতেন, তত্ত্বে প্রবেশের প্রয়াস করতেন। সে-পথে যাঁরাই চলতে চা'ন, তাঁদের অনেকেরই মনে এ জাতীয় প্রশ্ন ওঠে অথচ সমাধান মেলে না। তত্ত্বদ্রষ্টা আচার্যের কাছে যে সব উপদেশ লাভ করেছেন, জগদীশ্বরবাবু তাই স্বার্থবুদ্ধিপ্রণোদিত হ'য়ে কৃপণের মত শুধু নিজের প্রয়োজনে তা' ধরে না রেখে সকলের জন্য বিলিয়ে দিতে তৎপর হ'য়েছেন। এতে যে অনেকের প্রভূত উপকার হ'বে তা'তে সন্দেহ নেই।

এই সংকলনের প্রধান অংশটি জুড়ে আছে কথোপকথনের ছলে প্রশ্নোত্তরের ভঙ্গীতে আচার্যদেবের নানা উপদেশ এবং শেষের দিকে আছে কোনো কোনো বিশিষ্ট তত্ত্ব, যেমন গায়ত্রী, কালী, ওঁকার ইত্যাদি অথবা কৃপা ও কর্মের সম্বন্ধ, শক্তির বিকাশক্রম, আত্মার পূর্ণস্থিতি, পূর্ণ প্রাপ্তির উপায় ইত্যাদি বিষয়ের ওপর তাঁর বিস্তৃত ও সুচিন্তিত মন্তব্য। শঙ্করাচার্যকৃত দক্ষিণামূর্তি স্তোত্রের একটি বিশদ বিশ্লেষণও তিনি একসময়ে করেছিলেন, তা-ও সংযোজিত হ'য়েছে এই সংকলনে। উপসংহারে তিনি যে অতিযোগ বা বিশ্ব-যোগের অভিনব ভাবনায় বিভোর ছিলেন, তা'র সামান্য আভাস তাঁর মুখ থেকে শোনা উপদেশের মাধ্যমে তুলে ধরা হ'য়েছে। তাঁর এই নিখিল জীবের মুক্তির স্বপ্ন অনেকের কাছে অবাস্তব বা অসম্ভব কল্পনা মনে হ'তে পারে কিন্তু প্রাচীনকালের বুদ্ধদেব থেকে আরম্ভ ক'রে আজকের যুগের শ্রীঅরবিন্দ পর্যন্ত নানা অবতার ও মহাপুরুষদের ভাবনায় বা বেদান্তের সর্বমুক্তির কল্পনায় এটি স্থান পেয়েছে, যদিও তা'র পরিপূর্ণ ছবি আচার্যদেব যেভাবে এঁকে গিয়েছেন, এমনটি অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। তবে এটি ধারণা করা একান্ত দুরূহ।

এই সংকলনে তাই একই সঙ্গে কঠিন ও কোমল, দুরূহ ও সরল উপদেশের সমাবেশ ঘটেছে। যাঁর যেমন প্রয়োজন, রুচি বা আগ্রহ, তিনি সেইমত এর থেকে বেছে নিয়ে তা'র সদুপযোগ করবেন। সেইখানেই এই সংকলন প্রকাশের সার্থকতা।

এর দ্বারা পরমার্থ-পথের পথিকদের সার্বিক কল্যাণ সংসাধিত হোক—এই প্রার্থনা।

উত্তরায়ণ সংক্রান্তি
১৩৮৪ বঙ্গাব্দ

শ্রীগোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়

মঃ মঃ গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের বাংলাভাষায়
প্রকাশিত পুস্তকের তালিকা ঃ—

১। পত্রাবলী (১ম ভাগ)
২। তান্ত্রিক সাধনা ও সিধান্ত (১ম ও ২য় খণ্ড)
৩। শ্রীকৃষ্ণপ্রসঙ্গ
৪। সাধুসঙ্গ ও সৎপ্রসঙ্গ (১ম ও ২য় ভাগ)
৫। সাহিত্যচিন্তা
৬। ভারতীয় সাধনার ধারা
৭। তন্ত্র ও আগম শাস্ত্রের দিগ্দর্শন
৮। বিশুদ্ধানন্দ প্রসঙ্গ (চার খণ্ড)
৯। বিশুদ্ধ বাক্যামৃত
১০। পূজা
১১। স্বসংবেদন
১২। বিজিজ্ঞাসা
১৩। মৃত্যুবিজ্ঞান ও কর্মরহস্য
১৪। অখণ্ড মহাযোগের পথে

তারিখ—৩।১০।৬৫ সময়ঃ সকাল ১০টা।
কাশীধামঃ বিশুদ্ধানন্দ কানন আশ্রম।

"এখন ভগবানলাভ সহজ হইয়াছে—পূর্ব্বের মত কঠিন নাই। তিনি ধরা দিবার জন্য নীচে নামিয়া আসিয়াছেন। শুধু এখন দরকার আমাদের চোখ মেলিয়া দেখা কিন্তু আমরা চোখ মেলিতে জানি না। এই সত্যকার চোখ মেলার জন্য প্রয়োজন সরল বিশ্বাস তাহাও আমাদের নাই। অর্জ্জুনের বিশ্বরূপদর্শন শ্রীভগবানের বিভূতিদর্শনের মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল—তাঁহার শক্তির অল্পই প্রকাশ করিয়াছিলেন।"

তারিখ—৩।১০।৬৫ সময়ঃ রাত্রি ৮ ঘটিকা।
কাশীধামঃ ২এ, সিগ্‌রা।

একজন ভক্ত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন সরল বিশ্বাস কিসে হয়। উত্তরে আচার্যদেব বলিয়াছিলেন—"প্রয়োজন নিষ্ঠার—প্রয়োজন অভ্যাসের—প্রয়োজন বালকসুলভ সরলতা প্রাপ্ত হওয়ার—যেমন বালককে ভূতের ভয় দেখাইলে সে সেখানে আর যাইতে চাহে না, সত্য সত্যই ভূত বিশেষ স্থানে আছে সরল চিত্তে বিশ্বাস করে।"

তারিখ—৯।১০।৬৫ সময়ঃ সকাল ৯।৩০ মিঃ।
স্থানঃ আচার্যদেবের ঘর 'কাশীধাম।

"সহজ সাধন এবং সম্মুখভাব হচ্ছে আজকের দিনের প্রধান কথা। জীব যখন দুর্বল—তখন সর্বমঙ্গলময় তার কাছ থেকে আর কিছুই চান না। চান শুধু তাঁর প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ। তিনি সম্মুখে উপস্থিত আছেন। আমরা যেন তাঁর প্রতি সামনাসামনি তাকাই। তাঁর সম্মুখ উপস্থিতি যেন আমরা উপলব্ধি করি। তাঁর সম্মুখভাব প্রথমে বুঝিতে হইবে—তারপর উপলব্ধির প্রয়োজন। এই সম্মুখভাব ধরা বড় কঠিন—তাই প্রথমে intellectually ধরিতে হইবে। একটি চক্ষু সব সময় আমাদের দিকে তাকাইয়া আছে। সেই চক্ষুর প্রতি যেন আমরা দৃষ্টিনিক্ষেপ করি। সে দৃষ্টি যে কোন দিক হইতে পারেঃ পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ। আমাদের দৃষ্টিও আসিবে দিব্যদৃষ্টি হইতে তখন সব সময় তাঁকে আমরা দেখিতে পাইব, অনুভব করিতে পারিব—to feel his presence এই দিব্যদৃষ্টিদর্শন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ঘটিয়াছিল ডালহৌসি পাহাড়ে তবে তিনি তাহা বুঝিতে পারেন নাই। রবীন্দ্রনাথ তাঁর পিতৃদেবের এই দৃষ্টির কথা বারে বারে উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি গান রচনায় বলিয়াছেন

"তুমি রয়েছ নয়নে নয়নে।" এই অনুভূতির মাধ্যমে অনন্তময়ের অনন্তসৃষ্টির দ্বার আমাদের নিকটে উন্মুক্ত হইবে। আমরা আনন্দলোকে বিচরণ করিতে পারিব তখন আর আমাদের কোন দুঃখ থাকিবে না—তখন জগজ্জননী আমাদের সমস্ত ভার তুলিয়া লইবেন। কিন্তু তার পূর্বে তিনি দেখিতে চান তাঁর সন্তান তাঁকে পাওয়ার জন্য সচেষ্ট এবং সে চেষ্টায় সে ক্লান্ত। একমাত্র সে অবস্থায় তিনি আবির্ভূত হন সন্তানের সম্মুখে।"

তারিখ—৯।১০।৬৫ সন্ধ্যা ৬ ঘটিকা।
স্থান: সিগ্‌রার বাড়ী, আচার্যদেবের ঘর।

সাধনায় অগ্রগতির পথের ক্রম

"প্রথমে জ্যোতিদর্শন এবং তার পূর্বে দেহাত্মবুদ্ধির লোপ—ইহাকে ব্রহ্মাবস্থা বলে। তারপর জ্যোতির মধ্যে বিন্দু দেখা দেয় এবং বৃত্তের সীমা-রেখা দেখা দেয়—তারপর বিন্দুর মধ্যে মূর্ত্তিপ্রকাশ হয় এবং জ্যোতি ঘনীভূত হয়—ইহাকে পরমাত্মা অবস্থা বলা হয়। তারপর মূর্ত্তি আরও স্পষ্টীকৃত হয় এবং জ্যোতি কমিতে থাকে। ৬৪টি কলার পূর্ণাবস্থায় জ্যোতি থাকে না—পূর্ণাবস্থাপ্রাপ্তি ঘটে। ১ হইতে ৪৯ কলা পর্যন্ত জীবকোটির অবস্থা—৫০ কলায় জীবের শ্রেষ্ঠ অবস্থা। ৫১ হইতে ৫৬ পর্যন্ত পরমাত্মার অবস্থা অর্থাৎ সেখানে মায়া পরমাত্মার অধীন। ৫৬ হইতে ৬০ কলা পর্যন্ত আরও উন্নতি হয় সেখানে মায়া দূরীভূত হয়—৬৪ কলা পূর্ণ হইলে মায়া তিরোহিত হয়। এককথায় বর্ষাকালে পদ্মানদীর কিনারা বহুদূরে দেখা যায় একটি রেখার মত, কিন্তু সমুদ্রের মাঝখান হইতে সমুদ্রের কিনারা একেবারেই দেখা যায় না। সমুদ্রের মাঝখানের অবস্থার সঙ্গে পূর্ণতাপ্রাপ্তি তুলনা করা যাইতে পারে।"

তারিখ—১২।১০।৬৫ সকাল ১০টা।
আচার্যদেবের ঘর: ২এ, সিগ্‌রা, বারাণসী।

ন্যায়বৈশেষিকদের মতে আত্মার ধর্ম শুধু সৎ। চিৎ এবং আনন্দ মনের ধর্ম প্রকৃতির গুণে উহা হয়। সাংখ্যদের মতে আত্মা শুধু সৎ নয় চিৎও বটে—উহা তাঁহার নিত্যধর্ম। বৈদান্তিকদের মতে আত্মা সৎ, চিৎ ও আনন্দময়—উহা তাঁহার নিত্যধর্ম। শৈবদের মতে (বৈষ্ণবদেরও) আত্মা শুধু সৎ, চিৎ, আনন্দময় নহে—ইহা বিশুদ্ধ সত্তা—ইহা অপ্রাকৃত সত্ত্ব—প্রাকৃত সত্ত্ব, রজঃ, তমোগুণের বাহিরে। তাহার ফলে আত্মা চলিষ্ণু লীলার আধার।

শাক্তদের মতে আত্মা শুধু সৎ, চিৎ, আনন্দময় এবং বিশুদ্ধ সত্ত্বময়ই নয় তার সঙ্গে আছে চিৎশক্তি—যে শক্তির ফলে সৎ-চিৎ-আনন্দাবস্থা উপলব্ধি হয়।

ইহাকে শিবশক্তিরূপ বলা হয়। শক্তি ছাড়া শিব শব। এই শিবশক্তি যুগলরূপ ক্রমে একরূপে পরিণত হয়।

তারিখ—১১।১০।৬৫ সন্ধ্যা ৬টা।
আচার্যদেবের ঘরঃ সিগ্‌রা।

"অন্তর্বহির্দৃষ্টি একই দৃষ্টির দুইটি দিক। বহির্দৃষ্টি খণ্ড। অন্তর্দৃষ্টি ব্যাপক—universal। এই অন্তর্দৃষ্টিলাভ হইলে জড়বাদ এবং অধ্যাত্মবাদ বলিয়া পৃথক কিছুই থাকে না। এই অন্তর্দৃষ্টিলাভ তৃতীয় নেত্র দ্বারা সম্ভব হয়। আমরা দুইটি চক্ষু দ্বারা শুধু খণ্ডভাবে দেখিতে অভ্যস্ত। অখণ্ডভাবে দেখিতে গেলে অন্তর্দৃষ্টির প্রয়োজন এবং তাহা তৃতীয়নেত্র সাহায্যে সম্ভব। এই তৃতীয়নেত্রে সরল দৃশ্য গোচর হয়—বর্ত্তমান, ভূত, ভবিষ্যৎ সহজেই ধরা পড়ে। আমাদের বর্ত্তমান দুইটি চক্ষুর দৃষ্টি বক্র এবং সেইহেতু খণ্ড জিনিষ প্রতিভাত হয়।"

তারিখ—১৫।১০।৬৫ সকাল ১০ ঘটিকা।
স্থানঃ সিগ্‌রার বাড়ী, আচার্যদেবের ঘর।

আবরণ দুইটি—জীবাত্মার আবরণ এবং পরমাত্মার আবরণ। জীবাত্মার আবরণ অজ্ঞানের ফল এবং তাহা কাটিয়া গেলে আত্মজ্ঞানলাভ হয়। কিন্তু পরমাত্মালাভ বা ভগবান দর্শন হয় না। সেজন্য প্রয়োজন পরমাত্মার আবরণ অপসারণের। সে আবরণ অপসারিত হয় একমাত্র ভগবানের ইচ্ছায় সেজন্য তাঁহার কৃপার একান্ত প্রয়োজন। তাঁর কৃপা ছাড়া তাঁকে পাবার আর কোন উপায় নাই।

বিরহ মিলনেরই সেতু—বিরহ মিলনকে মধুর করে। দুঃখ, দারিদ্র্য, রোগ, শোক প্রভৃতি জীবনে না থাকিলে আনন্দস্বরূপের উপলব্ধি যথার্থভাবে হয় না—তাই এ সবের প্রয়োজন।

তারিখ—১৫।১০।৬৫ বিকালবেলা।
আচার্যদেবের ঘরঃ সিগ্‌রার বাড়ী।

বেদান্তে আত্মস্বরূপের উপলব্ধি নেতি নেতির মাধ্যমে বলা হইয়াছে অর্থাৎ আত্মা দেহ নয়, মন নয়, বুদ্ধি নয় ইত্যাদি। সব কিছু বাদ দিবার পর যাহা রহিল তাকে আত্মা বলা হইয়াছে। জোরের সঙ্গে আত্মা কি একথা বলা হয় নাই —শুধু বলা হইয়াছে চৈতন্যস্বরূপ। কিন্তু তন্ত্রে আমি কি এবং কে জোরের সঙ্গে বলা হইয়াছে। তন্ত্র হচ্ছে যোগের পথ আর বেদান্ত হচ্ছে বিয়োগের

পথ। বিয়োগের পথে গেলে কৈবল্যপ্রাপ্তি হইতে পারে তাহাতে আত্মা পরমাত্মাতে লয়প্রাপ্ত হয়, কিন্তু পূর্ণ অহন্তার বোধ থাকে না। তাই যোগের পথে সব কিছুর রূপান্তর ঘটে—ছোট অহংকে পূর্ণ অহন্তার সঙ্গে মিল হওয়ার প্রশ্ন থাকে—ইদংরূপের অহংরূপে পরিণত হওয়ার প্রশ্ন থাকে। মায়িক আবরণের ফলে ইদংরূপকেই অহং বলিয়া বোধ হয়। আসলে ইহা মেকি অহং। ইদংভাব থেকে যখন সত্যকার অহংভাব উদয় হয় তখনই তার পূর্ণ প্রকাশ পূর্ণাহন্তায় পরিণত হয়।

তিনিই সব হইয়াছেন ইহার উপর জোর দিতে হইবে। তিনিই পাপী তাপী, তিনিই যোগী। তিনি অন্নে, তিনি বিষ্ঠায়--তিনি সর্বত্র ব্যাপ্ত। এক কথায় তিনিময় এই ব্রহ্মান্ড।

আমাদের বর্ত্তমান দেহ মায়িক দেহ। দীক্ষার পর বৈন্দব (শুদ্ধ) দেহপ্রাপ্তি ঘটে। মায়িক দেহের এবং বৈন্দব দেহের কাজ পাশাপাশি চলিতে থাকে। মায়িক দেহ প্রারব্ধের ফল। প্রারব্ধ শেষ হইলে কর্মশেষ হয় এবং দেহপাত ঘটে। বৈন্দব দেহের কাজের ফলে মোক্ষলাভ অথবা মুক্তি ঘটে। কিন্তু সে মুক্তিকে কৈবল্যপ্রাপ্তি বলা চলে—তাহাতে ভগবানলাভ হয় না। কৈবল্যপ্রাপ্তির পরও যদি ভগবৎলাভের ইচ্ছা জাগরূক থাকে এবং তাঁহার কৃপা পাওয়া যায় তাহা হইলে ভগবৎলাভ হয়।

তারিখ—১৭।১০।৬৫।
আচার্যদেবের ঘরঃ সিগ্‌রার বাড়ী।

প্রারব্ধ কাটিয়া গেলেই দেহপাত ঘটে। বৈন্দব দেহের পূর্ণ প্রকাশ ও বিকাশ এই মায়িক দেহে থাকিতে থাকিতেই হইতে পারে--তখন মায়িক দেহের সঙ্গে বৈন্দব দেহেরও অবস্থান চলে। তবে মায়িক দেহের কাজকর্ম চলে, কেননা প্রারব্ধ রহিয়াছে।

তারিখ—২৪।৭।৬৬ সন্ধ্যা ৬॥০ ঘটিকা।
সিগ্‌রার বাড়ীঃ আচার্যদেবের ঘর।

আচার্যদেব নিজেই প্রশ্ন করিলেন, "বলতো এ দেহে থাকিয়াও এমন কোন জায়গায় স্থিত হইলে যেখান হইতে সব কিছু দেখা যায়, জানা যায়—যেখানে দেহের বন্ধন থাকে না।" আমাদের নীরব দেখিয়া নিজেই উত্তর দিতে সুরু করিলেন—"দেহাত্মবন্ধনই আবরণের কারণ। যতই আমরা intellectually বলি না কেন দেহ আর দেহী এক নয়, তবু আমরা দেহাত্মবন্ধনে আবদ্ধ।

"আজ্ঞাচক্রের উপরে সেই জায়গা যেখান হইতে সব কিছু দেখা যায়। সেই

জানালা দিয়া বাহিরে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে হইবে। সেখানে প্রথমে জ্যোতি, তারপর মণ্ডলাকার এবং তারপর বিন্দু দেখা যাইবে—তারপর জ্যোতি মিলাইয়া গিয়া একটি মূর্ত্তি দেখা যাইবে। সেই মূর্ত্তিকে আমরা গুরু বলিতে পারি—মা বলিতে পারি। আজ্ঞাচক্রের উপরের সেই জানালা দিয়া বাহিরে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলে দেহাত্মবোধ থাকে না। তাই আবরণও কাটে এবং আমরা আসল স্বরূপকে জানিতে পারি। সেই মূর্ত্তিকে আমরা বিগ্রহতত্ত্ব বলিতে পারি। সেই বিগ্রহে আমার লয় ঘটিতে পারে—আমার প্রবেশ হইতে পারে। কিন্তু প্রবেশের পরে আর দুই থাকে না—এক হয়। কিন্তু জীবের পক্ষে দুইয়ের প্রয়োজন আছে আস্বাদনের নিমিত্ত। (সমস্ত সাধনপথের মূলকথা জ্যোতিদর্শন প্রথমে—তারপর সাধনপথে আরও অগ্রসর হইতে হয়)।

"সেই জায়গায় স্থিতি হইলে দেহের বন্ধন থাকে না বটে কিন্তু চেতনা থাকে—বিশুদ্ধ চৈতন্য। সেই অবস্থায় মনে হয় বিশ্ব জ্যোতিসাগরে ভাসমান। তখন কাল থাকে না—ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান থাকে না। তখন দেহ ব্রাহ্মণদেহ কিংবা ক্ষত্রিয়দেহ মনে হয় না—তখন সবাইয়ের সঙ্গে একাত্মতা প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন কালগণ্ডির বেড়াজাল এবং জাতিভেদ থাকে না।"

তারিখ—২৮।৭।৬৬।

আচার্যদেব উপরিল্লিখিত আলোচনাপ্রসঙ্গে বিসর্গকে (ঃ) দুই বিন্দু বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। জ্যোতির মধ্যে মণ্ডল ফুটিয়া ওঠে, মণ্ডলের মধ্যে বিন্দু বা সার বিগ্রহ। এই বিন্দুই হচ্ছেন পরমেশ্বর। যখন জীব ঐ বিন্দুর দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া তাঁহার সহিত যোগসৃষ্টি করিতেছে তখন স্বয়ং তিনি নীচে জীবের মণ্ডলের মধ্যকার বিন্দু অবলোকন করিতেছেন। জীবের মণ্ডল হইতেছে অন্ধকারের এবং সেই মণ্ডলে জীব বিন্দুরূপে উপস্থিত। এই অবলোকনের মাধ্যমেই জীবের পক্ষে কৃপা পাওয়া সম্ভব এবং তাঁহার সঙ্গে পূর্ণযোগ স্থাপিত হয়। ইহার পূর্বে যাহা থাকে, তাহা দ্রষ্টার অবলোকন। এই যোগ স্থাপিত হওয়ার পর তাঁর ইচ্ছাই জীবের ইচ্ছায় পরিণত হয়। জীব তখন যাহা ইচ্ছা করে তাহাই পাইতে পারে কিন্তু জীবের স্বতন্ত্র ইচ্ছা বলিয়া কিছুই থাকে না।

তারিখ—২৬।১০।৬৬ সকাল ১০৷৷০ ঘটিকা।

আচার্যদেবের ঘরঃ সিগ্‌রা।

শ্রীঅরবিন্দের দর্শন সম্বন্ধে আলোচনাপ্রসঙ্গে বলিলেন "Descent-এর কথা বলিতে গেলে পূর্বে ascent-এর কথা ভাবিতে হয়। Ascent না করিলে

descent কিভাবে হইবে। প্রথমে নিজেকে সত্তার স্বরূপ জানিতে হইবে। স্বরূপের সঙ্গে একাত্মতার পর ক্ষমতার অধিকারী হওয়া যায়। এই power বিয়োগের মাধ্যমে আসে না—যোগের মাধ্যমে আসে—মন্দের ত্যাগ নয়, মন্দের রূপান্তরের মাধ্যমে।" উদাহরণস্বরূপ বলিলেন, "গরম জল এবং ঠাণ্ডা জলের সংমিশ্রণের পর (অবশ্য proportion রাখিয়া) ঢাল উবুড় করিতে করিতে ঈষৎ উষ্ণ হয়। আলো এবং অন্ধকারের মিলন হয় ভোরবেলায় এবং সন্ধ্যায়। সেই অবস্থায় স্থিতি হইলে ক্ষমতায় আসীন হওয়া যায়। সাংখ্য অথবা বেদান্তের পথ বিয়োগের পথ, সেখানে ভালকে গ্রহণ এবং খারাপকে ত্যাগ করিতে হয়। তার ফলে নির্বাণ হয় বটে কিন্তু লোককল্যাণের শক্তি থাকে না। একথা সত্য এই নির্বাণের মাধ্যমে ব্যক্তির সুবিধা হয় কিন্তু সমষ্টির বা অন্যের কোন লাভ হয় না—সে মুক্তির বা নির্বাণের সে ভাগীদার হয় না। এক অর্থে এই পথ স্বার্থপরতার পথ। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দের integral যোগের পথ মন্দকে ত্যাগ করিয়া নয়, মন্দকে রূপান্তর করিয়া। আমার টাকা থাকিলে আমি তাহা অন্যকে দান করিতে পারি। কিন্তু আমার যদি কিছুই না থাকে তাহা হইলে অন্যকে দেবার প্রশ্ন আসে না। তাই সাধনপথে গন্তব্যস্থলে পৌঁছিয়া অন্যকে পথ দেখানো চলে তার পূর্বে নয়। (এই পথ দেখানোর সময় অন্য সাধককে বা শিষ্যকে পথপ্রদর্শকের যে পাথেয় অর্থাৎ তিনি যে পর্যন্ত গৃহ নির্মাণ করিয়াছিলেন সেই নির্মিত গৃহ শিষ্যকে দিতে হয়। শিষ্য তাহার উপর নির্মাণ-কার্য্য সুরু করে)। অখণ্ড স্বরূপের দর্শনের পর হইতেই হোক্ অথবা আত্মস্বরূপের দর্শনের পর সত্যকার স্বরূপের শক্তি লাভ করা যায়। তাই ascent পূর্বে, পরে descent। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ভাষায় লোককল্যাণের পূর্বে, শক্তির চাপরাশ চাই অর্থাৎ আত্মস্বরূপ দর্শন চাই। স্বরূপের সঙ্গে একাত্মতার পর মায়িক দেহ চিন্ময় দেহে পরিণত হইতে পারে এবং তখন যতদিন খুসী দেহ রাখা চলে এবং জগতের কল্যাণ করা চলে। বর্ত্তমানে বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে আসুরিক ক্ষমতা মানুষের হস্তগত হইয়াছে এবং তাহা ধ্বংসের কার্য্যে ব্যবহৃত হচ্ছে—স্বরূপের সঙ্গে যোগাযোগ হইলে লোক-কল্যাণের কার্য্যে তাহা ব্যবহৃত হইতে পারে। সত্যিকারের প্রেম ভালবাসা না জন্মাইলে লোককলাণ সম্ভব নয়।

তারিখ—২৬।১০।৬৬ সময় বিকাল ৪৷৷০ ঘটিকা।
স্থান: সিগ্রার বাড়ী, আচার্যদেবের ঘর।

কলিকাতার মলয় কুমার চক্রবর্ত্তীর এক প্রশ্নের উত্তরপ্রসঙ্গে বলিলেন, "বিন্দু বুঝা খুবই কঠিন।" তারপর ভূমিকাস্বরূপ বলিলেন, "স্বরূপসত্তাকে

আমরা যে কোন নামে অভিহিত করিতে পারি--ভগবান, পরাশক্তি ইত্যাদি। তিনি অখণ্ড মহাপ্রকাশ পরমজ্যোতিস্বরূপ—শিবশক্তির সাম্মিলিত রূপ। ইহা অব্যক্ত অবস্থা—সৃষ্টির অতীত অবস্থা। যখন ভগবান সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করেন তখন শক্তির এক কণাকে পৃথক করিয়া দেন এবং তাহাই অব্যক্ত বিন্দু। সৃষ্টির পূর্বাবস্থা পরাবাক্ পরে তাহা শব্দব্রহ্মরূপে দেখা দেয়। এই বিন্দুতে কোটি ব্রহ্মাণ্ড-সৃষ্টির শক্তি নিহিত। আমরা মায়িক দৃষ্টিতে যাহাকে সৃষ্টির উপাদান বলি তাহা সমস্তই এই বিন্দু হইতে আসে।

"ব্যক্ত অবস্থায় বিন্দু তিনভাগে বিভক্ত--অগ্নি-সোম-সূর্য্য। অগ্নি ভোক্তা, সোম ভোগ্য এবং সূর্য্য দুইয়ের সম্মিলিত সাম্যরস্য। গীতায় এই ত্রিধা বিভক্ত বিন্দুর ইঙ্গিত আছে, 'ন তদ্ভাসয়তে সূর্যো, ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ।' পঞ্চদশ অধ্যায়ের ষষ্ঠ শ্লোক। বিন্দু হইতেছে একটি point যেখান হইতে সৃষ্টির বিচিত্র লীলা চলে।

"অব্যক্ত বিন্দু ব্যক্ত হয় মাতৃকার মাধ্যমে যাহাকে আমরা বর্ণমালা বলি অকার হইতে ইকার পর্য্যন্ত। স্বরবর্ণ অকার হইতে ঔকার পর্যান্তকে আমরা কলা বলি—আর ব্যঞ্জনবর্ণ ক হইতে হ পর্যন্তকে তত্ত্ব বলা হয়।

"বিন্দু অব্যক্ত অবস্থায় অস্পন্দ অথবা স্পন্দহীন থাকে। বিন্দুর এই অব্যক্ত অবস্থাকে আমরা পরাবাক্ বলি। পরাবাকের পরের স্তর পশ্যন্তী—পশ্যন্তীর পর মধ্যমা। মধ্যমার পর বৈখরী। বৈখরীতে আসিয়া সৃষ্টি ইদংভাব গ্রহণ করে অর্থাৎ অহং এবং ইদং আলাদা হয়। ত্রিকোণের মধ্যবিন্দু হইতেছে পরাবাক্ এবং তিনটি বাহু পশ্যন্তী, মধ্যমা এবং বৈখরী। বিন্দু স্পন্দিত বা ক্ষুব্ধ হইবার পর পশ্যন্তী ভূমির সৃষ্টি হয় পশ্যন্তী ভূমিতে আসিয়া একই একের সঙ্গে কথা বলে—যেখানে কর্তা এবং কর্ম পৃথক থাকে না।

তারিখ—৩০।১০।৬৬ সময় সকাল ৯-৩০ মিঃ।

"স্বরূপসত্তা অখণ্ড মহাপ্রকাশ—ইহা নিষ্কল, নিরংশ। মহাইচ্ছায় স্বাতন্ত্র্যের উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে কথার সৃষ্টি হয়। কথাকে আমরা বর্ণমালার মাধ্যমে প্রকাশ করিতে পারি।

'অ' চিৎ প্রকাশকে বুঝায়। 'আ' বুঝায় আনন্দ। 'ই' বুঝায় ইচ্ছা। 'ঈ' মহাইচ্ছা ইচ্ছার elongated form—ইহার পৃথক কোন অর্থ নাই। 'উ' তে জ্ঞানের উন্মেষ বুঝায়, আর 'ঊ' তে জ্ঞানের উন্মেষের গভীরতা বুঝায়। ঋ এবং ৯ অর্থবহ নয়। এ, ঐ, ও, ঔ ক্রিয়াশক্তির দ্যোতক।" জ্ঞানী এবং জ্ঞানের পার্থক্য বুঝাইতে গিয়া একটি উদাহরণ দিলেনঃ "গোলাপফুল জ্ঞানে দ্রষ্টার দৃষ্টিসামনে প্রতিভাত হইতে শুধু রূপে অথবা রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ সমস্ত

লইয়া। কিন্তু তাহা জ্ঞানী দ্রষ্টার দৃশ্যমাত্র থাকে, সর্বসাধারণের গোচরীভূত হয় না। তাহাকে সবাইয়ের দৃষ্টির সামনে materialise করাইতে গেলে প্রয়োজন হয় ক্রিয়ার। ক্রিয়াকে তাই জ্ঞানের projection বলা যায়। জ্ঞান হইতেছে বীজ এবং ক্রিয়া হইতেছে যোনি। জ্ঞানরূপ বীজ যোনিরূপ ক্রিয়াতে পতিত হইলে মূর্ত্তি বা দেহ মূর্ত্ত হইয়া উঠে। পিতার বীর্য্যে পুত্র সূক্ষ্মভাবে থাকে, তাহাকে স্থূলে রূপান্তর করিতে হইলে মাতৃযোনিতে পিতার বীর্যক্ষরণ একান্তভাবে অবশ্যম্ভাবী। অবশ্য যোগেশ্বরের ইচ্ছায় এবং যোগীর বিজ্ঞানে এই দেহসৃষ্টিও সম্ভব এবং তাহা হয় শুদ্ধ সৃষ্টি—তাহাতে কামের মালিন্য থাকে না। ভবিষ্যতে নূতন রূপান্তরের পরে শুদ্ধ সৃষ্টি হইবে—কামভাব থাকিবে না—থাকিবে শুধু প্রেম তাহাতে সৃষ্টির বৈচিত্র্য থাকিবে। ইহাকে নিত্যবৃন্দাবনের সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে। ইহাতে আস্বাদনের আনন্দ থাকিবে।

চিৎ, আনন্দ, ইচ্ছা, জ্ঞান এবং ক্রিয়ার মিলিত ঘনীভূত রূপ হইতেছে বিন্দু—অনন্ত সৃষ্টির উপাদান ইহাতে নিহিত। অগ্নি ভোক্তা, সোম বা চন্দ্র ভোগ্য—(সূর্য্য) দুইয়ের সম্মিলিত রূপে সাম্য হয়। এই সাম্যের ফলে আবার বিন্দুর দিকে return motion হওয়া সম্ভব হয়। অখণ্ড প্রকাশে শিব ও শক্তির পার্থক্য কিছু থাকে না শুধু থাকে প্রকাশই প্রকাশ। পরের স্তরে শিব ও শক্তির যুগলরূপ পাই। যুগলরূপ এবং পূর্বের মহাপ্রকাশ এক নয়। যুগলরূপের বিশেষ সুবিধা হইতেছে দুইয়ের সাম্যের মধ্য দিয়া একটি opening হয়। যেমন ইড়া এবং পিঙ্গলা নাড়ীর মধ্য দিয়া সুষুম্না নাড়ী থাকে ইহাকে ব্রহ্মনাড়ী বলে। এই opening বা ফাঁকের মধ্য দিয়া স্বরূপসত্তার সঙ্গে যুক্ত হওয়া যায়। স্বরূপ সত্তার প্রতিবিম্ব আপন সত্তায় প্রতিফলিত হয় যেমন দর্পণে আপন চেহারা দেখা যায়।

এই দুই বিন্দুকে বলে বিসর্গ। এই ফাঁকের মধ্য দিয়া স্বরূপসত্ত্বার সঙ্গে যখন যোগ হয়—নীচের জ্যোতিকে বলে লিঙ্গজ্যোতি।

তারিখ—৩০।১০।৬৬ সন্ধ্যা ৬৷৷০ ঘটিকা।
সিগ্রার বাড়ীঃ আচার্যদেবের ঘর।

"অখণ্ড মহাপ্রকাশে শিব ও শক্তি অভেদ থাকে। সৃষ্টি উন্মুখ মহাপ্রকাশে শিব ও শক্তি যুগলরূপে দেখা দেয়। অখণ্ড মহাপ্রকাশ হইতেছে সৎ। 'অ' হইতেছে অনুত্তর—আলো। 'অ' হইতেছে চিৎ। 'অ' হইতে সৃষ্টির urge আর একটি 'অ' কে তৈয়ার করে। অ+অ এর সংঘর্ষের ফলে 'আ' হয়। 'আ'

হইতেছে আনন্দ, আনন্দের সঙ্গে নিরানন্দ আছে ধরিয়া লইতে হয় নচেৎ সৃষ্টির ইচ্ছা হইবে কেন।

অখণ্ড মহাপ্রকাশ সৃষ্টি উন্মুখ অবস্থায় স্পন্দ উৎপন্ন হয়। অখণ্ড মহাপ্রকাশ স্পন্দহীন।

তারিখ—৩১।১০।৬৬ সকাল ৯৷৹টা।

সাধনার কথা

দিক কাল বন্ধ—beyond time and space—এই আলোচনাপ্রসঙ্গে বলিলেন ১৯২২ সালের কথা। তখন তিনি ভিক্টোরিয়া পার্কের নিকট বাসায় থাকেন। তখনও কলেজের প্রিন্সিপ্যাল হন নাই। মাঝে মাঝে প্রিন্সিপ্যালের অনুপস্থিতিতে তাঁহার কাজ দেখাশুনা করিতেন। দ্বিতল বাসায় থাকিতেন। দ্বিতলের পূর্ব-পশ্চিম ঘরটি পড়িবার ঘর, থাকিবার ঘর, এবং পূজার ঘর। তাঁহার মা এবং স্ত্রী ব্যতীত অন্য কেহ পূজার ঘরে প্রবেশ করিতেন না। ক্বচিৎ কখনও ২।১ জন বন্ধুবান্ধব সেই ঘরে আসিয়াছেন।

কলেজে সকালে পণ্ডিতের টোল ছিল এবং দুপুরে কলেজের ক্লাস। বেলা ৯টা নাগাদ কলেজে যাইতেন। কলেজ হইতে ফিরিতেন বেলা ২টা হইতে ৩টার মধ্যে।

সকালে ঘর বন্ধ করিয়া আহ্নিক করিতেন ১ ঘণ্টা হইতে ১½ ঘণ্টা সময়। তারপর উঠিতেন এবং জলযোগ করিয়া কলেজে যাইতেন। একদিন সকালে আহ্নিক শেষ হইয়াছে—প্রণাম করিয়াছেন। জ্ঞান পূর্ণমাত্রায় আছে—ঘরে বই-পত্র সবই দেখিতে পাইতেছেন অথচ মন একেবারে শূন্য—তিনি যে কলেজের অধ্যাপক, তাঁহাকে কলেজে যাইতে হইবে—তিনি যে গোপীনাথ কবিরাজ—তাঁহার যে স্ত্রীপুত্র আছে একেবারেই সে কথা মনে ছিল না অথচ তখন তাঁহার সমাধি হয় নাই—পূর্ণ চৈতন্য রহিয়াছে। এ অবস্থা ২।৩ মিনিট continue করিয়াছিল। পরে যখন ইচ্ছা হইত তখনই তিনি দেশকালের ঊর্দ্ধে যাইতে পারিতেন। এই উপলব্ধিই আরও বেশী করিয়া দেখা দেয় ১৯৫২ সালে। তখন এই উপলব্ধির গভীরতা আরও বেশী। এই উপলব্ধি পাইবার জন্য ধরা-বাঁধা নিয়ম নাই। ক্রিয়াকলাপ নাই। ইহা পাইবার জন্য সচেষ্ট এবং সজাগ থাকিতে হয়—চেষ্টা করিতে হয় দেশকালের ঊর্দ্ধে যাইতে।

সাধনপথে বৃদ্ধত্বের অনুভব অন্তরায়। দিব্যদেহ সব সময়ই বালক, কিশোর অথবা যুবা। তাই শিশুসুলভ, বালকসুলভ, কিশোরসুলভ এবং যুবকসুলভ ভাব মনে মনে পোষণ করিতে হয়। মায়ের কাছে শিশু হইয়া

যাওয়া সহজ। সৃষ্টির আদিতে এক দুই হয় তারপর দুইয়ের মিলনে বহু হয়। আবার ফিরিবার পথে এক—এক-এ যাওয়া যায় দুইয়ের মাধ্যমে।

অখণ্ড মহাপ্রকাশ এবং বিন্দু মধ্যস্থলে অর্থাৎ অখণ্ড মহাপ্রকাশের নীচে এবং বিন্দুর ঊর্দ্ধে শক্তি বা মহাশক্তির স্থান। ইহা ত্রিকালাতীত অর্থাৎ কার্য্যের ঊর্দ্ধে। সম্বিৎকে অতিক্রম করিয়া স্বরূপসত্তায় বা মহাপ্রকাশে প্রবেশ অসম্ভব পরম করুণাময়ের কৃপা ব্যতীত। মানুষের বর্ত্তমান ভূত ভবিষ্যৎ এখান হইতেই নিয়ন্ত্রিত, যাহাকে আমরা predestined বা predetermined বলি তাহা এখান হইতেই হয়। অবশ্য এই predeterminationও তাঁহার ইচ্ছায় বদলায়।

বিন্দু কালাতীত না হইলেও ত্রিকাল ইহাতে নিবদ্ধ। বিন্দু ক্ষুব্ধ হইবার সঙ্গে সঙ্গে কালের কার্য্য আরম্ভ হয় তাহার পূর্বে নয়। তাই বিন্দুকে কালাতীত এবং কালাতীত নয় একই সঙ্গে বলা যায়। বিন্দু বিক্ষুব্ধ হয় সৃষ্টির urge-এর সঙ্গে সঙ্গে।

ত্রিধা বিভক্ত বিন্দু বা ত্রিপুটি অগ্নি, সোম, সূর্য—অগ্নির স্পর্শে সোম আসিলে সোম হইতে ক্ষরণ হয়। সেই ক্ষরণ হইতে অনন্ত প্রকারের সৃষ্টি হয় তাহাকে আমরা তত্ত্ব বলিতে পারি। তত্ত্বের অসংখ্য বিভাগ হইতে পারে। তবে অদ্যাবধি চতুর্বিংশতি তত্ত্ব সমস্ত তত্ত্বগুলিকে classify করে। আগামী দিনে তার নূতন classification হইতে পারে।

স্বরূপতত্ত্বে অনন্ত কলা আছে—সেই অনন্ত কলা হইতে একটা কলা 'অ' বিচ্ছুরিত হইয়া আসে এবং তাহা হইতে পঞ্চকলার সৃষ্টি হয় সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষায়।

তারিখ—১।১১।৬৬ সন্ধ্যা ৭টা।

সিগ্‌রার বাড়ীঃ আচার্যদেবের ঘর।

প্রথম কলার সমষ্টি প্রকাশিত হয় অং দ্বারা। 'ক' হইতে 'হ' ব্যঞ্জনবর্ণ—তত্ত্বের সমষ্টি—প্রকাশিত হয় 'হং' দ্বারা। অং+হং এর মিলনে হয় অহং। এর পরে আসে "ইদং"।

মা কালীর গলায় মুণ্ডমালা ৫০টি বর্ণের দ্যোতক—প্রত্যেকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অহং। নীচের বাম করে যে মুণ্ডটি আছে তাহাই হইতেছে অহং। মা অসি দ্বারা তাহাকে ছেদন করিতেছেন।

ব্রহ্মা-বিষ্ণু-রুদ্র-সদাশিব এবং ঈশ্বর মুণ্ডটি লইয়া পঞ্চমুণ্ডী। সাধক এই পঞ্চমুণ্ডীর চৈতন্য লইয়া আসনে আসীন হয় ঊর্দ্ধগতির জন্য তখন ঐ দেবতারা হন শব, কেননা তাঁহাদের চৈতন্য সাধক নিজের সাধনার কার্যে ব্যবহার করে।

অং হইতে ফিরিবার পথে অর্থাৎ 'ঔ' হইতে যখন পুনরায় 'অ' তে ফিরে তখন 'অং' হয়। তত্ত্বসৃষ্টির পরে 'হ'তে আসিয়া স্পন্দন বাহ্য হয়। এখানে প্রাণের সৃষ্টি হয়।

এই প্রাণ আসে সংবিৎ হইতে। ইহার পর সৃষ্টির কাজ চলিতে থাকে। অহং এর পর আসে ইদং।

সাধক স্বীয় চেষ্টায় সংবিতের স্তর পর্যন্ত উঠিতে পারে। কিন্তু পূর্ণ নিষ্কাম হইতে হইলে পূর্ণের কৃপা ব্যতীত সম্ভব নয়। এ অবস্থাকে বলা চলে খেয়াঘাট পর্যন্ত আসা কিন্তু কখন পারাণীর তরী আসিয়া পথিককে পাড়ে লইয়া যাইবে তাহা নির্ভর করে সম্পূর্ণরূপে মাঝির উপর।

তারিখ—২।১।১৬৬ সন্ধ্যা ৭॥০টা।

আচার্যদেবের ঘরঃ সিগ্রার বাড়ী।

আচার্যদেব নিজের জীবনের সাধনের কথাপ্রসঙ্গে বলিতেছিলেন তিনি তাঁর গুরুদেবের নিকট তত্ত্বকথা খুব কমই শুনিয়াছেন। সবকিছু তাঁহার নিকট আসিয়াছে উপর হইতে—ভগবানের কৃপায় তাঁর অন্তর্লোক উদ্ভাসিত হইয়াছে। তারপর বলিতেছিলেন, ভগবান ধরা দিয়ে ধরা দেন না। তাঁকে একভাবে পাওয়া খুবই কঠিন। তাঁকে যুগলরূপে দর্শন করা যায়। শিবশক্তির সামরস্যের ফলে যে ফাঁক সৃষ্টি হয় তাহারই মাধ্যমে তাঁর reflection ধরা যায়। ইহার বেশী পাওয়া কঠিন।

কথাপ্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করিলেন ভগবানের স্বাতন্ত্র্য আছে এবং মানুষের স্বাধীনতা আছে—এই স্বাতন্ত্র্য এবং স্বাধীনতার সামঞ্জস্য কি করিয়া সম্ভব ?

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে স্বীয় ইচ্ছার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য উপদেশ দিতেছেন কেন ?

এই প্রশ্নের উত্তরে আমি বলিয়াছিলামঃ মানুষের জ্ঞান আবরণে আবৃত থাকে। তাহার অতীত ও ভবিষ্যৎ জানা নাই এবং মহাশক্তির ইচ্ছার কথাও জানা নাই, কিন্তু গুরু শিষ্যের অতীত ও ভবিষ্যৎ জানেন অর্থাৎ তাঁহার divine vision আছে। সেই দিব্যদৃষ্টিতে তিনি সব দেখিতে পান। তাই শিষ্যের মঙ্গলকামনায় তাহার যাহা ভাল তাহাই শিষ্যকে উপদেশ দেন।

আচার্যদেব বলিলেন, গীতাতেই বলা আছে যদি অর্জ্জুন যুদ্ধ করিতে অস্বীকার করে তাহা হইলে তাহার প্রকৃতিই বাধ্য করিবে যুদ্ধ করিতে। শিষ্যের কর্ত্তব্য হইতেছে শিষ্য পারুক আর নাই পারুক গুরুর আজ্ঞা তৎক্ষণাৎ পালন করিতে চেষ্টা করা, গুরু বাকিটা করিয়া দেন। কথাপ্রসঙ্গে আরও বলিলেন যখন বোম্বাইতে তাঁহার ক্যান্সার অপারেশন হয় তখন তিনি

আনন্দময়ী মাকে বলিয়াছিলেন তাঁহার পক্ষে অসুস্থ অবস্থায় জপ, আহ্নিক করা সম্ভব হইবে না। উত্তরে মা বলিয়াছিলেন "গুরুদেব আছেন কি জন্য ?" শিষ্যের surrender ভাব থাকিলে কাজ ঠিক ঠিক সমাধা হয়। চাই নিষ্কাম কর্ম করার ইচ্ছা। সাধনপথে অনুভূতি এমন কিছু বড় জিনিষ নয়। ভাল ভাল মূর্ত্তিদর্শন এবং অনুভূতির পরও মানুষের downfall হয়।

ভগবানকে দর্শনের জন্য যেন ব্যাকুলতা থাকে কিন্তু সেজন্য যেন depression না আসে। আমি এত ধ্যান, ধারণা, তপস্যা করিয়াছি তবু তিনি কেন দেখা দিবেন না। এ ধারণা অত্যন্ত অন্যায়। তিনি বিনিময়ে পাবার নন্। তিনি দেখেন ভাব, তিনি দেখেন ভালবাসা। সব সময়ই বিচারের বিষয় হইতেছে আমি কতটা আমার কর্ত্তব্য করিতেছি; কতটা করিতে সক্ষম হইতেছি। এ বিষয়ে আমাদের সব সময় সজাগ থাকা উচিত।

কথাপ্রসঙ্গে আরও বলিলেন নরেন্দ্রনাথ তখনও বিবেকানন্দ হননি—তখনও ভয়ানক critical। গিরিশ ঘোষের নিকট হইতে বাজারের কেনা খাবার খাইতে দেখিয়া তিনি ঠাকুরকে সমালোচনা করিয়াছিলেন। উত্তরে ঠাকুর বলিয়াছিলেন 'আমি দেখি তাহার ভাব তাই তাহার প্রদত্ত খাবার উপেক্ষা করিতে পারি না।' অন্য ভক্তদের ভাব ব্যতীত শুদ্ধাচারে প্রদত্ত কি না লক্ষ্য করিতেন।

তারিখ—৩।১১।৬৬।
আচার্যদেবের সিগ্‌রার ভবন।

দুইটি চক্ষুর দৃষ্টি একই জায়গায় গিয়া মেশে অর্থাৎ দুইটি চক্ষুর দৃষ্টি যখন সমান সমানভাবে গিয়া মেশে তখন সামরাস্যের সৃষ্টি হয়। সেই মিলনের ফলে শূন্যের সৃষ্টি হয়—সেই শূন্যের মাধ্যমে স্বরূপসত্তার সঙ্গে যোগ স্থাপিত হয়।

শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। যখন শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া সমান হয়—তখন কুম্ভক হয় এবং সুষুম্না নাড়ীর ফাঁক দিয়া ঊর্ধ্বগতি হয়। সেই ফাঁক দিয়াই যোগ স্থাপিত হয়।

তারিখ—৪।১১।৬৬ সন্ধ্যা ৬-৪৫ মিঃ।
আচার্যদেবের ঘরঃ সিগ্‌রা।
আচার্যদেবের আলোচনার একাংশ।

বাক্‌শক্তি (মন্ত্র)

পশ্যন্তীতে একই সঙ্গে শব্দ এবং অর্থ আবির্ভূত হয় অথবা ভাসে। দৃষ্টান্তস্বরূপে বলিলেন 'ক' বলার সঙ্গে সঙ্গে জলের আবির্ভাব হয়। অর্থকে

বাদ দিয়া শব্দকে বৈখরী পর্যন্ত লইয়া আসা হয়। সিদ্ধগুরু শিষ্যকে সেই শব্দ মন্ত্ররূপে দেন। শিষ্য বৈখরী হইতে মধ্যমার পর পশ্যন্তীতে গিয়া শব্দের সঙ্গে অর্থের আবির্ভাব লক্ষ্য করেন। সব শিষ্য এই জীবনে সেই স্তরে পৌঁছান তাহা নয়। কেহ কেহ কৃতকার্য হন কেহ কেহ হন না। জপের পুনরাবৃত্তি এইজন্য প্রয়োজন।

শব্দের সঙ্গে সঙ্গে অর্থের আবির্ভাব হয় এই জন্য বলা হয় নাম এবং নামী অভেদ।

নামের সঙ্গে সঙ্গে রূপের আবির্ভাব হয়। শব্দের দুইটি অর্থ হয়—একটি স্বাভাবিক আর একটি কৃত্রিম। এখানে স্বাভাবিক অর্থের কথাই বলা হইয়াছে।

তারিখ—৮।১১।৬৬ সকাল ১০-৪৫ মিঃ।
আচার্যদেবের ঘরঃ সিগ্‌রা।

কলা, তত্ত্ব এবং ভুবন

তত্ত্বসৃষ্টির রহস্য জানিতে চাওয়ার পর ব্যাখ্যা দিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন—

ব্যাখ্যার প্রারম্ভেই বলিলেন, কলা, তত্ত্ব এবং ভুবনের পূর্বাপর সম্বন্ধ বুঝা খুবই কঠিন। সংবিৎ হইতেছে অবর্ণ। সেই অবর্ণ হইতে আসিতেছে বর্ণ, মন্ত্র, পদ—ইহারা হইতেছে বাচক। কলা হইতেছে বাচ্য।

বর্ণ হইতেছে রশ্মি। রশ্মি হইতে মন্ত্র সৃষ্টি হয় এবং মন্ত্র হইতে পদ। কলা is the ultimate unit of বাহ্যজগৎ। রশ্মি ক্রমশঃ ব্যাপ্তিলাভ করিয়া—বিস্তৃতি লাভ করিয়া plane-এ পরিণত হয়। সমস্ত বিষয়টাই অন্তর্জগতে দ্রষ্টার দৃষ্টিসম্মুখে উদিত হয়। বর্ণ, মন্ত্র, পদ সমস্তটাই subjective পদ projected হইয়া কলায় পরিণত হয়। যিনি **সত্যদ্রষ্টা** ঋষি—যাঁহার তৃতীয় নয়ন খুলিয়াছে তিনি বীজ দেখিয়াই বলিতে পারেন কি বনস্পতি তাহাতে সুপ্ত আছে। কিন্তু জাগতিক দৃষ্টিতে শুধু বীজ দেখিয়া বলা কঠিন কোন্ বীজে কি মহীরুহ বা বৃক্ষ উৎপন্ন হইবে। যেমন প্রত্যেক পশুর মধ্যে ভবিষ্যতের মানুষকে দেখা যায় তেমনি প্রত্যেক বীজের মধ্যে বৃক্ষের রূপকে অবশ্য সূক্ষ্মরূপে দেখা যায়। অবশ্য সেই সূক্ষ্মরূপ দেখিবার জন্য সূক্ষ্ম দৃষ্টি বা তৃতীয় নেত্র চাই। সিদ্ধগুরু শিষ্যকে বলিতে পারেন তাহার ভবিষ্যতের ক্রমবিকাশ কি। কিন্তু শিষ্যের নিকট তাহা অজ্ঞাত।

তারিখ—৮৷১১৷৬৬ বিকাল ৫-১৫ মিঃ।
সিগ্‌রার বাড়ীঃ আচার্যদেবের ঘর।

পূর্বের আলোচনার সূত্র ধরিয়া বলিলেন, অখণ্ড প্রকাশে প্রকাশের দুটি দিক আছে—স্থিতির দিক এবং গতির দিক। হইতেছে মহাশক্তির বা সংবিতের দিক—ইহা প্রকাশময়। এই আলোর একটি রশ্মি বিচ্ছুরিত হইয়া আসে—ইহাকে 'বর্ণ' বলা হয়। এই রশ্মিটা দেখা যায় রেখারূপে। এই রশ্মিরেখা হইতে আলো ছড়াইয়া পড়ে ইংরেজীতে বলে diffusion of light, এই স্তরকে বলা হয় 'মন্ত্র'। আর এই আলোর জ্যোতি হইতে যখন রূপের উদয় হয় তখন মূর্ত্তি দেখা যায় তখন আমরা তাকে বলি 'পদ'। এই পদই হইতেছে সমস্ত সৃষ্টির বীজ। এই সমস্ত ঘটে অন্তর্জগতে—ইহা দ্রষ্টার নিকটই শুধু প্রতিভাত হয় অন্যের নিকটে নয়। যখন এই পদকে project করা হয় তখন ইহা কলায় রূপান্তরিত হয়। ইহাকে বলা যায় বীজরোপণ বা গর্ভাধান বা বীর্যকে যোনিতে নিক্ষেপ (নিষেক)। এই বীজের মধ্যেই ভবিষ্যতের জীব, পশু, পক্ষী, উদ্ভিদ—সবই নিহিত।

'কলা' হইতে 'তত্ত্বে'র সৃষ্টি হয়—তত্ত্ব হইতে 'ভুবন'। ভুবন হইতেছে minimum expression of স্থূল unit। ভুবনে আসিয়া আমরা সূক্ষ্মরূপ বীজকে স্থূলরূপে দেখিতে পাই। সব তত্ত্বসৃষ্টির মধ্যেই সব কলা নিহিত আছে। যেমন আম তৈয়ারীতে 'ক' কলা এবং জাম তৈয়ারীতে 'খ' আমেও 'ক' এবং 'খ' আছে জামেও 'খ' 'ক' আছে, তবে আমে 'ক' predominant, জামে 'খ'।

তারিখ—৮৷৩৷৬৭ রাত্রি ৮টা।
সিগ্‌রার বাড়ী, আচার্যদেবের ঘর।

কথাপ্রসঙ্গে আচার্যদেব বলিতেছেন, প্রকৃত প্রাপ্তি সম্বন্ধে অনেকেরই সঠিক ধারণা নাই। প্রকৃত প্রাপ্তি কি জানিতে চাহিলে বলিলেন, আত্মসাক্ষাৎকার বা আত্মস্বরূপ দর্শন। আত্মশক্তি জাগরণ ব্যতীত আত্মস্বরূপ দর্শন সম্ভব নয়। স্বরূপদর্শন তিনরূপে হইতে পারে। স্বরূপ শক্তির টান বেশী হইলে হইতে পারে। আত্মশক্তির টান বেশী হইলে হইতে পারে এবং উভয়ের টান সমান সমান হইলে হইতে পারে—ইহাকেই বলে সামরস্য। বৈষম্যের মধ্যে সৃষ্টি হয়।

তারিখ—২৭৷৩৷৬৭ সন্ধ্যাবেলা।

আলোচনাপ্রসঙ্গে বলিতেছিলেন, যোগ এবং সমাধিতে পার্থক্য কোথায়ঃ সব যোগই সমাধি—সব সমাধি যোগ নয়। যোগে একাগ্রতা এবং চিত্তের নিরোধ

প্রয়োজন। নিরোধে লয় হওয়া সম্ভব কিন্তু তাহাতে যোগ হয় না। একাগ্রতা হইলে এবং চিত্তবৃত্তির নিরোধ না হইলেও যোগের সন্নিকটস্থ হওয়া যায়। চিত্তের পাঁচটি ভূমিঃ মূঢ়, ক্ষিপ্ত, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র এবং নিরুদ্ধ।

তারিখ—২৬।৩।৬৭।

দেহশুদ্ধি কখন হয় জিজ্ঞাসা করায় বলিলেন, উত্তরে অনেক কথা বলিতে হয়। সংক্ষেপে বলিলেন, প্রারব্ধ কর্ম শেষ না হইলে উদ্বৃত্ত কর্ম হয় না। উদ্বৃত্ত কর্ম না হইলে দেহশুদ্ধি সম্ভব নয়। উদ্বৃত্ত কর্ম এবং নিষ্কাম কর্ম এক নয়। উদ্বৃত্ত কর্ম এবং প্রারব্ধ কর্ম একই account-এ হয়, কিন্তু প্রারব্ধ কর্ম এবং নিষ্কাম কর্ম different account-এর। প্রারব্ধ কর্ম শেষ হইবার পর উদ্বৃত্ত কর্ম জমা হয়। তখনই দেহশুদ্ধির প্রশ্ন আসে—তাহার পূর্বে নয়।

আত্মসাক্ষাৎকারের পূর্ব পর্যন্ত কামনা বা কাম থাকে। তবে সাধনপথে অগ্রসর হইবার সঙ্গে সঙ্গে কামের প্রভাব কমে, তবে একেবারে নির্মূল হয় না। আত্মসাক্ষাৎকারের পরে তাহা নির্মূল হয়।

জ্ঞানের পথে অদ্বৈত বোধ হয় বা অদ্বৈতসত্তার সাক্ষাৎ হয়। ভক্তির পথে দ্বৈতের এবং যোগের পথে উভয় অবস্থার আস্বাদন সম্ভব হয়।

ইচ্ছার বহির্মুখ অবস্থাকে কাম বলা হয় আর অন্তর্মুখ অবস্থাকে প্রেম বলা যায়। বহির্মুখ অবস্থায় সৃষ্টি হয় এবং অন্তর্মুখ অবস্থায় অদ্বৈত স্বরূপ লাভ হয়।

তারিখ—২৯।৩।৬৭ রাত্রি ১০-১৫ মিঃ।
সিগ্‌রার বাড়ীঃ আচার্যদেবের ঘর।

বিন্দু হাল্কা হইলে ঊর্ধ্বমুখী হয়। কিন্তু হাল্কা হয় কি প্রকারে—কিসে বিন্দু গতিশীল হয়—পুরুষ-প্রকৃতির মিলনে। এই মিলন যদি আজ্ঞাচক্রের উপরে হয় তাহা হইলে ঊর্ধ্বগতি হইয়া সহস্রারে পেঁাছায় অর্থাৎ পূর্ণব্রহ্মত্বলাভ হয়। আজ্ঞাচক্রের নিম্নে মিলন হইলে বিন্দু নিম্নাভিমুখী হয় অর্থাৎ কামভাব প্রবল হয়। একটিকে বলে বিন্দুবাসিনী ত্রিকোণ যাহার গতি ঊর্ধ্বদিকে আর অন্যটিকে কামাখ্যাপীঠ ত্রিকোণ বলা হয় যাহার গতি নিম্নদিকে। ঊর্ধ্বমুখী বিন্দুর গতির ফলে প্রেমের বিকাশ হয়। এই তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম হইলে রাসলীলা বুঝা খুবই সহজ হয়। বিন্দু ঊর্ধ্বমুখী হইলে দেহাত্মবোধ থাকে না এবং সেইজন্যই প্রেমের বিকাশ হয়।

বিন্দু ক্ষুব্ধ হইবার পর ঊর্ধ্বমুখী হইলে পূর্ণব্রহ্মপ্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকে, আর অধোমুখী হইলে কাম হইতে সৃষ্টি হয়। ঊর্ধ্বমুখী হওয়ার অর্থ দৈহিক মিলন না হওয়া।

তারিখ—১০ই অক্টোবর ঃ ১৯৬৭ সাল।

সপ্তমী পূজার দিন (বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অষ্টমী পূজা) রাত্রিবেলা, গুরুজীর ঘর ঃ—সিগ্রা।

উপস্থিত শ্রীবারীন্দ্রনাথ চৌধুরী এবং শ্রীমতী শোভারাণী বসু। আচার্যদেব শোভারাণী বসুকে ভারতীয় অধ্যাত্মপথের দুইটি দিক্ নির্ণয়প্রসঙ্গে বলিতেছিলেন, ভারতীয় অধ্যাত্ম সাধনার দুইটি দিক—একটি বিবেকমার্গ আর একটি যোগমার্গ। সাংখ্য বেদান্ত প্রভৃতি বিবেকমার্গের পথ, প্রকৃতি হইতে পুরুষ পৃথক্ হয়ে পুরুষ কৈবল্যপ্রাপ্ত হয়, মুক্ত হয়, মুক্তি মৃত্যুর পারে লইয়া যায় বটে কিন্তু তাহারও ঊর্দ্ধে যে অনন্ত আনন্দের রাজ্য আছে তাহার খবর এই বিবেকমার্গের মাধ্যমে সহজে পাওয়া যায় না, অবশ্য মাঝপথে থাকিয়া যদি পূর্ণত্বের সন্ধান পাওয়া যায় তখন আবার যাত্রা সুরু হয়। এই পথে পূর্ণত্বে পৌঁছিতে দেরী হয়। আর যোগের পথে সোজাই পূর্ণত্বে লইয়া যায়। উপমা দিতে গিয়া বলিলেন, যদি আমাদের গন্তব্যস্থল কলিকাতা হয় তাহা হইলে আমরা গয়ার টিকিট না কাটিয়া সোজা কলিকাতার টিকিট কাটিয়া অমৃতসর মেল অথবা দেরাদুন এক্সপ্রেসে উঠিব। অবশ্য গয়া গিয়াও কিছু সময়ের জন্য বিরতির পর আবার নূতন টিকিট কাটিয়া কলকাতা রওনা হইতে পারি।

তারিখ—১১।১০।৬৭ রাত্রি ৮-৩০ মিঃ।
আচার্যদেবের ঘর, সিগ্রা।

উপস্থিত—শ্রীবারীন্দ্রনাথ চৌধুরী।

আচার্যদেব বারীনবাবুকে প্রশ্ন করিলেন—'static motion' কাহাকে বলে ? কিছুক্ষণ ভাবিবার পর বারীনবাবু বলিলেন, যাহার কেন্দ্রে স্থিতি আছে অথচ যাহা হইতে radiation হইতেছে। উত্তর ঠিক হইল না দেখিয়া তিনি ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন, 'ক' বিন্দু হইতে 'খ', 'গ'কে পরিধি বা ব্যাস টানা চলে—'ক'-এর গতিহীনতার মধ্যে গতিশীলতা। ইহাকেই বিন্দাত্মক গতি বলে। ইহা অতি গভীরের জিনিষ। তারপর সরলরেখার বিশেষত্ব কি জিজ্ঞাসা করিলেন এবং ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে বলিলেন, জাগতিক দৃষ্টি কুটিল আর সরল হইতেছে তাহার অপর দিক। সরল দৃষ্টির স্থান কালের ঊর্দ্ধে—বর্ত্তমান, ভূত, ভবিষ্যৎ সেখানে নাই। সবই সেখানে আছে—ইচ্ছামাত্র সব দেখা যায়। সরলরেখার এক কোণ হইতে আর এক কোণের ব্যবধান কমিয়া গেলে মিলন হয়।

সরল গতি এবং বিন্দ্বাত্মক গতির মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। বিন্দ্বাত্মক গতি অনেক গভীরের জিনিষ।

তারিখ—১৩।১০।৬৭ বিকাল ৫টা।
আচার্যদেবের ঘর।

প্রশ্ন করিয়াছিলাম, চিৎশক্তির মানে কি বুঝি না, ইহা কি চৈতন্য? উত্তরে বলিলেন, কি পরিপ্রেক্ষিতে শব্দটি ব্যবহার করা হইয়াছে তাহার উপর নির্ভর করে অর্থ। পুঁথিগত বিদ্যা এক—অনুভূত সত্য অন্য। তাই অতীতের ঋষিদের আশ্রমে ব্রহ্মচারীদের শাস্ত্র পড়িতে হইত এবং সঙ্গে সঙ্গে অনুভূত সত্যের সঙ্গে তার মিল আছে কি না তাহা মিলাইয়া দেখিত। তারপর বলিলেন, চৈতন্য মানে কি? পূর্ণ মানে আমরা জানি না। উত্তরে বলিলাম, পূর্ণ মানে যেখানে অভাব নাই। পরিপ্রশ্ন করিলেন, শান্তি এবং আনন্দ মানে কি বুঝ? ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলিলেন, যেখানে অভাব নাই। অভাবের অনুভূতি নাই সেই অবস্থা পূর্ণ অজ্ঞানের অবস্থা। ইহাই আমাদের সুখের অবস্থা।

তারপর আসে অভাবের অবস্থা। সেই অভাব মিটানোর জন্য আমরা জিনিষ বাহিরে খুঁজি—যেমন পিপাসা লাগিলে জলের অনুসন্ধান করি। জলপানের পর পিপাসার নিবৃত্তি হয়। তারপর আবার পিপাসার উদয় হয়। তারপর জলের অনুসন্ধান করি। ইহাই সংসারের অবস্থা—মায়ায় আবদ্ধ জীবের অবস্থা। কিন্তু পূর্ণত্ব লাভ করিলে অভাব থাকে না। পূর্ণে সব আছে, চাহিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহা পাওয়া যায়। অভাব থাকে না।

তারিখ—১৪।১০।৬৭ সন্ধ্যা ৭টা।
স্থান আচার্যদেবের ঘরঃ ২এ, সিগ্‌রা।

শ্রীমতী শোভারাণী বসুকে ধর্মের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে point note করাইয়া দিতেছিলেন। সেই প্রসঙ্গে বলিলেন, কাম এবং প্রেমের পার্থক্য সম্বন্ধে কাহারও সুস্পষ্ট ধারণা নাই। কাম এবং প্রেমের মূলে আছে ইচ্ছা। ইচ্ছা যখন বহির্মুখ হয় তখন হয় কাম। আর যখন ইচ্ছা অন্তর্মুখীন হয় তখন তাহা হয় প্রেম। উপনিষদে আছে ভগবান এক ছিলেন। নিজেকে দ্বিধা করিয়া দুই হইলেন। এই দুই হইতে বহু হওয়ার ঝোঁক একদিকে আর এক হওয়ার ঝোঁক অন্য দিকে। ইহাকে আমরা পুরুষ, প্রকৃতি, রাধা-কৃষ্ণ, সীতা-রাম বলিতে পারি। একের প্রতি অন্যের আকর্ষণ সৃষ্টির সেই দুই হওয়ার মুহূর্ত্ত হইতে চলিয়া আসিতেছে। এই আকর্ষণের background-এ যদি অখণ্ড সত্তার বোধ থাকে—যদি উপলব্ধি করা যায় সেই অখণ্ডে পৌঁছিতে গেলে দুইয়ের মিলন ছাড়া সম্ভব নয় এবং সেই আকুতি যদি মিলন ঘটায় তাহা হইলে ব্রহ্মলাভ হয়। আর সেই আকুতির পরিপ্রেক্ষিতে

যদি অখণ্ডের বোধ না থাকে—একের বোধ না থাকে—বহু হওয়ার ঝোঁক থাকে তাহা হইলে সেই মিলনের ফলে সংসার, বিশ্ব এবং সেই মিলন হয় কাম হইতে উদ্ভূত। তন্ত্রের ভাষায় পূর্ব মিলনকে ঊর্ধ্বমুখী ত্রিকোণ বলা হয়। আর পরের মিলনকে অধোমুখী ত্রিকোণ যাহা হইতে সংসারের উৎপত্তি। সাধারণ লোকে কাম এবং প্রেমের পার্থক্য বোঝে না বলিয়া কাম এবং প্রেমকে সমার্থক বা synonymous বলিয়া মনে করে।

বিবিধ প্রসঙ্গঃ শঙ্খ বাজানোর তাৎপর্য সম্বন্ধে বলিলেন, ইহার দ্বারা অশুভ শক্তিকে—evil force-কে দূরে সরাইয়া দেওয়া হয়। যতদূর পর্যন্ত শঙ্খধ্বনি যায় ততদূর পর্যন্ত evil force থাকিতে পারে না।

শান্তিজলকে বজ্র বলা হয় কেননা শান্তিজল evil force সহ্য করিতে পারে না। ইহা তাহাদের নিকট বজ্রসম।

তারিখঃ ১৫।১০।৬৭।

আচার্যদেবের ঘর—সিগ্‌রা।

শিক্ষা সম্বন্ধে বলিতে গিয়া বলিলেন, শিক্ষার তিনটি বিষয় লক্ষ্য করা প্রধান কর্ত্তব্য। কিন্তু তাহা সর্বক্ষেত্রে লক্ষিত হয় না। সেই তিনটি বিষয় হইতেছে heredity বংশধারা বা পরিবেশ বা environment এবং পূর্বজন্মের সংস্কার। পিতা এবং মাতার নিকট হইতে প্রাপ্ত গুণাবলী, পরিবেশ এবং সংস্কার অত্যধিকভাবে শিক্ষাকে নিয়ন্ত্রণ করে। আলোচনাপ্রসঙ্গে বলিলেন, সেক্সপীয়রের বাবা এবং মা কেহই শিক্ষিত ছিলেন না। তাঁহার পূর্বপুরুষেরাও কেহই শিক্ষিত ছিলেন না। তাঁহার পক্ষে পৃথিবীখ্যাত নাট্যকার, কবি এবং লেখক হওয়া কিরূপে সম্ভব হইয়াছিল। এ প্রশ্নের জবাব যাঁহারা পূর্বজন্মে বিশ্বাস করিবেন না তাঁহারা দিতে পারেন না। সেক্সপীয়ারের পক্ষে সহায়ক ছিল তাঁহার পূর্বজন্মের সংস্কার।

আলোচনাপ্রসঙ্গে বলিলেন, দীক্ষার বিষয় নিয়ে একটা বড় কাজ করা যায়। দীক্ষার সময় গুরু কি দেখেন? কিছুক্ষণ পর উত্তরদান প্রসঙ্গে বলিলেন, প্রত্যেক ব্যক্তির 'অহং'—'অ' হইতে 'হ' বর্ণমালা ৫০টি মাতৃকার দ্বারা ঘটিত। কিন্তু সেই বর্ণমালার যে আদর্শ সংগঠন তাহা হইতে কিছু কম বেশী থাকে যেমন 'চ'-এর ৫ থাকার কথা, হয়তো আছে ৯; আর 'ছ'-এর ৬ থাকার কথা আছে ৪; যেমন যে বর্ণমালার যতটুকু প্রয়োজন সেই সামরস্যের প্রতিষ্ঠা করাই দীক্ষার উদ্দেশ্য। সদ্‌গুরু আলিঙ্গনের সময় সেই সামরস্য স্থাপন করিয়া দেন। তারপর হয়তো সেই ব্যক্তির জাগতিক জীবনের আচার ব্যবহারে কোন পরিবর্ত্তন আসে না। কিন্তু গুরু তাহাকে ভগবদ্‌ উন্মুখ করিয়া দেন। যদি

তিনি সাধক হন তাহা হইলে সাধনার দ্বারা এই জীবনেই পরমবস্তু লাভ করিয়া জীবন্মুক্ত হইতে পারেন। নতুবা দেহরক্ষার পর তাঁহার মুক্তি অবশ্যম্ভাবী। এই সামরস্য স্থাপনের সময় বৈয়ক্তিক স্বাতন্ত্র্য থাকে। যেমন কবিরাজি চিকিৎসায় কবিরাজ রোগীর বায়ু, পিত্ত ও কফের সামরস্য দেখেন। যদি সামরস্য না থাকে, সামরস্য আনিবার জন্য ঔষধ দিয়া থাকেন পূর্ণরূপে রোগ নিরাময়ের জন্য।

বারীনবাবু বলিলেন, সাধক জীবনের বড় অন্তরায় অহংকার এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, এই অহংকারের সঙ্গে পূর্ণাহং-এর কি যোগ নেই? আচার্যদেব উত্তরদানপ্রসঙ্গে বলিলেনঃ অহংকার মায়াজগতের বস্তু—এই অহংকার ইদং-এর সঙ্গে মিশ্রিত, কিন্তু যোগমায়ার জগতে অহং এবং ইদং আলাদা। তাই সেখানে অহং আছে। অহংকার নেই। মায়াজগতে কর্মসমর্পণ, কর্মফল সমর্পণ দ্বারা এই অহংকারের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। আমার ইচ্ছা ভগবানকে সমর্পণ করিতে পারিলে আমার স্বতন্ত্র ইচ্ছা বলিয়া কিছুই থাকে না, তখন তাঁহার ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা হয়।

আচার্যদেব আমাদের জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কি জান পূজায় সর্ব-প্রথম মূর্ত্তিতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করা হয় কেন? উত্তরে আমরা কেহ কেহ বলিলাম, প্রাণপ্রতিষ্ঠার প্রয়োজন মূর্ত্তিতে চৈতন্য আরোপের জন্য—মূর্ত্তিকে জাগ্রত করিবার জন্য। উত্তরে গুরুজী বলিলেন, মূর্ত্তিতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা না হইলে তাহাকে তুমি বলিয়া সম্বোধন করিতে পারি না।

এক ভদ্রলোক প্রশ্ন করিলেনঃ অপরে আমাকে 'তুমি' বলে আর আমি আমাকে 'আমি' বলি! এই 'আমি' বা 'তুমি' আমার দেহকে বলা হয়, না দেহের মধ্যে যিনি আছেন তাঁহাকে বলা হয়? উত্তরে গুরুজী বলিলেন, দেহ এবং আত্মাকে মিলাইয়া বলা হয়—শুধু দেহকে 'আমি' বা 'তুমি' বলিলে মৃত্যুর পরে দেহকে 'আমি' বা 'তুমি' বল না কেন? কেহ কেহ বা এই দেহী-কে 'আমি' 'তুমি' বা 'সে' বলিয়া সম্বোধন করে। তাঁর সঙ্গে 'তুমি' সম্বন্ধই বাঞ্ছনীয়। 'তুমি'র মাধ্যমে 'তিনি' দূরের থেকে নিকটে হন।

তারিখ—১৮।১০।৬৭ সন্ধ্যাবেলা।

সিগ্‌রা ভবনঃ আচার্যদেবের ঘর।

আমার প্রশ্ন ছিল "আপনি বলিয়াছিলেন গ্রহণের সময় দীক্ষা হইলে দীক্ষা আরও জোরদার হয়" এর হেতু কি। উত্তরে গুরুজী বলিলেন, দীক্ষার স্থানকালের নিশ্চয়ই মহিমা আছে। কিন্তু আসলে হইতেছে তাঁহার মহাকৃপা—সেই মহাকৃপা পাইলে আর কোন কিছুর প্রয়োজন থাকে না।

তারিখ—১৯।১০।৬৭ বিকাল ৫-১৫ মিঃ।

সিগ্‌রা ভবনঃ গুরুজীর ঘর।

বিকালে বিশ্রাম করিয়া উঠিবার পর তত্ত্বকথা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতে বলিলেন। আমি পঞ্চদশী, ষোড়শী এবং সপ্তদশী সম্বন্ধে বিশদ ব্যাখ্যা শুনিতে চাহিলাম। উত্তরদানপ্রসঙ্গে বলিলেন, পঞ্চদশী হইল কালের জগতের জিনিষ। ইহাতে আবর্ত্ত আছে। যেমন বৎসর শুরু হয় বৈশাখ হইতে, শেষ হয় চৈত্রে, আবার শুরু হয় বৈশাখে, তেমনি শুক্লপক্ষ শুরু হয় অমাবস্যার পর প্রতিপদে আর পূর্ণিমায় আসিয়া শেষ হয়। তারপর চন্দ্র হ্রাসপ্রাপ্ত হইতে হইতে আবার অমাবস্যায় পূর্ণ অন্ধকার হয়। ইহাতে হ্রাসবৃদ্ধি আছে, বাড়তি কমতি আছে। এই অবস্থা হইতে কিছু দিলে তাহা আবার পূরণ করিতে হয়। কিন্তু ষোড়শী পূর্ণ। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলিলেন, যাঁহারা মালা লইয়া জপ করেন তাঁহারা অনুলোম এবং বিলোম প্রথায় জপ করেন। অনুলোম প্রথায় আগাইয়া যান এবং বিলোম প্রথায় আবার নামিয়া আসেন। জ্ঞান যেমন বাড়িতে থাকে জ্ঞেয় তেমনি কমিতে থাকে। শেষকালে জ্ঞান এবং জ্ঞেয় এক হইয়া যায়। তাহাকে বলে আত্মসাক্ষাৎকার, আত্মদর্শন। আবর্ত সম্পূর্ণ হইলে আবর্তরূপে বক্রগতি শেষ হইয়া যায় এবং সরলরেখায় আপনাকে প্রতিভাত হয়। একটি ব্যাস আঁকিয়া দেখাইলেন—আবর্ত শেষ হইলে সরলরেখা বিন্দুতে গিয়া মেশে। ক্রমশঃ সরলরেখার ব্যবধান কমিতে থাকে এবং কমিয়া গিয়া মিলন হয়। বিন্দুই হইতেছে স্থিতি। এই বিন্দু হইতে গতি হয়। ইহাকে বিন্দ্বাত্মক গতি বলে—static motion. ষোড়শী হইতেছে বিন্দ্বাত্মক স্থিতি—ইহাতেও পূর্ণতা আছে। এই পূর্ণতা পূর্ণ নহে। এরই পরে পরিপূর্ণ অবস্থা আছে তাহাকে সপ্তদশী বলে। সপ্তদশী হইতেছে কুমারী অবস্থা—ইহাকে পরাশক্তি বলে। ষোড়শী নিষ্ক্রিয় পূর্ণ। পূর্ণ ঘটের দেওয়ার ক্ষমতা থাকে না। কোন সাধক সেই পূর্ণ হইতে দিতে পারেন, কিন্তু তাঁহাকেও ক্ষতিপূরণ করিতে হয়। কিন্তু সপ্তদশী পরিপূর্ণ—সেই পূর্ণ হইতে দিলে পূর্ণই থাকে।

কোন সাধক পঞ্চদশী অবস্থায় শিষ্যকে দীক্ষা দিতে পারেন। সেই দীক্ষায় শিষ্য পূর্ণতা পাইবে না—তাহাকে পঞ্চদশীর আবর্তের মধ্যেই নিবদ্ধ থাকিতে হইবে। সেই সাধক শিষ্যকে দীক্ষা দেওয়ার পর আবার যেটুকু তিনি দিলেন সেইটুকু পূরণ করিতে হইবে। কারণ পঞ্চদশী কালের রাজ্যের জিনিষ তাই তার হ্রাসবৃদ্ধি আছে। ষোড়শীকে বলা চলে শিব আর সপ্তদশীকে পরম শিব। ষোড়শী অবস্থা হইতে প্রত্যাবর্তনের পথে দেখা যায় তিনিই সব হইয়াছেন—

'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' কিন্তু সেই অবস্থালাভ অতীব ভাগ্যশালী, দুই একজনের ভাগ্যে ঘটে। সেই মহাকরুণালাভ সবাই করিতে পারে না।

ষোড়শী অবস্থা নির্গুণ ব্রহ্মের সঙ্গে তুলনা চলে।

সদাশিবকে বলা হয় আশ্রয়হীন শিব অর্থাৎ সে শক্তিহীন তাই সে শব।

তারিখ—২০।১০।৬৭ বিকাল ৫টা।

যোগীর দর্শন এবং ভক্তের দর্শন সম্বন্ধে ব্যাখ্যা শুনিতে চাহিয়াছিলাম। সংক্ষেপে উত্তর দিয়াছিলেন এইরূপ, জ্ঞানের পথে ব্রহ্মকে লাভ করা যায়, যোগের পথে পরমাত্মাকে আর ভক্তির মাধ্যমে ভগবানকে। একই পরমবস্তুকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে দেখার নাম ব্রহ্মদর্শন, পরমাত্মাদর্শন এবং ভগবান দর্শন।

তারিখ—২১।১০।৬৭ সকাল ১০টা।

সদাশিব বন্দ্যোপাধ্যায় নামে এক ভদ্রলোক গুরুজীর নিকট আসিয়াছিলেন —তিনি গোয়ালিয়রে অধ্যাপনা করেন। তাঁহার প্রশ্ন ছিল কর্ম সম্বন্ধে অর্থাৎ কর্ম কতদিন পর্যন্ত করিতে হয়। উত্তরে গুরুজী বলিলেন, জীব চুরাশী লক্ষ যোনি ভেদ করিয়া মনুষ্যজন্ম প্রাপ্ত হয়। মনোময় কোষ প্রাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত কর্ম থাকে না। মনুষ্যজন্মপ্রাপ্তির পর কর্ম শুরু হয়। মানুষের যতদিন কর্তৃত্বাভিমান আছে—কর্তব্যবোধ আছে ততদিন মানুষকে কর্ম করিতে হয়। শরণাগতি বা surrender-এর পর কর্মপাশ থাকে না। তিনি করান, আমি করি এই ভাব আসে। এ অবস্থাও তুলনা করা চলে ছেলে মায়ের হাত ধরিয়া চলিয়াছে এই অবস্থার সঙ্গে। কিন্তু ভয় থাকে হাত ফসকাইয়া যাইবার। কিন্তু যখন মা ছেলের হাত ধরিয়া লন তখন আর সে ভয় থাকে না।

বলা যায় নৈতিক জীবনে পুরোপুরি কর্ম থাকে, কর্তৃত্বাভিমান থাকে। আধ্যাত্মিক জীবন শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অর্থাৎ পুরোপুরি শরণাগতির সঙ্গে সঙ্গে কর্ম থাকে কিন্তু কর্তৃত্বাভিমান থাকে না। দিব্যজীবন প্রাপ্তির পর আর কর্মই থাকে না। যা কিছু করেন তিনি করেন। তিনি ভক্তের ভার লইয়া ভক্তের মাধ্যমে কর্ম করেন।

তারিখ—২১।১০।৬৭ বিকাল ৫-১৫ মিঃ।

শিক্ষা সম্বন্ধে প্রশ্ন করায় বলিলেন, ব্রহ্মচর্যাশ্রমের প্রয়োজনীয়তা শিক্ষায় আছে। কেন এই প্রয়োজনীয়তা কেহই জানেন না। এ সম্বন্ধে বেদে, উপনিষদে, বৌদ্ধদের লেখায় প্রচুর নিদর্শন আছে। ব্রহ্মচর্যই শিক্ষার মূলভিত্তি। ব্রহ্মচর্যের দ্বারা বিন্দুর সংরক্ষণ, শোধন এবং উর্ধ্বগতি হয়। ইদানীং কালে

ব্রহ্মচর্য আশ্রমের যে সমস্ত চেষ্টা হইয়াছে তাহাতে সাময়িকভাবে বিন্দুর সংরক্ষণ হইলেও বিন্দুর সংরক্ষণ এবং ঊর্ধ্বগতিলাভের কোন ব্যবস্থা হয় নাই। বেদ-উপনিষদের যুগে ব্রহ্মচর্যাশ্রমে যাহাদের বিন্দু স্থিতিলাভ করিত তাহারা সন্ন্যাস লইত। সেই সন্ন্যাসের ফলে পূর্ণত্বলাভ করিতে না পারিলেও কৈবল্যলাভ তাহাদের পক্ষে সম্ভব ছিল। যাহাদের বিন্দু স্থিতিলাভ করিত না তাহারা ব্রহ্মচর্যাশ্রমের পর বিবাহ করিয়া গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিত। তারপর সস্ত্রীক সাধন করিয়া পূর্ণত্বলাভের দিকে অগ্রসর হইত। ঊর্ধ্বদিকে বিকাশের স্তরে পুরুষ প্রকৃতির সহায়তা ব্যতীত পূর্ণত্বলাভে অসমর্থ হয়। কিন্তু প্রকৃতি মানে মেয়েমানুষ হইতে হইবে এমন কোন কথা নাই। প্রত্যেক মানুষের দেহেই বামদিকে প্রকৃতি এবং ডানদিকে পুরুষ বিরাজ করে এবং তাহাদের সামরস্যের ফলে বক্রগতি সরল হয়--ইড়া এবং পিঙ্গলা সুষুম্নায় প্রবেশ করে।

* * *

(বীর্য্যকে ওজোতে রূপান্তর করাইতে হইবে)

* * *

জ্ঞানের পথে ব্রহ্মলাভ হয়। ব্রহ্মলাভের সময় জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞাতা এক হইয়া যায় ফলে আত্মদর্শন সম্ভব হয় না। যোগের পথে পরমাত্মা লাভ হয়। এই অবস্থায় আত্মা পরমাত্মাকে দেখিতে পারে। আর ভগবৎলাভ হইলে সংস্কৃত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ভগবানকে দেখা যায়, কথা বলা যায়। কিন্তু তখন দ্রষ্টাকে ভগবানের স্তরে উঠিতে হয়।

তারিখ—২৩।১০।৬৭ সকাল ১১টা।
আলোচনার বিষয়বস্তু শিব-সদাশিব-ব্রহ্ম।

শিব শুধু প্রকাশময়—শিবের এই অবস্থাকে শব এবং আশ্রয়হীন বলিয়া শাস্ত্রে বলা হয়। সদাশিব হইতেছে জগদ্‌গুরু—শিব হইতেছেন বোধস্বরূপ এবং শক্তি হইতেছেন স্বাতন্ত্র্যস্বরূপ। এই দুইয়ের মিলনে পরমশিব হয়।

এক ভদ্রলোক গুরুজীকে বলিলেন, ষট্‌চক্র ভেদ বলিতে তিনি কিছুই বোঝেন না। গুরুজী উত্তরে বলিলেন, ইহা অতি গভীর তত্ত্ব, একদিনে বলিলে কিছুই মনে রাখিতে পারিবেন না। শুধু সংক্ষেপে ইহার রহস্য বলিতেছি।

এই স্থূল দেহের ছয়টি আবরণ—পঞ্চভূত+মন, বুদ্ধি, অহংকার লইয়া চিত্ত বা অন্তঃকরণ। এই ছয়টি আবরণের উন্মোচনই ষট্‌চক্রভেদ নামে শাস্ত্রে পরিচিত। উপনিষদে পাঁচটি কোষের কথা বলা হইয়াছে। অন্নময় কোষ এবং প্রাণময় কোষ জড়, তাহাতে চৈতন্যের প্রকাশ নাই। মনোময় কোষে আসিয়া সঙ্কল্প এবং বিকল্প ভাসিয়া ওঠে। মনের চঞ্চলতা হেতু সঙ্কল্পের বিরোধী-

ভাব মনে জাগে। এই বিকল্পকে দূর করিতে পারিলে মন সত্যসঙ্কল্প হয়। তখন যাহা ইচ্ছা করা যায় তাহাই সঙ্গে সঙ্গে সত্যে পরিণত হয়। এই অবস্থাকে বিজ্ঞানময় অবস্থা বলা হয়। এই বিজ্ঞানময় কোষের পর আনন্দময় কোষপ্রাপ্তি ঘটে। এই অবস্থায় পৌঁছাইতে হইলে কুণ্ডলিনী শক্তির জাগরণ প্রয়োজন। এই কুণ্ডলিনী শক্তি প্রত্যেক মনুষ্যদেহে সুপ্ত থাকে। এই শক্তি জাগ্রত না হইলে মানুষের অজ্ঞানের আবরণ কাটে না—বক্রদৃষ্টি সরলতা প্রাপ্ত হয় না, শিবনেত্র বা জ্ঞানচক্ষু খোলে না। এই শক্তিকে জাগাইতে হইলে তেজ দিয়া আঘাত করিতে হইবে। এই তেজ সৃষ্টি হয় সোম, অগ্নি, এবং সূর্যের মিলনের ফলে। আমাদের দেহে যে প্রাণ এবং অপান বায়ু ক্রিয়া করে তাহা-দিগকে ইড়া এবং পিঙ্গলা বলা হয়। এই দুই বায়ুর সামরস্য ঘটিলে সুষুম্নায় প্রবেশ হয়। এই সামরস্যের অবস্থাকে বলা হয় রবি। সুষুম্নার গতি হইতেছে ঊর্ধ্বদিকে উত্তরবাহিনী গঙ্গার মত। এই ঊর্ধ্বমুখী গতির মুখে পতিত হয় দেহমধ্যস্থ ছয়টি চক্র। প্রত্যেকটি চক্রের কেন্দ্রে আছে বিন্দু। বিন্দুকে কেন্দ্র করিয়া ব্যাস এবং ব্যাস হইতে পরিধি (radius) হইয়া বিন্দুতে প্রবেশ ঘটে। এইভাবে ঊর্ধ্বমুখী গতি একের পর এক চক্র ভেদ করিয়া আজ্ঞাচক্রে উপস্থিত হয়। এই আজ্ঞাচক্র ভেদ হইলে জ্ঞানচক্ষু বা শিবনেত্রের উন্মীলন হয়—তারপর সহস্রার।

তারিখ—২৩।১০।৬৭ সন্ধ্যা ৭টা।

ভাব এবং মহাভাব সম্বন্ধে গুরুজীর নিকট ব্যাখ্যা শুনিতে চাহিয়াছিলাম। গুরুজী জানিতে চাহিলেন, ভাব মানে কি বুঝি। উত্তরে বারীন চৌধুরী মহাশয় বলিলেন emotional urge to get something.

উত্তরে বলিলেন, ভাব আট প্রকার—অষ্টদল কমল অথবা অষ্টসখি বলা হয়। এই অষ্টসখিকে যদি বৃত্তাকারে সাজানো যায় তাহা হইলে বৃত্ত সম্পন্ন হয়। বৃত্ত যেখানে সম্পন্ন হয় সেখান হইতে পরিধি সরলরেখার মধ্য বিন্দুতে লইয়া যায়। এই মধ্যবিন্দুই হইতেছে মহাভাব বা রাধাতত্ত্ব। মহাভাব হইতেছে এক কথায় তন্ময় হওয়া। আরও ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন, আমরা সাধারণভাবে অর্থ চাই, যশ চাই, প্রভাব প্রতিপত্তি চাই, এবং সঙ্গে সঙ্গে ভগবানকেও চাই। কিন্তু যখন সবকিছু চাওয়াকে ত্যাগ করিয়া বা সবকিছু চাওয়া ভগবানকে চাওয়ায় রূপান্তরিত হয় তখনই তাহাকে মহাভাব বলা হয়। শুধু তোমাকেই চাই আর কিছুই চাই না এই অবস্থা।

বারীনবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, অষ্টদল কমল বলা হয় কেন। গুরুজী জিজ্ঞাসা করিলেন, কমল বলিতে কি বুঝি। তারপর নিজেই উত্তরদানপ্রসঙ্গে

বলিলেন, দ্যুলোকের সূর্য ভূলোকের সরোবরস্থিত সুপ্ত কমলে প্রতিফলিত হইয়া তাহাকে প্রস্ফুটিত করে। অর্থাৎ সূর্য হইতেছে পুরুষাঙ্গ, সরোবর হইতেছে যোনি তাহাতে বীজরোপণের ফলে পদ্মের কোরকের উৎপত্তি এবং সেই সুপ্ত পদ্ম সূর্যালোকে ঊর্ধ্বমুখী হইয়া প্রস্ফুটিত হয়।

মনুষ্যদেহের সহস্রাররূপী সূর্য সুপ্ত কুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগাইয়া তোলে। তারপর একটি একটি করিয়া চক্রভেদ হইতে থাকে। দেহের ছয়টি চক্রের পঞ্চাশটি কমল আছে, তাহা ৫০টি বর্ণমালার দ্যোতক।

তারপর বলিলেন, তিব্বতী বৌদ্ধরা বলে 'ওঁ মণিপদ্মে হুম্।' জিজ্ঞাসা করিলেন, মণি এবং পদ্ম বলিতে কি বুঝি। তারপর নিজেই ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন, মণি হইতেছে শিব আর পদ্ম হইতেছে শক্তি। এই দুইয়ের মিলনের ফলে পরমবস্তু লাভ হয়। ইহাকেই বলে পরমশিব, পরব্রহ্ম, বুদ্ধত্বপ্রাপ্তি। পুরুষ-প্রকৃতির মিলনের কথা সর্বধর্মেই স্বীকার করা হইয়াছে।

তারিখ—২৪।১০।৬৭।

গুরুজী বলিলেন, ভগবানের সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা অনেকেরই নাই। তাঁহাকে ভাষায় স্পষ্টভাবে প্রকাশ করা কঠিন। বেদান্তে তাঁহাকে সচ্চিদানন্দ বলা হইয়াছে। তিনি সৎস্বরূপ, তিনি চিৎস্বরূপ, তিনি আনন্দস্বরূপ অর্থাৎ তিনি সত্তাময়, চৈতন্যময়, অর্থাৎ প্রকাশময়, তিনি আনন্দময়। তাঁর সত্তার বিকাশ হয় তাঁর প্রকাশে এবং সেই প্রকাশের ফলে আনন্দ।

আলোচনাপ্রসঙ্গে আরও বলিলেন, অধ্যাত্মসাধনার আরম্ভ হইতে আজ পর্যন্ত ব্যষ্টিভাবে ভগবৎলাভের সাধনা হইয়াছে। কখনও কখনও সমষ্টির কথা ভাবা হইয়াছে। কিন্তু মহাসমষ্টির কথা ভাবা হয় নাই। বুদ্ধদেব ভাবিয়াছিলেন মহাসমষ্টির কথা। বুদ্ধদেব সর্বজীবের দুঃখদুর্দশার কথা ভাবিয়া কাঁদিয়াছিলেন এবং তাহা দূর করিবার কথা বলিয়াছিলেন। সত্যকারের ভগবান লাভ করিতে হইলে অখণ্ডসত্তাকে উপলব্ধি করিতে হইবে. সেই অখণ্ড সত্তার মধ্যেই সমস্ত জীব রহিয়াছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত জীবের দুঃখ নিবারিত হয় নাই।

তারিখ—২৪।১০।৬৭।

আলোচনা বিষয় বস্তুঃ ব্রহ্মবিদ্, ব্রহ্মবিদ্‌বরীয়ান্, ব্রহ্মবিদ্‌বরিষ্ঠ। ব্রহ্মবিদ্-এর নিকট জগৎ থাকে, মিথ্যা প্রতিপন্ন হয় না। ব্রহ্মবিদ্‌বরীয়ানের নিকট জগতের অস্তিত্ব থাকে স্বপ্নবৎ, আর ব্রহ্মবিদ্‌বরিষ্ঠের নিকট জগতের অস্তিত্বই থাকে না, তাঁহার নিকট ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা।

ব্রহ্মসাক্ষাৎকার শুষ্ক জ্ঞানীর এবং উপাসকের হয়। কিন্তু শুষ্ক জ্ঞানীর ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারের ফলে জীবন্মুক্তি ঘটে না, কিন্তু উপাসকের ঘটে। তাহার কারণ শুষ্ক জ্ঞানীর দেহশুদ্ধি এবং চিত্তশুদ্ধি পূর্বে ঘটে না। ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের পরেও যে ঘটিবে এমন কোন নিশ্চয়তা নাই। কিন্তু উপাসকের সাধারণতঃ জীবন্মুক্তি ঘটে। জীবন্মুক্তি ঘটিবার পরও তাহার প্রারব্ধভোগ থাকিতে পারে। অবশ্য প্রারব্ধ জ্ঞানাগ্নির দ্বারা দগ্ধ হয়। ব্রহ্মসাক্ষাৎকার জ্ঞানী বুঝিতে পারে বুদ্ধি দিয়া। উপমাস্বরূপ বলা চলে জ্ঞানীর নিকট ব্রহ্মসাক্ষাৎকাররূপ সূর্যোদয় হয় কিন্তু মেঘাচ্ছন্ন থাকার ফলে সেই সূর্য প্রতিভাত হয় না। কিন্তু উপাসকের নিকট ব্রহ্মসাক্ষাৎকাররূপ সূর্যোদয় মেঘাচ্ছন্ন থাকে না।

তারিখ—২৫।১০।৬৭ সকাল ১০-৪৫ মিনিট।

কাল এবং ক্ষণ ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিবার জন্য বলিয়াছিলাম। বলিলেন, কাল এবং ক্ষণ দুইটি খুব important. কালকে তিনভাগে ভাগ করা চলে —অতীত, বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎ। অতীতের আরম্ভ আমাদের জানা নাই কিন্তু অতীতের শেষ বর্ত্তমানে রহিয়াছে। তেমনি ভবিষ্যতের শেষ আমাদের জানা নাই কিন্তু বর্ত্তমানে রহিয়াছে। এই বর্ত্তমানটা কি? যদি বলি গাছের পাতা মাটিতে পতিত হইতেছে। পাতা খসা হইতে সুরু করিয়া মাটিতে পতিত হওয়া পর্যন্ত সবটাই বর্ত্তমান। কিন্তু পাতা খসা একটা point, মাটিতে পতিত হওয়া আর একটা point, তেমনি বলা চলে বর্ত্তমান জীবন সুরু হইয়াছে মাতৃগর্ভ হইতে, ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর হইতে এবং চলিবে মৃত্যু-পর্যন্ত—সবটাই বর্ত্তমান। অবশ্য ইহার মধ্যেও কালবিভাগ চলে—যেমন কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ়ত্ব, বার্দ্ধক্য। বর্ত্তমানটাও series of points. Line is a continuation of series of points. ব্যবহারিক দৃষ্টিতে কালকে ক্ষণের সমষ্টি বলা চলে। যেমন একটি মালা তাহাতে অনেক ফুল আছে। ফুল-গুলি সব পরপর সাজানো—একের পর এক সাজানো। কিন্তু মালাকে গাঁথি-বার জন্য একটি সূত্রে সবগুলিতে গ্রথিত করা হইয়াছে। মালাটি ফুলগুলির সমষ্টি। কিন্তু একটি এবং আর একটি ফুলের মধ্যে ফাঁক রহিয়াছে, কিন্তু সূত্রটি সবকে এক করিয়াছে। সূত্রটিকে বলা চলে ক্ষণ। কালকেও বলা চলে ক্ষণের সমষ্টি। ক্ষণ হইতেছে একটি অখণ্ড বস্তু। এই ক্ষণে পৌঁছিতে পারিলে কালের বাহিরে যাওয়া যায়, কালকে উপেক্ষা করা চলে। ক্ষণ ক্রমের বাহিরে আর কাল ক্রমকে অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হয়। ক্ষণ হইতেছে eternity.

তারিখ—২৬।১০।৬৭ সন্ধ্যা ৭টা।

বারীনবাবু কলা কি জানিতে চাহিলে গুরুজী বলিলেন, কলা শক্তির একটা unit.

উদ্‌বৃত্ত সাধনা সম্বন্ধে বলিতে গিয়া বলিলেন, সাধক এবং যোগীর পার্থক্য বুঝা দরকার। সাধক সাধনা করিতে করিতে স্বরূপ প্রাপ্ত হন। তিনি সেই স্বরূপে লীন হইয়া যান। কিন্তু যোগী সেই স্বরূপের শক্তিপ্রাপ্ত হইয়া শক্তিমান হন এবং স্বরূপকে ছাড়াইয়া যান। এক কথায় তিনি শক্তিপ্রাপ্ত হইয়া ভগবত্তা লাভ করেন। কিন্তু সাধকের তাহা ঘটে না। তাঁহার স্বরূপপ্রাপ্তির পর স্বরূপপ্রাপ্তির বোধ আর থাকে না কিন্তু যোগীর থাকে। যোগী সমস্ত বৃত্তিগুলিকে রূপান্তর ঘটান আর সাধক বিপরীত বৃত্তিগুলিকে ত্যাগ করিয়া সাধনপথে অগ্রসর হন।

'উদ্‌বৃত্ত সাধন কি' বলিতে গিয়া বলিলেন, ষোড়শী অবস্থা হইতেছে পূর্ণ অবস্থা। ঘট পূর্ণ হইয়া গেলে ঘটের দিবার ক্ষমতা থাকে না। অর্থাৎ সে নিষ্ক্রিয় কিন্তু সপ্তদশীতে পূর্ণতার পর অনন্ত ক্রিয়াশক্তি থাকে, ফলে সপ্তদশী পূর্ণ ঘট হইতে দিতে পারে, উদ্‌বৃত্ত সাধনার ফলে সপ্তদশী অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায়।

বারীনবাবু তখন প্রশ্ন করিলেন integration-এর অর্থ কি. এককে প্রাপ্ত হওয়া নয়? যদি তাই হয় তাহা হইলে এককে ছাড়াইয়া যাওয়ার অর্থ কি হয়? উত্তরে গুরুজী বলিলেন, integration-এর পরেও স্তর আছে। সেইটি হইতেছে সপ্তদশীর অবস্থা যেখানে উপছাইয়া পড়ে।

শোভাদি প্রশ্ন করিলেন বারীনবাবুর প্রশ্নকে কেন্দ্র করে। বারীনবাবুর প্রশ্ন ছিল যোগের পথে উজিয়ে যাওয়ার সময় ত্যাগ করে যেতে হয়। কিন্তু ফিরবার পথে সেই সমস্ত ত্যাগ করা বস্তুর রূপান্তর ঘটে তখন সবই তিনি হয়েছেন। ব্রহ্মলাভ ভগবানলাভ বা ভগবদ্‌দর্শনের পর যোগের পথে কি সবাইয়ের ফিরবার অধিকার থাকে না? উত্তরে গুরুজী বলিলেন, তাঁরাই শুধু ফেরেন যাঁরা শুদ্ধ বাসনা নিয়ে উপরে যান। অর্থাৎ ভগবৎ সাক্ষাৎকারের পর ফিরে এসে সবাইয়ের ভাল করবে, সবাইয়ের মঙ্গল করবে এই ভাব নিয়ে।

* * *

রস কি?

উত্তর—রাধাকৃষ্ণের যুগলমিলনের পর 'রাধা গলিয়া কৃষ্ণে লয় হয় এবং কৃষ্ণ গলিয়া রাধাতে লয় হয়'—দুই মিলিয়া এক হয়—ইহাকেই রস বলে।

প্রেমিকের পর হয় ভাবুকের উদয়, ভাবুকের পর হয় রসিকের। রাধা এবং কৃষ্ণ গলিয়া এক হওয়াকে বলে দ্রুতি।

তারিখ—২৭।১০।৬৭ বিকাল ৫টা।

সিগ্‌রা ভবন, গুরুজীর ঘর—উপস্থিত বারীন চৌধুরী, হেমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী এবং ব্রহ্মচারীজী। আলোচনার বিষয়বস্তুঃ ব্রহ্মচর্য।

ব্রহ্মে যিনি চরণ করেন তিনিই ব্রহ্মচারী। সেই অর্থে আমরা ব্রহ্মচারী নই। কেননা ব্রহ্মে চরণ করিলে আমরা কান দিয়ে শুনতে পেতাম না, চোখ দিয়ে দেখতে পেতাম না, শুধু ব্রহ্মকে ব্যতীত। সত্যকার ব্রহ্মচারী হতে হলে প্রয়োজন বিন্দু সংরক্ষণের, শোধনের এবং সিদ্ধির। বিন্দু অথবা বীর্য্য হইতেছে শরীরের সার বস্তু—এক কথায় essence অর্থাৎ আমরা যা খাই তা সব রসে পরিণত হয়। এই সারবস্তুতে মলিনতা বা impurities থাকে তাহাকে শোধন করা প্রয়োজন। শোধনের পর বিন্দু সিদ্ধি হয়। তখন আর বিন্দু ক্ষুব্ধ হয় না।—বিন্দুকে ক্ষুব্ধ করার মত exciting cause থাকিলেও ক্ষুব্ধ হয় না। তারপর প্রয়োজন বিন্দুর ঊর্ধ্বগতির মাধ্যমে বিন্দু ওজসে পরিণত হয়। এই ঊর্ধ্বগতি প্রাপ্ত হইতে গেলে প্রকৃতির সাহচর্য প্রয়োজন। এই প্রকৃতি প্রাকৃত প্রকৃতি নয়—অপ্রাকৃত প্রকৃতি। এই প্রকৃতি ইড়া হইতে পারে, এই প্রকৃতি পিঙ্গলা হইতে পারে।

ইষ্ট দেবতাকেও প্রকৃতি বলা হয়। ইষ্টসিদ্ধির প্রয়োজন আছে। এই ইষ্টসিদ্ধিই হইতেছে কুণ্ডলিনী শক্তির জাগরণ। কুণ্ডলিনী জাগ্রত হইয়া ঊর্ধ্বগতি প্রাপ্ত হইলে এবং ঊর্ধ্বে অবস্থিত হইলে সেই সিদ্ধ বিন্দুকে ক্ষুব্ধ করায় উপরে টানিয়া লয়।

যেখানে বাহ্য প্রকৃতিকে গ্রহণ করিতে হয় সেখানে সেই প্রকৃতিকে অবশ্যই 'পদ্মিনী' হইতে হইবে। নতুবা সিদ্ধ বিন্দুর ঊর্ধ্বগতি হইবে না। এই প্রকৃতি সাহায্যে সিদ্ধবিন্দু ক্ষুব্ধ হইয়া ঊর্ধ্বগতি প্রাপ্ত হয়।

সাধনপথে উন্নতি করিতে গেলে ব্রহ্মচর্যের একান্ত প্রয়োজন। সেজন্য আমাদের শাস্ত্রে তপস্, তেজস এবং ওজসের কথা আছে।

ব্রহ্মচর্যেরও প্রকারভেদ আছে। সাধারণভাবে বাহ্য প্রকৃতির সাহায্য লইতে গেলে পতন অনিবার্য।

বিবাহিত জীবনের ব্রহ্মচর্য হইতেছে তিন প্রকারের—শুক্ল, রজঃ এবং তমঃ।

শুক্ল, স্ত্রী ঋতুস্নাত হইবার পর স্ত্রীসঙ্গ করিতে হয় শুধুমাত্র পুত্র উৎপাদনের জন্য—রজোতে স্ত্রীসঙ্গ পুত্র উৎপাদনের জন্য—নিজের লালসা-

নিবৃত্তির জন্য নহে। তমোতে স্ত্রীসঙ্গ সর্বাবস্থাতেই বিধিবন্ধ—এই স্ত্রীসঙ্গ হইতেছে বিবাহিত স্ত্রীর সঙ্গে, অন্য কাহারও সঙ্গে নহে।

স্ত্রীকেও ব্রহ্মচারিণী বলা হয়—সতী বলা হয় যদি নিজের স্বামী ব্যতীত অন্য কাহারও সঙ্গ না করে।

বিবাহিত জীবনেও ভগবানলাভের জন্য বিবাহের অব্যবহিত পরে দীক্ষা-গ্রহণের ব্যবস্থা পূর্বে ছিল, যাহাতে উভয়ে একই সঙ্গে অধ্যাত্মজীবনে অগ্রসর হইতে পারে।

অতীতে যোটকবিচার করিত 'পদ্মিনী'স্বভাবা স্ত্রীলাভের জন্য এবং তাহার ফলে জীবনে পূর্ণতালাভের সম্ভাবনা প্রবল থাকিত।

তারিখ—২৮।১০।৬৭ সকালবেলা।

মা কালী উপরের দক্ষিণ হস্তে অভয় দিচ্ছেন আর নীচের দক্ষিণ হস্তে দিচ্ছেন বর। উপরের বাম হস্তে অসি দ্বারা ক্ষুদ্র অহংবোধকে নাশ করছেন—নীচের বাম হস্তে অস্মিতার মস্তক কর্তন করে তা ধারণ করছেন—গলার মুণ্ডমালা সেই অস্মিতারই সঙ্গে সঙ্গে। বাম হস্তে অস্মিতার মস্তক না বলে বলা চলে অসুরের মস্তক আর গলার মুণ্ডমালা তারই সঙ্গে সঙ্গে। অহংকার-বোধ না গেলে তাঁকে পাওয়া যায় না। তাই এগুলি তার প্রতীক। গলার মুণ্ডমালাকে বলা হয় ৫০টি মাতৃকা—অর্থাৎ ৪৯টি মাতৃকা অর্থাৎ বর্ণমালা অর্থাৎ ৪৯টি বায়ু আর একটি হচ্ছে সমষ্টির জন্য।

তারিখ—২৮।১০।৬৭ সন্ধ্যাবেলা

Caste System নিয়ে আলোচনাপ্রসঙ্গে বলিলেন, কেহই caste system বোঝেন না। শুধু caste নিয়েই একখানা বড় বই লেখা চলে। প্রত্যেকেই জন্ম দ্বারা শূদ্র, কিন্তু পরে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করতে হয়। এখন শুধু ব্রাহ্মণের ছেলেই ব্রাহ্মণ বলে পরিচিত। শাস্ত্রে আছে ব্রাহ্মণ সম্মানকে বিষের মত পরি-ত্যাগ করবে। কিন্তু আজকাল আর তা নেই। বশিষ্ঠ মুনি ব্রাহ্মণ ছিলেন। বিশ্বামিত্র তা ছিলেন না, তিনি ব্রাহ্মণ হইতে চাহিয়াছিলেন কিন্তু ব্রাহ্মণ হইতে পারেন নাই। পরে মনে ধিক্কার আসায় সে সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়াছিলেন। আর সেই শুভ বাসনা উদয়ের ফলেই বশিষ্ঠ মুনি তাঁহাকে ব্রাহ্মণ করিতে চাহিলেন এবং করিলেন। গায়ত্রী মন্ত্রের রচয়িতা সেই বিশ্বামিত্র মুনি।

প্রসঙ্গক্রমে বলিলেন, একবার শ্রীশ্রীসিদ্ধিমাতাকে গুরুর মানে কি জানিতে চাহিয়াছিলেন। উত্তরে সিদ্ধিমাতা বলিয়াছিলেন, গুরু চার প্রকারের হয়, দেহ-গুরু অর্থাৎ যিনি দেহ ভেদ করাইয়া দেন অর্থাৎ ষট্‌চক্র ভেদ করান। তারপর

আছেন বিশ্বগুরু যিনি বিশ্বকে ভেদ করান। তারপর আছেন ব্রহ্মগুরু যিনি ব্রহ্মকে সাক্ষাৎকার করান। তারপর আছেন সদ্গুরু যিনি আত্মসাক্ষাৎকার করান।

*　　*　　*

পঞ্চ-উপচারে পূজা কি জানিতে চাহিলে বলিলেন, পঞ্চ-উপচার পূজায় নিম্নলিখিত জিনিষগুলির প্রয়োজন ঃ

ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, পুষ্প, গন্ধ।

এই পঞ্চ উপচার পঞ্চভূতকে বুঝায়—ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম। নৈবেদ্য হইতেছে অপ্, পুষ্প হইতেছে ব্যোম, দীপ হইতেছে তেজ, গন্ধ হইতেছে পৃথিবী এবং ধূপ হইতেছে মরুৎ।

তারিখ—২৯।১০।৬৭ বিকাল ৫টা।

আলোচনাপ্রসঙ্গে বলিলেন, দীক্ষা আছে ১০৮ প্রকারের। শক্তিপাত হয় নয় প্রকারেঃ তীব্র-তীব্র, তীব্র-মধ্যম, তীব্রমন্দ, মধ্যমতীব্র, মধ্যমমধ্যম, মধ্যমমন্দ, মন্দতীব্র, মন্দমধ্যম, মন্দমন্দ।

বিন্দ্বাত্মক গতি কি বুঝাইতে গিয়া বলিলেন, স্থিতির মধ্যে গতি। স্থিতির মধ্যে অনন্ত গতি এই বিষয় বুঝাইতে গিয়া উপমা সহযোগে বলিলেন, গাড়ী যে speed-এ যায় সেই speed-এ কলিকাতার দূরত্ব cover করিতে ১০ ঘণ্টা সময় লাগে। Speed double করিয়া দিলে ৫ ঘণ্টায় যাওয়া যায়। যদি আরও বাড়াইয়া দিয়া কাশী হইতে কলিকাতার দূরত্ব cover করা যায় within a second তাহা হইলে physically কাশী হইতে কলিকাতায় পেঁছানো যায় infinite motion in static condition! শিবশক্তির সমন্বয়ে এই অবস্থায় পেঁছানো যায়।

তারিখ—৩০।১০।৬৭ সন্ধ্যা ৬-৩০ মিঃ।
সিগ্রা ভবন, গুরুজীর ঘর।

শক্তিপাত তত্ত্ব এবং দীক্ষাতত্ত্ব বুঝাইতে গিয়া বলিলেন, শক্তিপাত হইতেছে ইচ্ছাশক্তি আর দীক্ষা হইতেছে ক্রিয়াশক্তি। উপমা দিয়া বলিলেন, আমি বাড়ীর কর্ত্তা—আমি ইচ্ছা করিলাম পিঠা খাইব। তারপর সেই ইচ্ছাকে রূপ দিবার জন্য বাড়ীর লোকেরা যেমন সীতারাম, শম্ভু, বামুনমা মিলিয়া পিঠা তৈয়ার করিল। এই ইচ্ছাশক্তি হইতেছে শক্তিপাত আর এই ইচ্ছাকে রূপ দিবার জন্য যে ক্রিয়া তাহা হইতেছে ক্রিয়াশক্তি।

দীক্ষা দিবার পূর্বে সদ্গুরু দেখেন দীক্ষাপ্রার্থীর মধ্যে শক্তিপাত হইয়াছে

কি না—যদি হইয়া থাকে তাহা হইলেই দীক্ষা দেন নচেৎ দেন না--এবং দীক্ষার প্রকার নির্ভর করিবে কতখানি শক্তিপাত হইয়াছে তাহার উপর। সুতরাং দীক্ষাপ্রার্থী হইলেই দীক্ষা পাওয়া যায় না। কিন্তু গুরুর সেই দেখিবার ক্ষমতা থাকা চাই।

তারিখ—২।১১।৬৭ সকাল ৯-৪৫ মিঃ।

সকালে গিয়া দেখি গুরুজী বিমলা ঠক্করের Mutation of Mind বই-খানা দেখিতেছেন। কিছুক্ষণ পর বইখানা বন্ধ করিয়া বলিলেন, বিমলাও ক্ষণের কথা বলিয়াছে, অবশ্য না বুঝিয়া যে পরিবর্ত্তন আসিতেছে সে কথা সেও উপলব্ধি করিয়াছে।

আগামী দিনে যে impending change আসিবে বলা হইতেছে—descent of supramental mind তাহা in fact ঘটিয়াছে। সবারই সে পরমবস্তুর প্রাপ্তি ঘটিয়াছে। কিন্তু এখনও উপলব্ধি হয় নাই। পূর্বেও কালের প্রাধান্য ছিল এবং বর্ত্তমানেও আছে। যাঁহারা অধ্যাত্মজীবন যাপন করেন এবং পরমবস্তু পান তাঁহারা কালরাজ্যের বাহিরে গিয়া সেটা পান—কালরাজ্যে সেটা পান না, কারণ, কালের প্রাধান্য। কিন্তু যে qualitative change ঘটিতেছে তাহাতে কাল স্তিমিত হইবে তাহার প্রাধান্য থাকিবে না। কাল হইবে পরিকর অথবা চাকর। যাঁহারা পরমবস্তু পাইয়াছেন এবং উপলব্ধি করিয়াছেন তাঁহারা কালের মধ্যে থাকিয়াও কালাতীত হইবেন। অর্থাৎ পরিণামশীল কাল তাঁহাদের জীবনকে আর আক্রমণ করিতে পারিবে না—তাঁহারা জরামৃত্যুর ঊর্দ্ধে যাইবেন। অর্থাৎ এইটাই ভগবদ্ধাম হইবে। ভগবদ্ধাম এখানেই প্রতিষ্ঠিত হইবে। যাঁহারা সেই পরম বস্তু পাইয়াছেন অথচ উপলব্ধি হয় নাই তাঁহারা অবশ্যই কালের রাজ্যেই বাস করিবেন। উপলব্ধির পরে কালের বাহিরে যাইবেন।

উপলব্ধি না পাওয়ার দলে থাকছেন দুই থাকের লোক—যাঁহারা তাঁকে পাবার জন্য উন্মুখ এবং যাঁরা উন্মুখ নন্। যাঁরা উন্মুখ তাঁরা প্রথমেই উপলব্ধি করবেন এবং যাঁরা উন্মুখ নন্ তাঁদেরও উন্মুখতা ঘটবে, অন্যের উপলব্ধি হয়েছে দেখে অর্থাৎ তাদের জীবনের রূপান্তর দেখে। অবশ্য এ ঘটতে কত সময় লাগবে বলা শক্ত—একদিনেও হতে পারে আবার দশ বৎসর বিশ বৎসরও লাগতে পারে। যখন সবাইয়ের উপলব্ধি ঘটবে তখন ধরায় ভগবদ্ধাম প্রতিষ্ঠিত হবে। প্রাপ্তি এবং সঙ্গে সঙ্গে উপলব্ধি ঘটবে মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোকের—তারপর তাঁরাই অপরের উপলব্ধি ঘটাতে সাহায্য করবেন। অতীতে যাঁরা কৈবল্যপ্রাপ্ত হয়েছেন—মুক্ত হয়েছেন তাঁরা আবার এ পৃথিবীতে

এসে দেহধারণ করবেন পরিবর্ত্তিত অবস্থায় আনন্দ উপলব্ধি করতে। নূতন অবস্থায় আর সংসারে জরা মরণ থাকবে না।

১০৭, ১০৮ এবং ১০৯-এর অর্থ জিজ্ঞেস করায় বললেন, এ কথাগুলো তাঁর গুরুদেবের ধারার কথা।

এই জাগতিক সৃষ্টি ৪৯টি অণুর সমন্বয়ে যার সমষ্টি ১ মিলিয়া ৫০। ৫০টি অনুলোম এবং ৫০টি বিলোম নিয়ে হয় ১০০। এই ১০০'র মধ্যেই সমগ্র সৃষ্টি নিবদ্ধ। এর পর সাধারণতঃ মহাশূন্য ধরা হয়। যোগীরা ভিন্ন এর পর কেহ যেতে পারেন না। তাঁর গুরুদেবের আবির্ভাবের পূর্বে (শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংসদেব) ১০৫ পর্যন্ত এই সৃষ্টি extension করে-ছিলেন যোগীর উদ্‌বৃত্ত কর্মের দ্বারা। শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংসদেব নিজস্ব যোগশক্তিবলে সেই সৃষ্টির পরিধি বাড়িয়ে দেন ১০৭ পর্যন্ত। ১০৭ হচ্ছে পরমা প্রকৃতি। ১০৫ হতে ১০৬ পর্যন্ত vacant space ছিল। অবশ্য এই সৃষ্টি স্থূল দৃষ্টিতে ধরা পড়ে না। যেমন জ্ঞানগঞ্জ ধরা পড়ে না স্থূল-দৃষ্টিতে।

১০৭ হইতেছে পরমা প্রকৃতির রাজ্য—১০৮ হইতেছে পরমপুরুষ। ১০৭ হইতে ১০৮-এর যে ব্যবধান তাহা মৃত্যুকে বাদ দিয়া কেহ পোঁছাইতে পারেন না। পরিবর্ত্তিত অবস্থায় অর্থাৎ তাঁহার অবতরণের ফলে সেই ব্যবধান লোপ পাইবে এবং শিষ্য ১০৯-এ পোঁছিবে অর্থাৎ গুরুর উপরে শিষ্যের স্থান। সেইটি চরম স্থান। ১০৭-কে বলা চলে মা। ১০৮ বাবা এবং ছেলে--এই তিন মিলিয়া এক। মূলতঃ আত্মা একই—তাহার পরিপূর্ণ স্ফুরণ ঘটিবে ১০৯-এ।

তারিখ—৫।১১।৬৭ সকাল ১০-৪৫ মিঃ।

গুরুজীর পদপ্রান্তে পোঁছিবার পরই প্রশ্ন করিতে বলিলেন। শ্রীকৃষ্ণ-প্রসঙ্গ হইতে ১২০ পৃষ্ঠা বাহির করিয়া বলিলাম, শক্তিকুণ্ডলিনী এবং প্রাণ-কুণ্ডলিনী আমার নিকট বোধগম্য হইতেছে না, বুঝাইয়া দিন। প্রায় ১ ঘণ্টা ধরিয়া বুঝাইলেন, অনেক কথা বলিলেন—আমার সব কথা মনে নাই। যতটুকু মনে আছে তাহাই লিপিবদ্ধ করিতেছি।

উত্তর দিবার পূর্বে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কুণ্ডলিনীশক্তি বলিতেই বা কি বুঝি আর চিৎশক্তি বলিতেই বা কি বুঝি।

তারপর উত্তরদানপ্রসঙ্গে বলিলেন, চিৎশক্তিই কুণ্ডলীরূপে প্রত্যেক জীব-দেহে সুপ্ত অবস্থায় থাকে। পরমা কুণ্ডলিনী শক্তি অভিন্নভাবে শিবের সঙ্গে থাকে। আরও ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন, সত্তা প্রকাশিত হয় সৎ শব্দের দ্বারা, চৈতন্য চিৎ শব্দের দ্বারা এবং আনন্দ 'আ'কার দ্বারা। অনন্তর মহাপ্রকাশ

হইতে চিৎ প্রকাশিত হয়। 'অ' যখন 'অ'কে দেখে তখন আনন্দ হয়—তখনই 'অ' হয় 'আ' কেননা দুই ভিন্ন একের মাধ্যমে আনন্দ হয় না। তারপর 'ই'-তে ইচ্ছাশক্তির প্রকাশ হয়, 'ঈ' হইতেছে 'ই'-এর emphasis মাত্র। 'উ' হইতেছে জ্ঞানশক্তির উন্মেষ। 'এ' হইতেছে অস্ফুট ক্রিয়া। 'ঐ' হইতেছে স্ফুট ক্রিয়া। 'ও' হইতেছে স্ফুটতর ক্রিয়া। 'ঔ' হইতেছে স্ফুটতম ক্রিয়া। তারপর ক্রিয়া গুটাইয়া জ্ঞানে প্রবেশ করে—জ্ঞান গুটাইয়া ইচ্ছায় প্রবেশ করে —ইচ্ছা গুটাইয়া চিৎ-এ প্রবেশ করে তারপর সবগুলি বিন্দুরূপ ধারণ করে।

চিৎ-আনন্দ-ইচ্ছা-জ্ঞান-ক্রিয়া হইতেছে ৫টি কলা। এই কথা হইতে তত্ত্বের সৃষ্টি হয়—তত্ত্ব হইতেছে ব্যঞ্জনবর্ণ। তত্ত্ব হইতে ভুবনের সৃষ্টি হয়।

পরমা কুণ্ডলিনী হইতেছে পরাশক্তি বা পরা সংবিৎ। ইহাই এক প্রান্তে শক্তিকুণ্ডলিনীরূপে এবং অপর প্রান্তে প্রাণকুণ্ডলিনী রূপে প্রকাশিত হয়। প্রাণ হইতেছে দুই প্রকার—সরল প্রাণ এবং বক্র প্রাণ।

'অহং' এর 'অ' হইতেছে অনুত্তর প্রকাশ, 'হ' হইতেছে বিমর্শ শক্তি। এই দুই মিলিয়া 'অহং'—এই অহং 'পূর্ণাহং'। এই পর্যন্ত 'অহংই' আছে 'ইদং' নাই। তারপর আসে 'ইদং'—এই ইদংকে বলা হয় মহাসৃষ্টি। এই মহাসৃষ্টিতে সব কিছু আছে—আমরা যাহা জানি, যাহা কল্পনা করি তাহাও আছে—আবার যাহা জানি না, কল্পনা করি না তাহাও আছে। এই সৃষ্টিতে কিছুই ফুরায় না।

এই মহাসৃষ্টিই কুমারীতত্ত্ব-সপ্তদশী—Virgin Mary—immaculate conception.

তারিখ—৬।১১।৬৭ সকাল ১০-৪৫ মিঃ।

শ্রীশম্ভুনাথ চক্রবর্ত্তী গুরুজীর নিকট চিদাকাশ কি জানিতে চাহিলেন। গুরুজী জিজ্ঞাসা করিলেন, শূন্য এবং মহাশূন্য মানে কি বুঝ। আমরা কেহই তাহার উত্তর দিতে পারিলাম না। তিনি তখন উত্তরদানপ্রসঙ্গে বলিলেন, শূন্যভেদ হইলে দূরত্ব লোপ পায়—শূন্যভেদ হইলে সঙ্গে সঙ্গে তিনি যেমন ধর—বারীনকে দেখিতে পান তেমনি অন্যকেও—শুধু প্রয়োজন বারীন বা সেই ব্যক্তিবিশেষের স্মৃতি জাগরূক হওয়া। প্রত্যেক ব্যষ্টি জীবকে কেন্দ্র করিয়া তাহার চারিদিকে শূন্য থাকে তাই তাহাকে দেখা যায় না। সেই শূন্যকে ভেদ করিতে পারিলে তাহাকে দেখা যায়। এই শূন্যভেদে ইদং লোপ পায় না। কিন্তু ব্রহ্মাণ্ডের চারিদিকে মহাশূন্য বিরাজ করে। সেই মহাশূন্যকে ভেদ করিতে পারিলে সোঽহং ভাব—আমি ভাব প্রতিভাত হয় অর্থাৎ সবই আমি বলিয়া প্রতিভাত হয় তখন ইদং থাকে না। তখন বারীনকেও 'আমির' মধ্যে

বিরাট 'অহং'-এর মধ্যেই দেখা যায়। এই মহাশূন্য ভেদ হইলেই আত্মসাক্ষাৎকার হয়। এই আত্মসাক্ষাৎকার হয় চিদাকাশে—তখন অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সেই আকাশে ভাসে—যেখানে অতীত, অনাগত বলিয়া কিছুই থাকে না। ইহাই চিন্ময় রাজ্য যাহাকে প্রাচীন মুনি-ঋষিগণ বলিয়াছেন বৈকুণ্ঠধাম। ইহার পর আছে আত্যন্তিক শূন্য যাহা ভেদ করা সম্ভব নয়, তাহা অব্যক্ত।

শূন্য ভেদ হইলে সর্বজ্ঞত্ব লাভ হয়—ঈশ্বরত্ব প্রাপ্ত হয়। ইহাই বিভূতি। ইহার তুলনায় অষ্টসিদ্ধি কিছুই নয়। কিন্তু আত্মজ্ঞান হয় না। এই আত্মজ্ঞানের জন্য মহাশূন্য ভেদ একান্তভাবে প্রয়োজন।

তারিখ—৭।১১।৬৭ সকাল ১১-১০ মিঃ।

আলোচনা শুরু করিলেন ১০৭, ১০৮ এবং ১০৯-কে কেন্দ্র করিয়া। বলিলেন, অনুলোম-বিলোম করিয়া ৫০-৫০ করিয়া ১০০ পূর্ণ হয় আবর্ত্তের পর। তারপর সৃষ্টি আরও বাড়িয়া ১০৫ পর্যন্ত ছিল—১০৪ পর্যন্ত ছিল সাধকের স্থান আর ১০৫ পর্যন্ত যোগীর। ১০৫ হইতে ১০৮ পর্যন্ত শূন্য বিরাজ করিতেছিল। গুরুদেব সেই ব্যবধান কমাইয়া দেন ১০৬ এবং ১০৭ এর সৃষ্টি দ্বারা। ১০৮ হইতেছে অখণ্ড পূর্ণ। কিন্তু সেখানে যাইতে হইলে void, শূন্য, বা ব্যবধান ভেদ করিতে হয়। সেইজন্য গীতায় বলা হইয়াছে 'যদ্ গত্বা ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম' সেখানে দেহে যাওয়া যায় না। মৃত্যুর পর সেখানে যাওয়া যায়। আগামী দিনে সেই void পূর্ণ করিবার ব্যবস্থা হইতেছে। সেই অখণ্ড পূর্ণে যাইতে হইলে আর মৃত্যু-বরণ করিতে হইবে না। এ ধরায় অখণ্ড রাজ্য বিরাজ করিবে—জরা, মৃত্যু আর থাকিবে না।

আবার শূন্য ভেদের কথায় আসিলেন। শূন্য ভেদ হইলে অতীত, অনাগত থাকে না—থাকে অখণ্ড বর্ত্তমান। সেখানে সব কিছু সঞ্চিত আছে। প্রয়োজন স্মৃতির। তাই মনে রাখার এই তাৎপর্য, লোকে বলে আমাকে মনে রাখিবেন। শূন্যকে ভেদ করিতে পারিলে ক্ষণকে পাওয়া যায়। Space থাকে না, যাহা থাকে তাহা hyper-space.

তারিখ—৯।১১।৬৭ সকাল ১০টা।

সৃষ্টির একপ্রান্তে আছেন অখণ্ড সত্তা যেখানে হইতে সমস্ত কিছুর আবির্ভাব হয় আর অপর প্রান্তে চিদণু বা জীব। অখণ্ড সত্তা হইতে অবতারণের সময় জীব অজ্ঞানের অন্ধকারের মধ্য দিয়া নামে—আর আরোহক্রমে জ্ঞানের মধ্য দিয়া বিকাশ ঘটে। এই সৃষ্টির মধ্যে একই ক্ষণে দুইটি জীবের

জন্ম হয় না। তাই জীব সকলের প্রকাশের মধ্যে স্বরূপগত বৈলক্ষণ্য রহিয়াছে।

সন্ধ্যাবেলা স্বরূপগত বৈশিষ্ট্য বুঝাইতে গিয়া বলিলেন, পরম পূজনীয় গুরুদেবকে (শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংসদেব) একবার বলিয়াছিলেন গোলাপ ফুল সৃষ্টি করিতে। তিনি তিনটি গোলাপফুল সৃষ্টি করিয়াছিলেন কিন্তু একটির সঙ্গে আর একটির মিল ছিল না। পাপড়িতে বেশী-কম ছিল এবং রঙের তারতম্য ছিল। এই তারতম্যের কারণ জিজ্ঞাসা করায় বিশুদ্ধানন্দ পরমহংসদেব বলিয়াছিলেন, স্থান এবং কালের পার্থক্যের জন্য ইহা ঘটিয়া থাকে, যাহাকে time, space এবং causality বলা হয়। Time এবং space-এর junction-কে লগ্ন বলা হয়। যখন ব্যক্তি সত্তা বা আত্মা পরমসত্তার চিদণুরূপে অবরোহণ করে তখন তাহাদের মধ্যে পার্থক্য থাকে না। কিন্তু কালরাজ্যের মধ্যে আসার সঙ্গে সঙ্গে স্বরূপগত বৈশিষ্ট্য লাভ করে। সুতরাং জন্মলগ্নের অবদান রহিয়াছে স্বরূপগত বৈশিষ্ট্যলাভে।

ইংরেজীতে এই স্বরূপগত বৈশিষ্ট্যকে quidity বলা হয়—ultimate individuality বলা হয়। It is determined by time space and causality.

আমাদের ইচ্ছা শক্তির সঙ্গে যুক্ত নয় এই জন্য ফলবতী হয় না। এই প্রসঙ্গে তাঁহার গুরুদেবের শক্তিসঞ্চারের কথা বলিলেন। একদিন তিনি অর্থাৎ তাঁহার গুরুদেব বলিয়াছিলেন আপন আপন ইচ্ছা করিয়া হাতের মুঠি বন্ধ করিয়া রাখিতে—তারপর তিনি সেই ইচ্ছায় শক্তিসঞ্চার করায় সেই ইচ্ছিত জিনিষগুলি হাতের মুঠির মধ্যে রূপ লইয়াছিল।

তারিখ—৬।১০।৬৭ বিকাল ৫টা।
আচার্যদেবের ঘরঃ সিগ্‌রা ভবন।
আলোচনার বিষয়বস্তুঃ integration—তদাত্ম্য।

যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই গুরুজী বলিলেন—'তুমি তো আজ সকালে আস নাই—সকালে আজ ভাল আলোচনা হইয়াছে, integration সম্বন্ধে।' তারপর নিজেই আবার বিষয়টা ব্যাখ্যা করিতে শুরু করিলেন।

আলোচনা প্রসঙ্গে বলিলেন, আমরা অন্নময় কোষ হইতে প্রাণময় কোষে যাই। প্রাণময় কোষে প্রথমে স্থিতি হয় না—প্রাণময় কোষ হইতে অন্নময় কোষে পতন হয়। সাধন-জীবনে চেষ্টা করিতে করিতে আবার প্রাণময় কোষে উত্থান হয় এবং সেখানে স্থিতি হয়। প্রাণময় কোষে যাইবার ইচ্ছা হয় কিছু প্রাপ্তির আশায় কেননা আমি তখন নিঃস্ব। সেখানে গেলে এবং সেখানে স্থিতির পর নামিয়া আসিতে পারিলে লাভ হয়। সে লাভ হইতেছে যাঁহারা

অন্নময় কোষে আছেন তাঁহারা প্রাণময় কোষের আনন্দের সন্ধান পান যিনি প্রাপ্তির পর ফিরিয়াছেন তাঁহার নিকট হইতে। যিনি পাইয়া ফিরিয়াছেন তখন আর তিনি নিঃস্ব নন্। তিনি তাঁহার প্রাপ্তধন বা উপলব্ধি অপ্রাপ্তকে বিলাইতে পারেন। তারপর অন্নময় কোষের সহিত প্রাণময় কোষের integration ঘটে—তাহা বৈয়ক্তিকমণ্ডলীর মধ্যে সীমাবদ্ধ।

তারপর প্রাণময় কোষ হইতে মনোময় কোষে যাইবার ইচ্ছা জাগে। মনোময় কোষে এককভাবে যাইতে হয়। মনোময় কোষে প্রথমে স্থিতি হয় না—অনেক চেষ্টা করিবার পর সেখানে স্থিতি হয়। সেই স্থিতি হইবার পর প্রাণময় কোষে নামিতে হয়। প্রাণময় কোষে আসিয়া মনোময় কোষের প্রাপ্তি বিলাইতে হয় অর্থাৎ যাঁহারা প্রাণময় কোষে আছেন তাঁহাদের মনোময় কোষে লইয়া যাইতে হয়। ইহার পর মনোময় কোষ হইতে বিজ্ঞানময় কোষে যাইবার সাধনা শুরু হয়। বিজ্ঞানময় কোষে যাইবার পর যখন সেখানে স্থিতি হয় তখন সেখান হইতে নামিয়া আসিয়া মনোময় কোষের বাসিন্দাদের লইয়া যাইতে হয় বিজ্ঞানময় কোষে অর্থাৎ বিজ্ঞানময় কোষের প্রাপ্তধন মনোময় কোষে নামিয়া বিলাইতে হয়। না বিলাইলে কি পাইলাম তাহা অন্যে জানিতে পারে না। তাছাড়া আমি যে ধনী হইয়াছি সে ধন না বিতরণ করিলে আমার কোন আনন্দ হইবে না। তারপর বিজ্ঞানময় কোষ হইতে আনন্দময় কোষে যাইবার সাধনা শুরু হয়। আনন্দময় কোষে গিয়া স্থিতিলাভ করার পর বিজ্ঞানময় কোষে নামিতে হয় বিজ্ঞানময় কোষের বাসিন্দাদের মধ্যে আনন্দময় কোষের প্রাপ্তধন বিতরণের জন্য। আনন্দময় কোষ হইতে ব্রহ্মে যাইবার সাধনা শুরু হয়। ব্রহ্মপ্রাপ্তির পর সেখান হইতে ব্রহ্মশক্তি লইয়া নামিতে হয় আনন্দময় কোষে। এইভাবে তাদাত্ম্য বা integration complete হয়।

আমাদের দেশে প্রাচীন সাধনায় সাধকের আত্মিক উন্নতি হইত। তাঁহারা বৈয়ক্তিক আনন্দে ডুবিয়া যাইতেন। কিন্তু তাঁহারা নামিয়া আসিয়া জনসাধারণের মধ্যে সে আনন্দ বিতরণ করিতেন না। উপর হইতে নীচে নামিতে হইলে চাই করুণা, চাই প্রেম। পূর্বতন অধ্যাত্মসাধনায় প্রেমের অভাব ছিল—ঐশ্বর্য সে সাধনার অংগ ছিল। কিন্তু আগামী দিনে প্রেমের রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য তাদাত্ম্য স্থাপন বা integration একান্তভাবে প্রয়োজন। তারপর বলিলেন, কালাতীতের অবতরণ কালরাজ্যে হইবে। সেই descent-এর ফলে কালরাজ্যের রূপান্তর ঘটিবে—দুঃখ, জরা, ব্যাধি, মৃত্যু প্রভৃতি কিছুই থাকিবে না। প্রথমে তাহার রূপ নিবে কালসমুদ্রের মধ্যে কালাতীত দ্বীপ, তারপর সেই দ্বীপের প্রসার ঘটিবে। কালসমুদ্র ক্রমশঃ শুকাইয়া যাইবে। সবটাই তখন প্রেমের রাজ্য হইবে। তখন ভগবানলাভ করিতে হইলে ব্যক্তিগত সাধনার

প্রয়োজন হইবে না—শুধু উন্মুখতা থাকিলেই তাঁহাকে লাভ করা যাইবে। যাঁহারা উন্মুখ নন্‌ তাঁহাদের ভগবানলাভ দেরীতে হইবে—তাঁহাদের মধ্যেও উন্মুখতা আসিবে।

* * *

শংকর মানে কি জিজ্ঞেস করায় বলিলেন শং করোতি যঃ সঃ। শং মানে মঙ্গল।

তারিখ—৭।১০।৬৮ সকাল ১০॥টা।

গুরুজী জিজ্ঞেস করিলেন, মন্ত্র জপ কতক্ষণ প্রয়োজন—তারপর নিজেই উত্তরদানপ্রসঙ্গে বলিলেন, মন্ত্র হইতেছে আবাহন, আমন্ত্রণ, নিমন্ত্রণ। ইষ্টকে ততক্ষণ ডাকিতে হয় যতক্ষণ তাঁহার দর্শন না মেলে—দর্শন পাইবার সঙ্গে সঙ্গে জপ শেষ হইয়া যায়। যেমন আমরা মাকে ডাকি—মাকে ডাকি ততক্ষণ যতক্ষণ তিনি দেখা না দেন বা সাড়া না দেন। কিন্তু দেখা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আর মাকে ডাকার প্রয়োজন থাকে না। তেমনিতরভাবে ব্রহ্মময়ী মা —ব্রহ্মাতীত মাকে ডাকিতে হয়। তাঁহার নিকট হইতে সাড়া পাওয়ার পর আর তাঁহাকে ডাকিবার প্রয়োজন থাকে না। কেননা তিনি উপস্থিত থাকেন।

তারপর বলিলেন, ভক্তি দুই প্রকারঃ সাধনভক্তি বা ক্রিয়াভক্তি এবং ভাবভক্তি। সাধনভক্তি বা ক্রিয়াভক্তির সাধনার দ্বারা মুক্তি বা মোক্ষ পর্যন্ত লাভ হইতে পারে কিন্তু তাহাতে প্রেমের সৃষ্টি হয় না। ভাবভক্তিতে প্রেমের সৃষ্টি হয়—রসের সৃষ্টি হয়—রসময়ের আসঙ্গ লাভ করা যায়। ভাবভক্তিই শ্রেষ্ঠ।

তারিখ—৮।১০।৬৮ সকাল ১১টা।

আলোচনা প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করিলেন, প্রকাশ এবং বিকাশ কাহাকে বলে—তাহাদের মধ্যে সম্বন্ধ কি? তারপর নিজেই উত্তর দিলেন—বিকাশে ক্রম আছে। প্রকাশে ক্রম নাই। বিকাশে—evolution আছে—প্রকাশ হইতেছে revelation. বিকাশে বীজ আছে—প্রকাশে বীজ নাই। বিকাশে উপাদান-কারণ বীজ আর নিমিত্ত-কারণ মাটি, আলো, হাওয়া এবং জল। বিকাশে sudden awakening নাই প্রকাশে তাহা আছে। উদাহরণ দিয়া বলিলেন, বীজ বপন করিলে মাটি ফুঁড়িয়া যখন অংকুররূপে নির্গত হয় তখন তাহাকে প্রকাশ বলা যায়—এক কথায় বলা যায় from quantitative change to qualitative change. অধ্যাত্ম জীবনে যখন সাধনা ব্যতিরেকে প্রকাশ ঘটে তখন

তাহা ক্ষণস্থায়ী হয়। কিন্তু সাধনার পথে বিকাশের পথ ধরিয়া যখন প্রকাশ ঘটে তখন তাহা নিত্য জিনিষ হয়—তাহার বিলয় ঘটে না।

গুরুদত্ত বীজমন্ত্র সাধনের ফলে বিকাশের পথ ধরিয়া প্রকাশ ঘটে। যতক্ষণ প্রকাশ না ঘটে ততক্ষণ সাধক জানিতে পারে না সাধনপথে তাহার কোন উন্নতি হইতেছে কিনা—কিন্তু যখন প্রকাশ ঘটে তখন সে বুঝিতে পারে সাধনার ফল ফলিয়াছে।

সাধারণতঃ পুরুষই গুরু হয়—স্ত্রী গুরু হইতে পারে না। যখন স্ত্রী-শরীর দীক্ষা দান করে তখন বুঝিতে হইবে তাঁহার মধ্যে পুরুষ-শরীর কাজ করিতেছে। শ্রীশ্রীসিদ্ধিমাতাকে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিয়াছিলেন তাঁহার মধ্যে নারায়ণ রহিয়াছেন, তিনি দীক্ষা দেন। স্ত্রীশরীরে কিছু ন্যূনতা রহিয়াছে। ইহার ব্যতিক্রমও আছে শাস্ত্রে। যখন স্ত্রীশরীর ব্রহ্মজ্ঞান বা আত্মজ্ঞান লাভ করে তখন তাঁহার দীক্ষা দিবার অধিকার জন্মে কেননা আত্মা পুরুষ।

তারিখ—১০।১০।৬৮।

আজ সকালে এবং বিকালে কাল ও ক্ষণ সম্বন্ধে কিছু লেখাইয়া দিয়াছেন। তাহার সারাংশ যাহা মনে আছে তাহা মোটামুটি এইরূপ ঃ

ক্ষণে স্পন্দনের ফলে কালের সৃষ্টি হয়। কালের সৃষ্টিতে ক্রম ধরিয়া বিকাশ হয় এবং বিকাশের ক্রম পূর্ণ হইলে প্রকাশ দেখা দেয়। ক্ষণে ভগবানের দর্শন লাভ হয়। ক্ষণ হইতেছে নিত্য বর্ত্তমান যেখানে অতীত বা ভবিষ্যৎ নাই। সুতরাং অখণ্ডের দর্শন খণ্ডকালে সম্ভব নয়। যাঁহারা এ পর্যন্ত দর্শন পাইয়াছেন তাঁহারা পরম পুরুষের খণ্ড দর্শন পাইয়াছেন—অখণ্ড দর্শন পান নাই। [এই আলোচনা শুনিবার পর আমার মনে হইয়াছে শিক্ষার বিকাশের ক্রম ধরিয়া। এই প্রসঙ্গে স্বামীজীর উক্তি প্রণিধানযোগ্য "Education is the manifestation of perfection already in man."]

তারিখ—১৪।১০।৬৮ দুপুর ১২টা।

গুরুজীর ঘর ঃ সিগ্‌রা ভবন।

গুরুজী বলিলেন, অধ্যাত্মসাধনায় দুইটি ধারা আছে—একটি যোগের পথ আর একটি বিয়োগের পথ। যোগের পথে ঘটে রূপান্তর আর বিয়োগের পথে ত্যাগ, যাকে বলা হয় বিবেকখ্যাতি। দুই ধারায় প্রজ্ঞাভূমি পর্যন্ত মিল আছে। তারপর দুই ধারা পৃথকভাবে অগ্রসর হয়। এর পূর্বে আলোচনা-

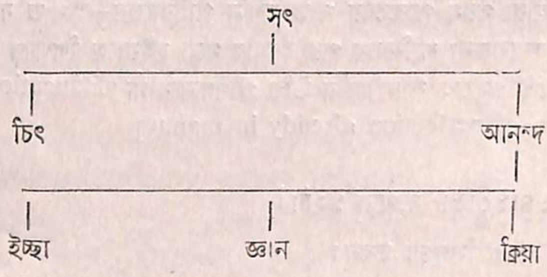
প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে বাম আবর্ত্ত সম্পন্ন হইবার পর ব্রহ্মসাক্ষাৎকার ঘটে। তারপর গুরুকৃপায় ফিরিবার পথে 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' মনে হয়। এর কারণ সাধকের চিতিশক্তি প্রাপ্তি। তাহার পূর্বে এই চিতিশক্তির সঙ্গে যোগ থাকে না।

বৈষ্ণব সাহিত্যে বাম আবর্ত এবং দক্ষিণ আবর্তকে বলা হয় জটিলা আর কুটিলা গতি—সরল গতিকে বলা হয় রাধা গতি। দুইটি আবর্ত শেষ হইবার পর সরলরেখা খুলিয়া যায় যাহাকে সুষুম্না পথ বলা হয়। তারপর ভগবান দৃষ্টির সামনে সবসময় অবস্থান করেন। ইহার পর সুরু হয় রূপসেবা। দুইটি আবর্ত শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে কর্ম শেষ হইয়া যায়। তখন শুধু দেখা ব্যতীত আর কিছু করিবার থাকে না। তারপর ধীরে ধীরে দূরত্ব লোপ পায় তখন ভক্ত ও ভগবানে মিলন হয় এবং ভগবান ভক্তে প্রবেশ করেন—সাম্যের সৃষ্টি হয়। তারপর একই থাকে—আর কিছুই থাকে না। ইহাই সত্যকার অদ্বৈত স্থিতি।

তারিখ—১৫।১০।৬৮।

আলোচনাপ্রসঙ্গে ত্রিশূলের তাৎপর্য সম্বন্ধে বলিতেছিলেন। ত্রিশূলের তিনটি শূল—ইচ্ছা, জ্ঞান এবং ক্রিয়াশক্তিকে বুঝায়। তাহার উপরে আছে চিৎ এবং আনন্দ—তাহার উপরে শুধু সৎ।

Diagram আঁকিলে এইরূপ দাঁড়াইবে—



তারিখ—১৬।১০।৬৮।

আলোচনাপ্রসঙ্গে গুরুজী বলিলেন, God is whose point is everywhere but circumference is nowhere.

সৎ (সত্তা)

অ (অনুত্তর কলা) — আ (আনন্দ কলা)

অ (অনুত্তর কলা)
|
চিৎশক্তি
|
প্রকাশ

অনুত্তরের পশ্চাৎদেশে সৎ অর্থাৎ সত্তা বিদ্যমান। এই সত্তাকে সত্য বলা চলে। অনুত্তরও অব্যক্ত—ইহা চিৎশক্তি। প্রকাশ যখন নিজেকে দেখিতে পায় তখন আনন্দ হয়। আনন্দ ক্ষুব্ধ হইলে ইচ্ছার উদয় হয়। ইচ্ছার পর আসে জ্ঞান। তারপর ক্রিয়ার দ্বারা তাহা objectified হয়। তারপর ক্রিয়াকলা জ্ঞান-কলায় প্রবেশ করে। জ্ঞানকলা আনন্দকলায় প্রবেশ করে এবং আনন্দকলা অনুত্তরে প্রবেশ করে এবং 'অং'-এর সৃষ্টি হয়। 'অং'-কে বলা হয় কলা-সমষ্টি। সৃষ্টির ক্রমে কলার পর তত্ত্বের সৃষ্টি হয়। তত্ত্বের পর ভুবন। 'ক' হইতে 'হ' পর্যন্ত হইতেছে মাতৃকা। তারপর পূর্ণাহন্তার সৃষ্টি হয়—'অহং'। ইদার পর আসে ইদন্তা · এই ইদন্তার মধ্যে অনন্ত সৃষ্টি নিহিত আছে।

*   *   *

ব্রহ্মলোক, বিষ্ণুলোক বলিতে কি বুঝায় জিজ্ঞেস করায় বলিলেন, বুঝায় আলোক।

তারিখ—১৯।১০।৬৮ সকাল ১০॥টা।

আজ সকালে শকুন্তলা দেবীকে 'প্রত্যাভিজ্ঞা হৃদয়' পড়াইবার পর কলা, তত্ত্ব, ভুবন, বর্ণ, মন্ত্র এবং পদের তুলনামূলক আলোচনা করিলেন—তুলনা-মূলক আলোচনা করিয়া দেখাইলেন দুইয়ের মিল এবং গরমিল।

গুরুজী বলিলেন, বর্ণ হইতেছে অখণ্ড প্রকাশের একটা বিচ্ছুরিত স্ফুলিঙ্গ। এই স্ফুলিঙ্গ হইতে মন্ত্রে আলোর উদ্ভাস সৃষ্টি হয়—সেখানে শুধু প্রকাশই প্রকাশ। তারপর সেই প্রকাশে আসে পদ, সমস্ত সৃষ্টির মূল। বর্ণ আসে অনাখ্যা হইতে—ইহাকে অখণ্ড প্রকাশ বলা চলে।

তারপর শক্তি সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে বলিলেন, শক্তিকে মোটামুটিভাবে তিন ভাগে ভাগ করা চলে। চিৎশক্তি, তটস্থ শক্তি এবং স্বরূপশক্তি। স্বরূপ-

শক্তি হইতেছে বাক্‌শক্তি। ইহাই ব্রাহ্মী শক্তি—ইহাই পরাবাক্‌। পরাবাকের পরে আসে পশ্যন্তী। পশ্যন্তীর পরে মধ্যমা এবং তারপর বৈখরী।

তারিখ—২১।১০।৬৮ সন্ধ্যা ৬টা।

আলোচনার বিষয়বস্তু ভাব-ভক্তি, প্রেম-রস এবং নিত্যলীলায় প্রবেশ। ভক্তি-জ্ঞান-মোক্ষ।

প্রথমটি ভাব-ভক্তি আর দ্বিতীয়টি ভাবহীন ভক্তি—তাহা হইতে জ্ঞানের বিকাশ হয় এবং তাহার পর মোক্ষলাভ হয় কিন্তু প্রেমের উদয় হয় না। প্রেমের উদয় না হইলে জনসাধারণের উন্নতির কোন উপায় নাই—ব্যষ্টির মুক্তিলাভ শুধু সম্ভব।

আলোচনাপ্রসঙ্গে গুরুজী আরও বলিলেন, এখনও কালের সঙ্গে কালাতীতের যোগ আছে এবং তাহা হৃদ্দেশে অর্থাৎ হৃদয়ে। আগামীদিনে কালে যে কালাতীতের অবতরণ হইবে তাহা হৃদয়স্থিত কেন্দ্রবিন্দুতে অর্থাৎ কালের কেন্দ্রবিন্দুতে। তারপর কালাতীত ক্রমশঃ কালকে গ্রাস করিবে। এ অবস্থায় তাঁহাকে পাইতে হইলে উন্মুখতাই যথেষ্ট হইবে—সাধন ভজনের প্রয়োজন হইবে না। প্রেম না থাকিলে জগৎকল্যাণ সম্ভব নয়—রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ভাষায় চাপরাশ চাই—এ হচ্ছে সেই প্রেমরূপী চাপরাশ।

গুরুজী তুলনামূলক আলোচনায় বলিলেন, ভাব হইতেছে পঞ্চদশী, প্রেম ষোড়শী আর রস সপ্তদশী।

তারিখ—২৩।১০।৬৮ সকাল ১০টা।

গুরুজী কথাপ্রসঙ্গে বলিলেন, জগতে দুই বিন্দুর খেলা চলিতেছে। দুই বিন্দু এক হইলে সমস্ত সৃষ্টি চোখের সামনে ভাসিয়া ওঠে। এক হইতে দুই এবং দুই হইতে বহুর আবির্ভাব। বহুর আবির্ভাব হয় মায়ার জগতে। এক হইতে বহুতে যাওয়া যায় অজ্ঞানের মাধ্যমে, আর বহু হইতে একে যদি আসা যায় দুইকে বাদ দিয়া তাহা হইলে বিলয় ঘটে। তাই দুইয়ের এত মহিমা—শক্তির স্ফুরণ বলা চলে।

তারিখ—২৫।১০।৬৮ দুপুর ১২টা।

আলোচনাপ্রসঙ্গে গুরুজী বলিলেন, সংস্কার দুই প্রকার—কর্মসংস্কার এবং বাসনাসংস্কার। বাসনাসংস্কার কাটে কিন্তু কর্মসংস্কার ভোগ ব্যতীত ক্ষয় হয় না।

শিষ্য মানে শাসনযোগ্য। শিষ্যকে গুরুর নিকট হইতে শিক্ষা লইতে

হইলে সংস্কারমুক্ত হইতে হইবে। সংস্কারশূন্য হৃদয় ব্যতীত নূতন কিছু গ্রহণ করা খুবই কঠিন।

তারিখ—২৭।১০।৬৮ রাত্রি ১১টা।

গুরুপ্রণামের ব্যাখ্যা দিলেন। তারপর জিজ্ঞাসা করিলেন, সাধনা কেন প্রয়োজন। আমি বলিলাম, ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য। আমার উত্তর যথার্থ হইল না দেখিয়া গুরুজী বলিলেন, প্রথমে প্রাপ্তি তারপর সাধনার প্রয়োজন।

তারিখ—২৯।১০।৬৮।

আলোচনাপ্রসঙ্গে বলিলেন, বেদান্ত অনুযায়ী মন পঞ্চভূতের সার লইয়া গঠিত। কিন্তু আগম অনুসারে চিৎশক্তির রশ্মি এবং পঞ্চভূতের মিলনে মন তৈয়ারী।

শিবের পঞ্চমুখ: অনুত্তর, আনন্দ, ইচ্ছা, জ্ঞান এবং ক্রিয়া। মন করণ—মনের ক্রিয়াশক্তি নাই। ক্রিয়াশক্তি পাইতে হইলে আত্মার সঙ্গে যোগ প্রয়োজন—সেটা মনের motive power—আত্মসংযম।

ক্রিয়াশক্তি সব চাইতে বড়। প্রথম সৃষ্টি কলাত্মক জগৎ। সেখানে মহাকালও নাই, কালও নাই।

Aristotle-এর unmoved mover রাধাকৃষ্ণ তত্ত্ব—রাধাকৃষ্ণ স্থির কিন্তু সখীদের move করাচ্ছেন। তিনি সবাইয়ের হৃদ্দেশে থাকিয়া সবাইকে ঘুরাই-তেছেন। হৃদ্দেশে তিনি আছেন।

বিন্দু কম্পিত হইলে অসংখ্য রশ্মি বিস্তার লাভ করে—সেই রশ্মি অনন্ত, অসংখ্য, তাহা লইয়া মণ্ডল হয়। যাহা নিষ্কল তাহা লইয়া মণ্ডল হয় না। পরমেশ্বরের দুইটি দিক—একটা সকল, অপরটি নিষ্কল। ক্রিয়াশক্তির স্ফুরণে সকল অবস্থার সৃষ্টি হয়। দুই মিলিয়া পরমেশ্বর। তাঁহার পরমপদ যিনি দর্শান, তিনিই গুরু।

বিন্দু এবং বিসর্গের ফলে তিন বিন্দুর সৃষ্টি হয়। প্রথম বিন্দুতে কলা সৃষ্টি হয়। বিসর্গে তত্ত্ব সৃষ্টি হয়। কলা স্বরবর্ণ আর বিসর্গ ব্যঞ্জনবর্ণ।

কুণ্ডলিনী in its full expansion is called ঊর্ধ্ব কুণ্ডলিনী—মহতো মহীয়ান্। কুণ্ডলিনী in its full contraction is called অধো কুণ্ডলিনী—অণোরণীয়াম্।

তারিখ—৩০।১০।৬৮ রাত্রি ৯টা।

মা জীবেরও মা এবং শিবেরও মা।

শক্তি শিবের মা, শিবের গৃহিণী এবং শিবের কন্যা। শিবের মার

conception বুঝা খুবই কঠিন। খুব কম লোকেই এ অবস্থা বুঝে। অখণ্ড প্রাপ্তি সবাইয়ের ভাগ্যে নাই। যাঁহারা শুধু earmarked তাঁহারাই অখণ্ডকে লাভ করিতে পারেন। অখণ্ডকে একজন পাইলেই সবার পাওয়া হইয়া যাইবে। এখন পর্যন্ত অখণ্ডপ্রাপ্তি কাহারও ঘটে নাই।

মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য পুরুষোত্তম অবস্থা প্রাপ্তি—এই অবস্থাপ্রাপ্তির সময় ক্রম শেষ হইয়া যায়--ক্ষণে প্রাপ্তি ঘটে। পুরুষোত্তম অবস্থা প্রাপ্তির পর ব্রহ্মাতীত মাকে চেনা যায়। তখন মায়ের কোলে বসিয়া অনন্তলীলা দর্শন সম্ভব। মা-ই একমাত্র অখণ্ডে লইয়া যাইতে পারেন, অন্য কেহ নহে।

'অ' হইতেছে অনুত্তর—চিৎপ্রকাশ—আনন্দময়ী মায়ের ভাষায় ঢালা আলো। সেই চিৎপ্রকাশের এক কোণে কলনের ফলে আনন্দের উদ্ভব হয়। এ আনন্দ আসে নিজেকে নিজে দেখে। আনন্দ ক্ষুব্ধ হওয়ার ফলে ইচ্ছার উদয় হয়। ইচ্ছার উদয়ের পর আসে জ্ঞান—ইহাই উন্মেষ নামে খ্যাত। জ্ঞানের পর আসে ক্রিয়া। এই প্রকারে ৫টি কলার উদ্ভব হয়। কলাসৃষ্টির অবরোহক্রমের পর আরোহক্রম সুরু হয়। এই আরোহক্রমে অনুত্তরের 'অ'র সঙ্গে বিন্দুর যোগ হয়ে হয় 'অহং'। অনুত্তরের ওপারে আছে সৎ, তাহাকে সত্য বলা হয়। সে যে কি তাহা কেহই প্রকাশ করিতে পারে না।

তারিখ—৯।৪।৬৯ সকাল ১০টা।
গুরুজীর ঘরঃ সিগ্‌রা ভবন।

আলোচনার বিষয়বস্তু আবর্ত গতিঃ দক্ষিণ আবর্ত এবং বাম আবর্ত।

বাম আবর্ত গতি শেষ হইবার পর দক্ষিণ আবর্ত সুরু হয়—এই দ্বিতীয় গতি একমাত্র গুরুর বিশেষ কৃপা ছাড়া পাওয়া সম্ভব নয়। বাম আবর্ত গতিতে অগ্রসর হইবার সময় সব ত্যাগ করিতে করিতে যাইতে হয়। কিন্তু যখন বিলোম গতি সুরু হয় তখন বুঝা যায় যাহা ত্যাগ করিয়াছিলাম তাহা আমারও অংশ—এই ক্ষমতা আসে শক্তির সঙ্গে যুক্ত হওয়ার ফলে। শক্তির সঙ্গে যোগলাভ সম্ভব হয় একটা আবর্ত গতি সম্পূর্ণরূপে পরিক্রমার পর। অনুলোম গতি এবং বিলোম গতি শেষ হওয়ার পর সরলপথ খুলিয়া যায়, তখন দৃষ্টির সামনে ইষ্টকে বা ভগবানকে দেখা যায়। তখন আর কিছু করণীয় থাকে না—শুধু দেখা ছাড়া। তারপর দুইয়ের ব্যবধান কমিতে থাকে। কমিতে কমিতে একের সঙ্গে অন্যের মিলন হয়—শিবের অভ্যন্তরে শক্তি, শক্তির অভ্যন্তরে শিবের প্রবেশ ঘটে। ইহার পর সাম্যাবস্থার সৃষ্টি হয়। তারপর আসে অদ্বয় অবস্থা।

সবগুলি তত্ত্বভেদের পর আত্মসাক্ষাৎকার ঘটিলে পরিচিতির পরিধি বাড়ে,

তাহাতে লোককল্যাণের সুবিধা হয়। সবগুলি তত্ত্বভেদের পূর্বে আত্মসাক্ষাৎকার ঘটিলে ভগবত্তালাভের দিক হইতে কমিতে থাকে না বটে কিন্তু লোককল্যাণের পরিধি তাহার দ্বারা সীমিত হয়।

তারিখ—১০।৪।৬৯ সকালবেলা।

আলোচনাপ্রসঙ্গে গুরুজী বলিলেন, শুদ্ধসত্তার দ্বারা গুরুগিরি সম্ভব নয়। এজন্য একটু খাদ থাকা প্রয়োজন।

বিকল্প বুঝাইতে গিয়া বলিলেন, খাঁটি সোনার তাল এবং তাহা হইতে গহনা সৃষ্টির পর যে অবস্থা সৃষ্টি হয়—বিকল্প হইতেছে গহনা তৈয়ারীর পরের অবস্থা।

হঠযোগ এবং রাজযোগ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করায় বলিলেন, হঠযোগ প্রাণের ক্রিয়াকে স্তব্ধ করে, রাজযোগ মনকে স্তব্ধ করে আর মন্ত্রযোগ বা শব্দযোগ পরব্রহ্ম পর্যন্ত লইয়া যায়।

তারিখ—১০।৪।৬৯।

গুরুজী কথাপ্রসঙ্গে বলিলেন, দীর্ঘদিন পূর্বের কথা—একদিন সন্ধ্যায় গঙ্গার ঘাটে বসিয়াছিলাম, সঙ্গে আর এক ভদ্রলোক ছিলেন। তিনি দূরে নৌকার উপর হইতে ভাসিয়া আসা গান শুনিয়া গায়কের কাপড় প্রভৃতি এবং তাহার স্থিতি সম্বন্ধে বলিলেন। পরে ঘাটে নৌকা আসিয়া ভিড়িলে দেখা গেল ভদ্রলোকের ঐ description-এর সঙ্গে সব মিলিয়া গিয়াছে। ইহাকে বলে শব্দবিজ্ঞান বা নাদ-বিজ্ঞান। এই নাদ বা আলোকের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। নাদ হইতে আলোকের সৃষ্টি। সূর্যকে 'রবি' বলা হয়। রব যে করে সেই রবি। এই নাদ-বিজ্ঞানের মধ্যে গভীর সৃষ্টিতত্ত্ব নিহিত।

তারিখ—১১।৪।৬৯ সন্ধ্যা ৭টা।
গুরুজীর ঘরঃ সিগ্রার ভবন।

আলোচনার বিষয়—প্রকৃতির সদৃশ পরিণাম এবং বিসদৃশ পরিণাম। এখানে প্রকৃতি বলিতে প্রকৃতির গুণাবলীর কথা বলা হইতেছে। সদৃশ পরিণামে সত্ত্বগুণ সত্ত্বই থাকে, রজোগুণ রজোই থাকে, তমোগুণ তমোই থাকে —শুধু পরিবর্ত্তন ঘটে। কিন্তু এ পরিবর্তনে প্রস্তুতি থাকে অর্থাৎ প্রকৃতির স্বামী পুরুষের beck and call-এ সাড়া দিবার জন্য প্রস্তুত থাকে।

বিসদৃশ পরিণাম না হইলে সৃষ্টি হইতে পারে না। সৃষ্টির জন্য বিসদৃশ পরিমাণ প্রয়োজন। এই বিসদৃশ পরিণামে সত্ত্ব, রজঃ এবং তমোগুণের মিশ্রণ ঘটে এবং তাহার ফলে সৃষ্টি হয়। কথাপ্রসঙ্গে বলিলেন, "বহুদিন

পূর্বের কথা। তখন গুরুদেব দেহে ছিলেন। একদিন তাঁহার নিকট আমরা কয়েকজন গুরুভাই গিয়াছিলাম। গুরুদেব আমাদিগকে ইচ্ছার সঙ্গে শক্তির যোগের কথা বলিলেন এবং আমাদের ইচ্ছার সঙ্গে তিনি শক্তি যুক্ত করিয়া বিভিন্ন জিনিষের সৃষ্টি করিলেন।" তখন তিনি (আচার্যদেব) গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, শুধু ইচ্ছাশক্তির দ্বারাই কি সৃষ্টি হয়? উত্তরে গুরুদেব বলিয়াছিলেন, হয়। তখন তিনি গুরুদেবকে তিনবার তিনটি গোলাপ ফুল তৈয়ারী করিতে বলিয়াছিলেন—তিনবারই ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে গোলাপ সৃষ্টি হইল। কিন্তু দেখা গেল তিনটি গোলাপ তিনরকম হইয়াছে অর্থাৎ একটিতে ১০টি, একটিতে ৯টি এবং একটিতে ১২টি পাপড়ি ছিল। এই পার্থক্যের কারণ জিজ্ঞাসা করায় গুরুদেব বলিয়াছিলেন, ইহা লগ্নের দরুণ হইয়াছে। লগ্ন বলিতে বুঝায়—intersection of time and space। তবে এই পাপড়ির difference হইত না যদি পূর্ব হইতে সংকল্প থাকিতে সম-সংখ্যক পাপড়িযুক্ত গোলাপ তৈয়ারীর।"

আলোচনার বিষয়ঃ অণ্ডাকার আলো।

প্রত্যেক ব্যক্তিকে ঘিরিয়া অণ্ডাকার আলো থাকে। এই আলো হইতে সেই ব্যক্তির স্থিতি বুঝা যায়। এই অণ্ডাকার আলো কালের বস্তু। কিন্তু প্রকাশ তাহা নহে, অবশ্য এই অণ্ডাকার আলো সবাই দেখিতে পায় না—যাহার দৃষ্টি খুলিয়াছে তাহারই নিকট ইহা প্রতিভাত হয়। এই আলো হইতে সেই ব্যক্তির কাম, ক্রোধ প্রভৃতি সবই বুঝা যায়।

প্রকাশ নিষ্কল আর অণ্ডাকার আলো কলাযুক্ত।

তারিখ—১২।৪।৬৯ সকাল ১১।৷টা।

বারীনবাবুকে উপদেশদানপ্রসঙ্গে নাটকে অভিনয়ের কথা তুলিলেন। বলিলেন, নাটকে সূত্রধার থাকে। নাটকে সূত্রধারের অধীনে নট এবং নটী অভিনয় করিয়া থাকে। আমরা জীবনে অভিনয় করি না, কেননা অহংকার দ্বারা পরিচালিত হই।

সত্যকার নাটকে সাকার চৈতন্য অভিনেতা সাজেন আর নিরাকার চৈতন্য থাকেন দ্রষ্টা। আমরা জীবনরূপ নাটকে পরমাত্মস্বরূপ সূত্রধরকে যদি মানিয়া লই তাহা হইলে আর নালিশ থাকে না। দুঃখভোগ থাকে না। আমরা পরমস্বরূপকে যদি মাতৃরূপে গ্রহণ করি তাহা হইলে তাঁহার নিকট আব্দার করিতে পারি। তিনি সব মলিনতা মুছাইয়া কোলে তুলিয়া লন। তিনি দোষের বিচার করেন না। তিনি স্নেহ-প্রেমে ছেলেকে কোলে তুলিয়া লন।

তাই critical না হইয়া, সমালোচনা না করিয়া তাঁহাকে মানিয়া লওয়া বাঞ্ছনীয়।

তারিখ—১২।৪।৬৯ সন্ধ্যা ৬॥টা।

এক, দুই, তিনের রহস্য আলোচনাপ্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করিলেন, ত্রিকোণ কখন হয় এবং কেন হয়? তারপর নিজেই উত্তরদানপ্রসঙ্গে বলিলেন, আমি যদি দশাশ্বমেধ ঘাটে গঙ্গাস্নানে যাইবার সংকল্প করিয়া বাহির হই এবং সেখান হইতে সংকল্প অনুযায়ী স্নান করিয়া ফিরিয়া আসি তাহা হইলে সে সংকল্প পূর্ণ হইয়া গেল। তারপর ফিরিয়া যদি আবার সংকল্প করি এবং তাহা পূর্ণ করি তাহা হইলে দ্বিতীয় সংকল্প হয় না,—প্রথমই থাকে। কিন্তু প্রথম সংকল্প পূর্ণ হইবার পূর্বেই যদি দ্বিতীয় সংকল্প গ্রহণ করি এবং দ্বিতীয় পূর্ণ হইবার পূর্বে তৃতীয় সংকল্প গ্রহণ করি তাহা হইলে হয় সংসার অর্থাৎ অসংখ্য অপূর্ণ সংকল্পের সমষ্টি এবং যাবার ফলে আবর্তন শেষ হয় না।

সংকল্প পূর্ণ হওয়াই জীবন্মুক্তের লক্ষণ অর্থাৎ আমি যদি সংকল্প অনুযায়ী দশাশ্বমেধ ঘাট হইতে স্নান করিয়া ফিরিয়া আসি, তাহা হইলে দুইটি রেখা হয়। দুইটি রেখা দ্বারা কোন space-কে enclose করা যায় না। এক হইতেছে বিন্দু। বিন্দুতে স্পন্দনের ফলে রেখার সৃষ্টি হয়। একই রেখা ঘুরিয়া বিন্দুকে আবরণ করিতে পারে, তখন তাহা হয় শিবলিঙ্গ।

কিন্তু তিনটি রেখার সমন্বয়ে ত্রিকোণের সৃষ্টি হয়। ত্রিকোণ হইতেছে বিশ্বজননী। তিনিই সবকিছু সৃষ্টি করিতেছেন। এই বিন্দু আর ত্রিকোণ বুঝিলে সমস্ত সৃষ্টিরহস্য বুঝিবার পথ উন্মুক্ত হইয়া যায়।

আবার আবর্তগতি সম্বন্ধে আলোচনা সুরু করিলেন।

বাম আবর্ত complete করার পর আমি আমার পৃষ্ঠভূমি দেখিতে পাই অর্থাৎ ইহা হয় নির্গুণ ব্রহ্মসাক্ষাৎকার। প্রথম আবর্ত complete করার সময় আমি ত্যাগ করিতে করিতে অগ্রসর হই অর্থাৎ অচিৎ গুণাবলী ত্যাগ করিতে করিতে নির্গুণ ব্রহ্মস্বরূপ সাক্ষাৎকার হয়। এই নির্গুণ ব্রহ্মে শক্তির প্রকাশ নাই। প্রথম আবর্ত complete করার পর গুরুকৃপা হইলে আমার মুখ ফিরাইয়া দেন (গুরুকৃপা হওয়ার কারণ আমার মধ্যে কাজ করার বাসনা—অন্যকে ভাল জিনিষ দিবার বাসনা) তাহার ফলে আমি ফিরিবার সময় চিৎ-শক্তিযুক্ত হইয়া ফিরি। তখন দেখি যাহা আমি ত্যাগ করিয়াছিলাম তাহা আমারই জিনিষ—তাই গ্রহণ করিতে করিতে ফিরি। পুনরাবর্তন যখন শেষ হয় তখন দেখি আমার সম্মুখভাগ। অর্থাৎ আমার পূর্ণ আত্মসাক্ষাৎকার ঘটে

তখন আমি বিশ্বরূপ দর্শন করি। এই পুনরাবর্তন না হইলে পূর্ণতাপ্রাপ্তি হয় না। পূর্ণতাপ্রাপ্তি না ঘটিলে লোককল্যাণ করা সম্ভব হয় না।

তারিখ—১৩।৪।৬৯ বিকাল ৪॥টা।

তত্ত্বকথা আলোচনাপ্রসঙ্গে গুরুজী আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, পঞ্চদশী হইতে ষোড়শী এবং ষোড়শী হইতে সপ্তদশী যাইবার পথ কি? আমি উত্তর দিতে পারিলাম না। তখন তিনি বলিতে সুরু করিলেন, পঞ্চদশীতে কালের কলন আছে, তাই তাহা অপূর্ণ—তাহাতে আবর্তন আছে। ষোড়শী পূর্ণ কালাতীত কিন্তু তাহা নিষ্ক্রিয়। সপ্তদশী হইতেছেন উমাকুমারী—তিনি পূর্ণ এবং সক্রিয়। পঞ্চদশীতে চিৎ এবং অচিৎ মিলিত থাকে; কিন্তু ষোড়শীতে অচিৎ নাই। তবে চিৎ-এর মধ্যেও দুই ভাগ আছে—শিব ও শক্তি। শিবশক্তির মিলনের মধ্য দিয়া সপ্তদশীতে পেঁাছাইতে হয়। সপ্তদশীই উমাকুমারী—শিব হইতে সমস্ত শক্তিকে গ্রহণ করিয়াছেন উমাকুমারী। ষোড়শী হইতে সপ্তদশীতে যাইবার চারটি পথ আছে—প্রাসাদ, পরাপ্রাসাদ, অপরাপ্রাসাদ, পরা-অপরাপ্রাসাদ।

শক্তিপাতের পর দীক্ষা হয়। সদগুরুর নিকট দীক্ষার জন্য গেলে তিনি বলেন "এখনও সময় হয় নাই—কিছুদিন পরে আসিও।" ইহা হইতেই বুঝা যায় শক্তিপাত হয় নাই অর্থাৎ পরমেশ্বরের অনুগ্রহ হয় নাই।

দীক্ষা অনেক প্রকারে হয়—তবে প্রধানতঃ দুইভাবে দেওয়া হয়ঃ গুরু নিজের অর্জিত সাধনফল শিষ্যকে অর্পণ করেন—ফলে শিষ্য তাড়াতাড়ি সাধন-পথে অগ্রসর হয় এবং তাহার পরমপ্রাপ্তি ঘটে। অন্যক্ষেত্রে গুরু নিজে অর্জিত সাধনফল শিষ্যকে দেন না। তাহাকে যাহা দেন, তাহা সাধন করিতে করিতে অগ্রসর হইতে হয়—গুরুদত্ত কর্ম গোড়া হইতেই সুরু করিতে হয়।

তারিখ—১৪।৪।৬৯--১লা বৈশাখ, ১৩৭৫—সন্ধ্যাবেলা।

আজ সকালে গুরুজীর নিকট হইতে কোন তত্ত্বকথা শুনি নাই—সারাদিন ক্লান্ত ছিলেন। সন্ধ্যাবেলা বলিলেন, মন যেন দুমুখী সাপ, বহির্মুখীন হইলে ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে যোগে চঞ্চল হয়—সাধনার পরিপন্থী হয়। আর সেই মন অন্তর্মুখীন হইলে অধ্যাত্মপথের সহায় হয়। মনের বিনাশ কাম্য নয়। সাধনার উচ্চতর অবস্থায় মনের সাহায্যে লীলা উপভোগ করা যায়।

তারিখ—১৫।৪।৬৯—২রা বৈশাখ, ১৩৭৫।

চক্ষু খুলিলে ইন্দ্রিয়ের সামনে যে আকাশ দেখিতে পাই তাহাই ভূতাকাশ। চক্ষু বন্ধ করিলে চিত্তাকাশ দেখা যায়, তাহা অন্ধকারময়। ইহাকে

জেলের সেলের সঙ্গে তুলনা করা চলে—চারিদিকেই বন্ধ উপর দিকে শুধু একটু ফাঁক আছে। সেই ফাঁকের মাধ্যমে আলো প্রবেশ করে তাহাতে সেল্‌টি একটু আলোকিত হয়। চিত্তাকাশের অন্ধকার চিত্তশুদ্ধির মাধ্যমে দূর হয়। চিত্তশুদ্ধি হয় জপ, ধ্যান দ্বারা। তারপর চিত্তাকাশে চিদাকাশের আলোক প্রবেশ করে।

তারিখ—২২।৪।৬৯ রাত্রি ১০টা।

গুরুজী আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, স্পর্শ করা এবং স্পৃষ্ট হওয়ার মধ্যে পার্থক্য কি? বলিলেন, আমি তোমাকে স্পর্শ করিয়া আছি, তুমি কি ইচ্ছা করিয়া আমাকে স্পর্শ করিতে পার? যোগের কোন্ অবস্থায় ইহা ঘটে? আমি উত্তরে বলিলাম, আপনি যদি স্থূল দেহে থাকেন তাহা হইলে আমার পক্ষে আপনাকে স্পর্শ করা সম্ভব নতুবা নয়। ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন, দুইজন যদি একই স্থিতিতে না থাকে, তাহা হইলে একের পক্ষে অন্যকে স্পর্শ করা সম্ভব নহে।

তারিখ—২৮।৪।৬৯ সকাল ১০টা।
গুরুজীর ঘরঃ সিগ্‌রা ভবন।

গুরুজী উপদেশচ্ছলে অনেক কথাই বলিলেন। অন্তেবাসী কাহাদের বলে ব্যাখ্যা করিলেন। গুরুর নিকট শিষ্যরা অন্তেবাসী। তাহাদের নিকট সব-সময়ের জন্য তিনি আছেন। তাঁহার এই অবস্থান শিষ্যরা বুঝিতে পারে না তাহাদের আবরণের জন্য।

বাহ্যজগতের সবকিছুই গুরু এবং শিষ্যের নিকট প্রতিভাত। কিন্তু আন্তরজগতের সবকিছু সেইভাবে শিষ্যের নিকট প্রতিভাত নয়। আন্তর-জগতের সবকিছু যখন তাহার নিকট প্রতিভাত হইবে তখন তাহার আবরণ কাটিয়া যাইবে।

তারিখ—১৫।১০।৬৯ বিকাল ৪টাঃ স্থান—শ্রীশ্রীমায়ের ঘর, কন্যাপীঠ।

ঘুম হইতে উঠিবার পর বলিলেন, বর্ণমালা দিয়া কি ভাবে জগৎ সৃষ্টি হয়, মনুষ্যদেহ সৃষ্টি হয়, মাতৃগর্ভে কি ভাবে দেহ রচনা হয় তাহার রহস্য খুলিয়া গিয়াছে। সমস্ত সৃষ্টির রহস্য চোখের সামনে জ্বল্ জ্বল্ করিয়া ভাসিতেছে। এখন সময় নাই, সময় হইলে লিখাইয়া দিব।

আলোচনাপ্রসঙ্গে বলিলেন, জ্ঞানের সঙ্গে বোধ না আসিলে বিজ্ঞান হয় না। জ্ঞানের পর বোধ—বোধের পর বিজ্ঞান।

সন্ধ্যার পর চন্দনদির প্রশ্নের উত্তরে গীতার রহস্য আলোচনা করিলেন। আলোচনাপ্রসঙ্গে গুরুজী বলিলেন, গীতায় সাধনের আরোহমার্গের কথা আছে। যেমন মানুষের বাল্য, কৈশোর, যৌবন, জরা আছে তেমনিতরভাবে গীতায় ক্রমভেদ করিয়া—স্তরভেদ করিয়া আরোহমার্গে ভগবানলাভ সম্ভব দেখানো হইয়াছে। স্তরগুলি এই—কর্ম, কর্মের পর নিষ্কাম কর্ম, নিষ্কাম কর্মের ফলে চিত্তশুদ্ধি, চিত্তশুদ্ধির পরে আসে জ্ঞান এবং জ্ঞানের পর ভক্তি।

সবচাইতে বড় সমর্পণ কি জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর দিলেন, ইচ্ছা। ইচ্ছা-সমর্পণ সবচাইতে বড় সমর্পণ। তোমার ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা।

তারিখ—১৬।১০।৬৯।
শ্রীশ্রীমায়ের ঘর, কন্যাপীঠ বারাণসী, সন্ধ্যাবেলা।

গুরুজী আজও জ্ঞান ও বোধ সম্বন্ধে বলিলেন—বোধ না হইলে মহা-জ্ঞানলাভ সম্ভব নয়। গোবিন্দগোপালদা জিজ্ঞাসা করিলেন, জ্ঞানের মত বোধ কি acquire করা যায়?

বোধ কি এই বিষয়ে দৃষ্টান্ত দিতে গিয়া গুরুজী বলিলেন, "অনেককাল পূর্বের কথা—গুরুদেবকে মুগলসরাই ষ্টেশনে see off করিতে গিয়াছিলাম। সঙ্গে অনেক ভক্ত ছিল—২১টি ছোট ছেলেও ছিল। একটি ছোট ছেলের সঙ্গে গুরুদেব ছোট বল লইয়া গাড়ীর মধ্যে খেলিতেছিলেন। খেলিতে খেলিতে হঠাৎ বলটি গাড়ীর বাহিরে চলিয়া যায়। ছেলেটি বলটির জন্য কাঁদিতে থাকে। পরে ভাল বল দিবেন বলায়ও ছেলেটি শান্ত হয় না। গাড়ীটা বেশ খানিকটা পথ চলিয়া যাইবার পর গুরুদেব হাত বাহির করিয়া বলটি আনিয়া দিলেন। ইহা কি করিয়া সম্ভব হইল—ইহা সম্যকরূপে উপলব্ধি করাই বোধ। অপরোক্ষ জ্ঞান হইলেও বোধ হয় না। ভগবৎ সাক্ষাৎকার হইলেও ভগবৎ সাক্ষাৎকারের যদি বোধ না থাকে তাহা হইলে সে সাক্ষাৎকার অর্থহীন।"

তারিখ—২৭।১০।৬৯ সকাল ১০॥টা।
কন্যাপীঠ, শ্রীশ্রীমায়ের ঘর।

বাবা বলিলেন, পরাবাক্ পরমেশ্বরের অবস্থা—সৃষ্টির অতীত অবস্থা। পশ্যন্তীতে শব্দ, অর্থ ও জ্ঞান অভেদভাবে একত্র থাকে—শব্দ, অর্থ ও জ্ঞান identical থাকে। শব্দের সঙ্গে সঙ্গে অর্থ ও জ্ঞান একত্র আবির্ভূত হয়। আগুন বলার সঙ্গে সঙ্গে আগুনের দাহিকাশক্তি অনুভূত হয়। মধ্যমায় শব্দ, অর্থ ও জ্ঞানের ভেদাভেদ সম্বন্ধ থাকে—শব্দের সঙ্গে সঙ্গে অর্থ ও জ্ঞান চক্ষুর সম্মুখে ছবির মত আবির্ভূত হয়। যদি বলা হয় আমার বাড়ীতে

৪ খানা ঘর আছে, সঙ্গে সঙ্গে কোন্ দিকে কোন্ ঘর, কোন্টা বড়, কোন্টা ছোট সব চোখের উপর ভাসিয়া ওঠে। এখানে আগুন বলিলে দাহিকাশক্তি সহ আগুন আবির্ভূত হয় না বটে, কিন্তু আগুনের চিত্র চক্ষুর সম্মুখে ভাসিয়া ওঠে। বৈখরীতে শব্দ, অর্থ ও জ্ঞানের ভেদ সম্বন্ধ—শব্দের সঙ্গে অর্থ ও জ্ঞান আবির্ভূত হয় না—শব্দ, অর্থ ও জ্ঞান আলাদা।

যদি কোনো সদ্গুরু শিষ্যকে জ্ঞান দান করিতে চান তখন তিনি পশ্যন্তী ভূমিতে গিয়া শব্দ, অর্থ ও জ্ঞানকে অভিন্নরূপে সাক্ষাৎকার করিয়া শব্দ লইয়া মধ্যমা হইয়া বৈখরীতে নামিয়া আসেন এবং শিষ্যের কানে চুপি চুপি তাহা শুনাইয়া দেন। শিষ্যের কাজ তাহা ক্রমাগত mechanically জপ করিয়া মধ্যমা হইয়া পশ্যন্তীতে পৌঁছানো। অর্থাৎ শিষ্যকে তিনি যদি কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষা দিয়া থাকেন শিষ্য নিয়মিত জপের ফলে পশ্যন্তী ভূমিতে তাঁহার ইষ্ট শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিতে পারিবেন—শব্দ ও অর্থ সেখানে একই সঙ্গে আবির্ভূত হইবে। তীব্র সংবেগ থাকিলে অতি অল্প সময়েই তাঁহার দর্শন হইতে পারে নতুবা সময় লাগে।

প্রশ্ন ছিল, শিষ্য পশ্যন্তী ভূমিরও ঊর্ধ্বে উঠিতে পারেন কিনা? বাবা উত্তরে বলিলেন, নিশ্চয়ই পারেন, তবে তাহা রহস্যাবৃত—সাধারণ মানুষের কাছে তাহা বোধগম্য নয়।

পরা—পূর্ণাহং—সৃষ্টির অতীত—ইদং নাই। পশ্যন্তীতে ইদংভাব পরিস্ফুট—যেখানে অহং নাই। তবে ইদং শব্দ, অর্থ ও জ্ঞান হিসাবে identical, এক।

তারপর বলিলেন, বিন্দু ও বিসর্গকে অবলম্বন করিয়াই সৃষ্টির খেলা চলিতেছে। বিন্দু ও বিসর্গকে এক করিতে পারিলেই গাধ্যাকর্ষণ শক্তির ঊর্ধ্বে উঠা যায়। তখন লোক, লোকান্তর ঘোরা যায়—এক সেকেণ্ডে যাওয়া যায়।

তারিখ—২৮।১০।৬৯।

আলোচনাপ্রসঙ্গে বাবা বলিলেন, Line is a point in motion............ Integrated time is moment. Integration is not joining together. What Aurobindo has meant by integration is moment.

পরাবাক্=শব্দব্রহ্ম।

তারিখ—১০।১১।৬৯ সকাল ১০॥ঘটিকা।
শ্রীশ্রীমায়ের ঘরঃ কন্যাপীঠ।

বাবা তত্ত্বকথা আলোচনাপ্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করিলেন, সাধনার উদ্দেশ্য কি?

নিজেই উত্তর দিলেন এবং বলিলেন, শক্তির জাগরণ। শক্তির জাগরণই কি শেষ কথা? না। শক্তিমান্ হইয়া শক্তিকেও ত্যাগ করিয়া পরম শিবাবস্থা লাভ করিতে হইবে। শক্তি ছাড়া আমি কিছুই করিতে পারি না—অথচ শক্তিরও আমাকে ব্যতীত কোন কিছু করার ক্ষমতা নাই।

ইষ্ট হইতেছে আনন্দ, গুরু হইতেছে জ্ঞান। জ্ঞানের প্রকাশ ব্যতীত আনন্দের আস্বাদন সম্ভব নয়।

গুরুস্থান ভ্রূমধ্যে। ষট্চক্রের মধ্যে পাঁচটি চক্রই পঞ্চভূত দিয়া তৈয়ারী আর আজ্ঞাচক্র হইতেছে মন-বুদ্ধি-চিত্ত-অহঙ্কারের সমষ্টি। তাই আজ্ঞা-চক্রের ঊর্ধ্বে না গেলে তাঁহাকে পাওয়া যায় না।

জিজ্ঞাসা করিলেন, হৃদয় কি? যথাযথ উত্তর দিতে পারিলাম না। বাবা তখন নিজেই উত্তরদানপ্রসঙ্গে বলিলেন, abruptly ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বিষয়ের সংস্পর্শ বন্ধ করিয়া দিলে যাহা থাকে তাহাই হৃদয়। অর্থাৎ সেখানে অনন্ত বিশ্ব ভাসমান অথচ ইন্দ্রিয়গোচর এই বিশ্ব থাকে না।

হৃদয় হইতেছে আনন্দের স্থান। গুরু হইতে জ্ঞানলাভ না হইলে অজ্ঞানের অন্ধকার কাটে না এবং আনন্দলাভ হয় না।

তারিখ—২৮।১১।৬৯ঃ সময় রাত্রি ৮-১৫ মিঃ।

কন্যাপীঠঃ শ্রীশ্রীমায়ের ঘর, গুরুজী যেখানে থাকেন।

গুরুজী বলিলেন, প্রথম জাগরণ সুরু হয় moral life হইতে, নৈতিক জীবন হইতে আর শেষ হয় আত্মসমর্পণের মধ্যে। এককথায় বলা চলে গীতার দ্বিতীয় অধ্যায় হইতে সুরু করিয়া অষ্টাদশ অধ্যায় পর্যন্ত সবটাই প্রথম জাগরণের পর্ব। আত্মসমর্পণ হইতে দ্বিতীয় জাগরণ সুরু হয় অর্থাৎ ভগবান হন তখন কর্তা এবং ভক্ত হয় তখন দ্রষ্টা। তখন তাহাকে দিয়া লোককল্যাণ বা সেবার কাজ করানো হয়। তারপর হয় পরম ভগবানের প্রবেশ এবং তখনই আসে স্বাতন্ত্র্যবোধ বা ভগবত্তালাভ। অন্যদিক হইতে বলা চলে মনোময় কোষ হইতে বিজ্ঞানময় কোষ পর্যন্ত যে যাত্রা তাহাকে প্রথম জাগরণ বলা চলে এবং বিজ্ঞানময় কোষ হইতে আনন্দময় কোষ পর্যন্ত যে যাত্রা তাহাকে দ্বিতীয় জাগরণ বলে। এই দ্বিতীয় জাগরণের সুরুতে কুণ্ডলিনী জাগ্রত হয়। কুণ্ড-লিনী জাগ্রত তখনই হয় যখন কর্তৃত্বাভিমান চলিয়া যায়।

সাধনার প্রধান উদ্দেশ্য অন্তর্নিহিত শক্তির স্ফুরণ। শক্তির জাগরণ—আত্মজ্ঞানলাভ—শক্তি করায়ত্ত করা—সিদ্ধিলাভ করা। তারপর আমিময় হওয়া ও শক্তিকে গ্রহণ করা। শক্তিকে গ্রহণ করার পর অদ্বৈতস্থিতি হয়। তাহাকেও

অতিক্রম বা transcend করিতে হইবে এবং তাহাই সত্যকার স্থিতি—তাহা বর্তমানে আমরা কল্পনা করিতে পারি না।

তারিখ—৩০।১১।৬৯ সময় ৮-১৫ (রাত্রি)।
স্থান ঃ শ্রীশ্রীমায়ের ঘর, কন্যাপীঠ।

তান্ত্রিক সাধনা ও সিধান্ত হইতে (পৃষ্ঠা ২০০) প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম বাবাকে। প্রশ্নের উত্তরদানপ্রসঙ্গে বাবা বলিলেন, আত্মার সঙ্গে মনের সম্বন্ধ, মনের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের এবং ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বিষয়ের। মন আত্মার দ্বারা চালিত হইয়া ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে যুক্ত হয় এবং ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে যুক্ত হইয়া বিষয়ের প্রতি ধাবিত হয়। ইহাই মনের বহির্মুখীন গতি। এই আত্মা অজ্ঞানের অন্ধকারে আচ্ছন্ন।

হৃদয় একমাত্র স্থান যেখানে নাড়ী নাই। মন সেখানে নিষ্ক্রিয়। গুরু মন্ত্র দেওয়ার সময় শিষ্যের বহির্মুখীন মনকে হৃদয়ে আনয়ন করেন এবং সেখানে দীক্ষা দেন। ফলে মন অন্তর্মুখীন গতি লাভ করে—ইহা হৃদয় হইতে ব্রহ্মরন্ধ্রে গমন করে।

মন প্রমত্ত অবস্থায় হৃদয়ের বাহিরে অবস্থান করে এবং সেটা কালের রাজ্য। কালের রাজ্যের গতি বক্র। মন্ত্র পাওয়ার পর মন কালের রাজ্য অর্থাৎ মায়ার রাজ্য ছাড়াইয়া মহামায়ার রাজ্যে প্রবেশ করে। তখন কালের সঙ্গে মনের সম্বন্ধ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতে থাকে। এই সরল গতি লাভ করার অর্থ অর্দ্ধমাত্রায় প্রবেশ এবং সেখান হইতে অগ্রসর হইতে হইতে কালের পরমাণু বা লব পর্যন্ত যাওয়া যায় এবং সেখানে যাইয়া গতি স্তব্ধ হয়। তারপর উন্মনী শক্তি আসিয়া তাহাকে পরম শিবত্বে বা পূর্ণত্বে লইয়া যায়। যদি কেহ কালের পরমাণু পর্যন্ত না পৌঁছিয়াই সমর্পণ করে তাহা হইলে পূর্ণত্ব লাভ হইবে না। কিন্তু খণ্ডপ্রাপ্তি ঘটিবে। তবে উভয়েই কালের রাজ্য হইতে মুক্ত হইবে। খণ্ডে অহং-ইদং থাকে আর অখণ্ডে অহংই থাকে যাহাকে বলা হয় পূর্ণাহন্তা।

তারিখ—৩১।১২।৬৯—শ্রীশ্রীমায়ের ঘর যেখানে বাবা থাকছেন, কন্যাপীঠ।
আনন্দময়ী আশ্রম, রাত্রি ১০টা।

বাবা সৎপ্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন এবং আলোচনাপ্রসঙ্গে বলিলেন ঃ

Life in time—কালের রাজ্যে জীবন যেখানে বক্রগতি আছে।

Life beyond time—কালাতীতে জীবন যেখানে বক্রগতি নাই—জরা, মরণ নাই।

Life from time to unity or timelessness যাহাকে মহামায়ার রাজ্য বলা হয়। It is movement from lower truth to higher truth.

কালের রাজ্যে জীবন সীমাবদ্ধ—জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তির মধ্যে কিন্তু Life from time to timelessness তুরীয় অবস্থার মধ্য দিয়া যাত্রা চলে। Life beyond time is তুরীয়াতীত অবস্থা।

তারিখ—১।১।৭০ সন্ধ্যা ৫॥টা।

চক্র ও শক্তির মধ্যে পার্থক্য বুঝিতে চাহিয়াছিলাম। এই পার্থক্য বুঝাইতে গিয়া বাবা বলিলেন, চক্র বর্তুলাকার কালের আবর্তের মধ্যে সীমাবদ্ধ আর শক্তির গতি সরলরেখায়। আমরা সবাই চক্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ—আমাদের দেহাভিমান আছে। যখন দিক্‌চরী বা ভূচরী চক্র শক্তিতে রূপান্তরিত হয় তখন দেহাভিমান চলিয়া যায়। তখন দেশকাল জয় হয়। কোন সাধকের সাধনপথে উন্নতি হইয়াছে কিনা বুঝিতে হইলে তিনি যদি জানিতে পারেন দূর ও নিকট বা অতীত এবং বর্তমান তাঁহার নিকট নাই—সমস্ত তাঁহার দৃষ্টির সামনে তখন বলা যায় তাঁহার চিদাকাশে স্থিতি হইয়াছে—তাঁহার দৃষ্টি খুলিয়া গিয়াছে।

সাধারণভাবে আমাদের অহং দেহের মধ্যে সীমাবদ্ধ কিন্তু শক্তি খুলিয়া গেলে তখন আর তাহা থাকে না—তখন সমস্ত বিশ্বই তাহার নিকট প্রতিভাত হয়। পূর্ণাহন্তালাভ না হইলেও অহন্তার বিকাশ ঘটে। সাধারণত আমরা দেখি প্রমাতা, প্রমাণ এবং প্রমেয়। কিন্তু দৃষ্টি খুলিলে দেখা যায় প্রমাতা এবং প্রমেয় এক হইয়া গিয়াছে।

তারিখ—২।১।৭০ রাত্রি ৮-৫ মিঃ, শ্রীশ্রীমাতা আনন্দময়ী আশ্রম।

সূর্যমণ্ডলের সঙ্গে সৃষ্টি কিভাবে যুক্ত বাবা সেই সম্বন্ধে বলিতেছিলেন। 'রৌতি ইতি রবিঃ' অর্থাৎ যাহা রব করে তাহাই রবি। রব বা শব্দ একই জিনিষ। পশ্যন্তী বা জ্যোতির্মণ্ডলে বা সূর্যমণ্ডলে শব্দ, অর্থ ও জ্ঞান অভেদভাবে বিরাজ করে। এক অর্থে প্রণবকে পরা বলা চলে।

রাত্রি ৯॥টা।

খাওয়ার পর গুরুজী দীক্ষাতত্ত্ব লইয়া আলোচনা করিলেন।

সাধারণত গুরু ব্যক্তিসত্তায় পূর্ণত্বের যে অভাবটুকু থাকে তাহা দীক্ষার দ্বারা পূর্ণ করেন। তিনি শিষ্যের সত্তার অভাবটুকু লইয়া পশ্যন্তীরূপ পূর্ণত্বে ডুব দেন এবং সেখান হইতে বাকী অংশটুকু লইয়া আসিয়া বীজা-

কারে তাঁহাকে দান করেন। তিনি অর্থাৎ শিষ্য জপের মাধ্যমে পূর্ণত্বে গিয়া পৌঁছান। এককথায় বলা চলে বীজমন্ত্র তাহাই যাহার দ্বারা শিষ্যের পূর্ণত্ব সম্পন্ন করা হয়। অর্থাৎ পূর্ণ হইতে শিষ্যের বর্তমান সত্তা বিয়োগ করিলে যাহা থাকে তাহাই বীজমন্ত্র দ্বারা পূর্ণ করা হয়। জীব পূর্ণ অথচ সেই পূর্ণতা সুপ্ত থাকে। শ্বাস, প্রশ্বাসই অপূর্ণের লক্ষণ। সেই পূর্ণত্ব জাগাইতে হয় দীক্ষার দ্বারা।

তারিখ—৩।৯।৭০ সকাল ৯টা।
শ্রীশ্রীমাতা আনন্দময়ী আশ্রম।
আলোচনার বিষয়ঃ দীক্ষাপ্রসঙ্গ।

বাবা বলিলনে, প্রাচীনকালে মুনিঋষিরা দীক্ষাকে আধ্যাত্মিক বিবাহ বলিতেন। দীক্ষার দ্বারা positive-negative-কে মিলাইয়া দেওয়া হইত, যেমনতরভাবে সামাজিক বিবাহে স্ত্রী-পুরুষকে মিলাইয়া এক করা হয়, পূর্ণ করা হয়।

গুরুকে বলা হইত ঘটক। এখন এ সব কথা কেহ বুঝিতে পারেন না কেননা এখনকার লোকের মধ্যে সে দৃষ্টি নাই। জীব পূর্ণ, কিন্তু তাহার মধ্যে শক্তি সুপ্ত থাকায় সে অপূর্ণ প্রতিভাত হয়। শক্তির জাগরণ দ্বারা সেই পূর্ণতা আনয়ন করিতে হয়। দীক্ষার দ্বারা শক্তির জাগরণ ঘটে।

তারিখ—৩।১০।৭০ বিকাল, শ্রীশ্রীমাতা আনন্দময়ী আশ্রম।

বাবাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ষড় অধ্ব মানে কি? উত্তরে বাবা বলিলেন, ছয়টি পথ। গুরুর প্রধানতঃ দুইটি কাজ—একটি জ্ঞান দান করা এবং দ্বিতীয়টি (শিষ্যের) পথ পরিষ্কার করা। জিজ্ঞাসা করিলাম 'অ' এবং 'হ' বলিতে ঠিক কি বুঝায় সংক্ষেপে বলিয়া দিন।

বাবা বলিলেন, 'অ' প্রকাশের দ্যোতক। ইহা অগ্নিস্বরূপ। এবং 'হ' বিমর্শের দ্যোতক—ইহা চন্দ্রস্বরূপ। অগ্নি ও সোমের মিলনের ফলে চিৎকলার নিঃসরণ হয়।

বাবাকে বলিলাম 'জানামি ধর্মং ন চ মে প্রবৃত্তিঃ
জানামি অধর্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ
ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।'

এ বিষয়টা ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দিন।

বাবা সংক্ষেপে বলিলেন, এখানে হৃষীকেশ মানে ইন্দ্রিয়ের সঞ্চালক। এই

উক্তি জীবন্মুক্তের। ভগবানের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরতা—যা কিছু করছি তিনি করাচ্ছেন। ইহা প্রত্যক্ষ করা যায় জীবন্মুক্ত অবস্থায়।

তারপর বাবা বলিলেন, "গুরুদেব চিঠিতে লিখিতেন 'কোন বিষয়ে চিন্তা করিও না।' এই কথার অর্থ বুঝিতে আমার ২০ বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে। ২০ বৎসর পর বুঝিতে পারিলাম ইহার সত্যকার অর্থ মনকে ইন্দ্রিয়ের কার্যে involved (সংশ্লিষ্ট বা যুক্ত) না করানো অর্থাৎ ইন্দ্রিয় যাহা করিতেছে করুক মন যেন তাহাতে interfere না করে। মন দ্রষ্টার দৃষ্টি লইয়া ইন্দ্রিয়ের কার্য অবলোকন করিলে দুঃখকষ্টভোগ অনেক কমিয়া যায়। এই অর্থ বুঝিবার পূর্বে আমার মনে হইত গুরুদেব তো উপরে আছেন—তিনিই সব দেখিতে-ছেন। সুতরাং আমার চিন্তা করিবার কোন আবশ্যকতা নাই।"

তারিখ—১৯।১।৭০ রাত্রি ১০টা।

গায়ত্রীর ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করায় বলিলেন, প্রথমে জ্ঞান, জ্ঞানের পর ধ্যান এবং ধ্যান পরিপক্ক হইলে ভগবানকে সম্মুখীকরণ করা এবং তাঁহাকে বলা আমাকে সৎকার্যে প্রেরণা দাও।

রাত্রি ১০॥টার সময় গীতার তৃতীয় অধ্যায়ের ২৬ নম্বর শ্লোকের (ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্মসঙ্গিনাম্।..... ......) ব্যাখ্যা শুনিতে চাহিলাম কেননা উহার যথার্থ অর্থ আমি বুঝিতে পারি না।

বাবা ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে বলিলেন, মানুষের বিশ্বাস ভাঙ্গিতে নাই। যে বিশ্বাস তাহার আছে তাহা হইতে উচ্চতর আদর্শ তাহার নিকট তুলিয়া ধরা যাইতে পারে এবং সে যদি সে আদর্শ গ্রহণ করে তবে ভালই। গীতা নিষ্কাম কর্মের কথা বলে। নিষ্কাম কর্ম কিসের জন্য, না চিত্তশুদ্ধির জন্য। চিত্ত শুদ্ধ হইলে কি হইবে, না অহংকার কাটিয়া যাইবে। অহংকার কাটিলে কি দেখিব, না আমি কর্তা নই—কর্তা কে, না ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি। তারপর সাধনার পথে অগ্রসর হইলে দেখা যাইবে প্রকৃতিও কর্তা নয়। কর্তা স্বয়ং ভগবান্। ইহা উপলব্ধিতে আসিলে আসিবে শরণাগতি—'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ'। তারপর জগজ্জননী সমস্ত ময়লা মুছাইয়া লইবেন। তারপর মায়ের আশীর্বাদপুষ্ট হইয়া অবরোহগতি সুরু হয়—তখনই আরম্ভ হয় জগৎ-কল্যাণের কাজ। এই অবরোহগতির কথা গীতায় উহ্য আছে।

তারিখ—২০।৭।৭০ সকাল ৯টা।
শ্রীশ্রীমাতা আনন্দময়ী আশ্রম।

সৎপ্রসঙ্গ আলোচনায় আমাকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য বাবা নিজেই আমাকে

জিজ্ঞাসা করিলেন, ঈশ্বর ও আত্মায় পার্থক্য কি? আমি সেই প্রশ্নের সদুত্তর দিতে পারিলাম না। বাবা নিজেই তখন ব্যাখ্যা সুরু করিলেন, ব্রহ্ম, ভগবান, পরমাত্মা এবং আত্মা সম্বন্ধে। বলিলেন, ব্রহ্ম বোধহীন স্বয়ংপ্রকাশ। ভগবান তাঁহাকে বলা হয়, যাঁহার মধ্যে শক্তির সম্পূর্ণ স্ফুরণ আছে—পরমাত্মায় আছে আংশিক। আত্মায় 'পূর্ণাহং' বোধ আছে কিন্তু ব্রহ্মে তাহা নাই, তবে পরব্রহ্মে তাহা আছে। ভগ শব্দের অর্থ শক্তি। ভগবান মানে শক্তিমান।

ঈশ্বরে আদি সংকল্প আছে অর্থাৎ ইচ্ছা সেখানে শক্তিময়ী। বিকল্প উত্থিত হয় জীবে, ইচ্ছা সেখানে শক্তিহীন। বিকল্প মানে দ্বিতীয় সংকল্প। ঈশ্বরে আছে ঐশ্বর্য আর ভগবানের আছে ঐশ্বর্য এবং মাধুর্য উভয়ই।

প্রকাশ যেখানে স্বাতন্ত্র্যহীন সেখানে বিমর্শ নাই, আর প্রকাশ যেখানে অনন্ত স্বাতন্ত্র্যময় সেখানে পূর্ণাহন্তা আছে।

আলোচনাপ্রসঙ্গে বলিলেন, ১৯২৬ সালে তিনি যখন বৃন্দাবনে সন্তদাস বাবাজীর সঙ্গে দেখা করেন তখন বাবাজী মহারাজ অসুস্থ ছিলেন। বাবাকে খুব আদর করেন এবং জিজ্ঞাসা করেন তাঁহার (অর্থাৎ বাবার) কোন প্রশ্ন আছে কি না। বাবা তখন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "আপনি অনুভব হইতে বলুন জীবন্মুক্তের লক্ষণ কি?" কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিবার পর বাবাজী মহারাজ বলিয়াছিলনে, 'জগতের লোক খারাপ ভাল বলিয়া মানুষের শ্রেণী-বিভাগ করেন। কিন্তু জীবন্মুক্তের নিকট সবাই সমান প্রতিভাত হয়। কাহারও সম্বন্ধে কোন খারাপ ভাব মনে লন না।'

তারিখ—২২।৭।৭৩ বিকাল ৬টা।

শ্রীশ্রীমাতা আনন্দময়ী আশ্রম।

বাবাকে বলিলাম, হৃদয় সম্বন্ধে আমার সঠিক ধারণা নাই। আপনি হৃদয় কি ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দিন।

হৃদয়কে ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বলিলেন, শ্বাসপ্রশ্বাসের ক্রিয়া ত্রিবিধভাবে হয়—ভিতরে, বাহিরে, হৃদয় হইতে নিম্নে এবং হৃদয় হইতে ঊর্দ্ধে মূর্দ্ধা পর্যন্ত। হৃদয় হইতে নিম্নে এবং ঊর্দ্ধে শ্বাসপ্রশ্বাসের ক্রিয়াকে বেদপাঠ বলে। নিম্নের গতিকে বলে কর্মকান্ড এবং ঊর্দ্ধের গতিকে বলে জ্ঞানকান্ড। আজকাল এই বেদপাঠের অর্থ অনেকেরই অজ্ঞাত।

শ্রীশ্রীমা একবার বাবাকে বিন্ধ্যাচলে থাকাকালীন সময়ে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, মস্তকের শ্বাস জানা আছে কিনা। বাবা উত্তর দিয়াছিলেন, 'জানা আছে'। ঊর্দ্ধদিকের শ্বাসের গতিকে মস্তকের শ্বাস বলে।

তারিখ—২৩।৭।৭০ বিকাল ৬টা।

বৌদ্ধধর্মের কয়েকটি কথার ব্যাখ্যা দিলেন।

স্রোতাপন্ন মানে upper current অর্থাৎ গুরুকৃপায় যাহাকে উপরের দিকে টানিয়া লয়।

অনাগামী—যিনি আর আসিবেন না অর্থাৎ জন্মগ্রহণ করিবেন না।

সকৃদাগামী—যিনি আর একবার মাত্র আসিবেন অর্থাৎ জন্মগ্রহণ করিবেন। Upper current হইতে lower current-এ fall হইবে। আবার upper current প্রাপ্ত হইবেন--গুরুকৃপা তাঁহাকে আবার টানিয়া তুলিবে। Upper current হইতেছে মস্তকের শ্বাস—হৃদয় হইতে মূর্ধা পর্যন্ত শ্বাসের গতি—সরল গতি।

আজও আলোচনাপ্রসঙ্গে অন্তরাকাশের কথা—হৃদয়ের কথা--চিদাকাশের কথা বলিলেন। বহির্মুখীন দৃষ্টিকে অন্তরের দিকে ফিরাইতে হইবে। তখন আর ভূতাকাশ দেখা যাইবে না—চিদাকাশ দেখা যাইবে। এই অবস্থায় দেহাভিমান থাকে না। অন্তর্মুখ হইয়া অন্তরাকাশে প্রবেশের চেষ্টা কর—কল্পনা করিয়াই চেষ্টা কর। এইরূপ চেষ্টা করিতে করিতে খুলিয়া যাইবে। অন্তরাকাশে Time & Space নাই—ইহা infinite dimension সমন্বিত। এ অবস্থায় শ্বাসের ক্রিয়া থাকে না।

তারিখ—২৪।৭।৭০ সকাল ৯টা।

সকালে পূজা হইতে উঠিয়া বলিলেন, তোমাকে একটি প্রশ্ন করিব--তুমি তো শুনিয়াছ 'বিশ্বং দর্পণদৃশ্যমাননগরীতুল্যম্ নিজান্তগর্তং পশন্ন্যাত্মনি মায়য়া বহিরিবোদ্ভূতং যথা নিদ্রয়া..........' এই অবস্থাটাকে দুইটি push দিলে কি দাঁড়ায় বল। আমি এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিলাম না। বাবা তখন উত্তরদানপ্রসঙ্গে বলিতে আরম্ভ করিলেন--দর্পণ স্বচ্ছ, তাহাতে প্রতিবিম্ব পড়ে। নিজের চেহারা ছাড়াও নদী, পর্বত, নৌকা, দূরত্ব সবই তাহাতে দেখা যায়। ইহা মায়িক জগতের কথা।

আসলে নিজের মধ্যেই সব দেখা যায়। এই নিজটাকে আত্মা বলিতে পার, সত্তা বলিতে পার। ইহা খুবই স্বচ্ছ। ইহাই প্রকাশ—ইহাতে প্রকাশিত হয় লোক, লোকান্তর, দর্পণে প্রতিবিম্ব। কিন্তু এই স্বচ্ছ সত্তায় যে দৃশ্যমানতা দেখা দেয় তাহা প্রতিবিম্বজনিত নয়। উদাহরণস্বরূপ ধর নদীর বা পুকুরের জল নিস্তরঙ্গ। কিন্তু তাহাতে হাওয়ার দ্বারা অসংখ্য তরঙ্গের সৃষ্টি হয়—ইহাই শক্তির খেলা। ইহাকে বলিতে পার বিমর্শ। এই স্বচ্ছ সত্তায় যে দৃশ্য

তাহা বিমর্শজনিত—প্রতিবিম্বজনিত নয়। ইহার পর যদি এই বিমর্শশক্তি খুব জোরে ক্রিয়া করিতে থাকে তখন আর দৃশ্য থাকে না। শুধু একটি প্রকাশই থাকে। ইহা পূর্বের মত বহির্মুখ নয় অর্থাৎ দৃশ্য সেখানে দেখা যায় না। তারপর যদি আরও একটি ধাক্কা দেওয়া যায় তাহা হইলে উহা অন্তর্মুখ হইয়া যায়। ইহাকে চিদাকাশ বলে। চিদাকাশে time & space নাই—জরা মৃত্যু নাই।

প্রকাশের উপর শক্তির খেলায় পর পর স্তরগুলি প্রতিভাত হয়। প্রকাশের উপর শক্তির খেলার তৃতীয় অবস্থাকে আত্মা বা পূর্ণাহন্তা বলা হয়। প্রকাশ যেখানে শক্তিহীন সেখানে তাহাকে আত্মা বলা হয় আর যেখানে শক্তিযুক্ত তখন তাহাকে পূর্ণাহং বলা হয়। পূর্ণাহং চিদাকাশে ভাসে। প্রকাশের উপর বিমর্শের খেলা। প্রকাশের প্রথম অবস্থায় অর্থাৎ জগৎ যখন দৃশ্যমান নগরীতুল্য নিজের মধ্যে দেখা যায় তখনই তাহা চিন্ময় দর্শন। ইহাকে প্রজ্ঞা-দর্শন বলা যায়। বৌদ্ধদের ভাষায় তৃতীয় অবস্থাকে প্রজ্ঞাপারমিতা অবস্থা বলা হয়।

যাহা কিছু সৃষ্টি প্রকাশের background-এ হয়। এই প্রকাশকে তন্ত্রের ভাষায় 'অনুত্তর' বলা হয়। এই প্রকাশের উপর শক্তির খেলা হয়—নিজে নিজেকে দেখে আনন্দের সৃষ্টি হয়। আনন্দের পর ইচ্ছার উদয় হয়। ইচ্ছার পর জ্ঞানের উদয় হয়। তারপর ক্রিয়ার সাহায্যে তাহা বাস্তবে রূপ নেয়। এই ক্রিয়াকে বলা যায় বীর্যের নিষেক। অ হইতেছে পুরুষ। আ হইতেছে প্রকৃতি। প্রকৃতির গর্ভে বীজ পতিত হইবার পর প্রকৃতির কার্য হইল আমরূপ অথবা অন্য কোনরূপ জ্ঞানকে রূপায়িত করা।

প্রসঙ্গত বাবা বলিলেন, তাঁহার গুরুদেবের ভাষায়, নির্ণয় নাই যাহার আকার সেই নিরাকার—তাঁর গুরুদেব নিরাকার বিশ্বাস করিতেন না—নিরাকারের কথা বলিলে ভয়ানক চটিতেন, বলিতেন সমস্ত সৃষ্টিটাই সাকার। নিরাকার সাকারের পক্ষে চিন্তা করাই অসম্ভব।

তারিখ—২৪।৭।৭০—শ্রীশ্রীমাতা আনন্দময়ী আশ্রম।

শ্রীগুরুর চরণরহস্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায় বলিলেন, গুরুর চরণের মাধ্যমে শক্তির সঞ্চার হয়। ইহা উপর হইতে আসে, এজন্য মস্তকের উপরে দেখিতে হয়। দেবতার মূর্তিও উপর হইতে আসে। তাই গুরু বা ইষ্টের ধ্যান অনুলোমে করিতে হয়—প্রথমে চরণ, তারপর দেহ—তারপর উপরের দিকে মস্তক।

শিবের পঞ্চমুখের অর্থ জিজ্ঞাসা করায় বলিলেন, পঞ্চমুখ পঞ্চ শক্তিকে বুঝায়—চৈতন্য, আনন্দ, ইচ্ছা, জ্ঞান এবং ক্রিয়া।

তারিখ—২৫।৭।৭০ সকালবেলা।

আলোচনাপ্রসঙ্গে বাবা বলিলেন, শক্তির জাগরণের পূর্বে দেহাভিমান থাকে—দেহকে আমি বলিয়া মনে হয়—আমরা তাই বলি আমার জ্বর, আমার বেদনা, আমার শরীর। কিন্তু শক্তির জাগরণের পর দেহাভিমান থাকে না।

রাত্রি ৮॥টা।

বাবাকে বলিলাম, দক্ষিণামূর্তি স্তোত্রটি (বিশ্বং দর্শনদৃশ্যমাননগরীতুল্যম্ নিজান্তর্গতম্) ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিন।

বাবা উত্তরদানপ্রসঙ্গে বলিলেন, আমার আত্মা হইতেছে স্বচ্ছ দর্পণ। তাহাতে স্পন্দনের ফলে বিশ্ব দর্পণের মধ্যে ভাসিতেছে। দর্পণ হইতেছে আমার আত্মা। এ বিশ্বের দৃশ্য আমারই মধ্যে, বাহিরে নয়। এ দৃশ্যের সৃষ্টি হইতেছে আত্মারূপ স্বচ্ছ প্রকাশের মধ্যে বিমর্শহেতু অর্থাৎ ক্রিয়াশক্তির স্পন্দনের ফলে। এই আত্মারূপ স্বচ্ছ প্রকাশ হইতে স্বাতন্ত্র্যশক্তিসম্পন্ন বিমর্শ অর্থাৎ ক্রিয়াশক্তি যদি উৎক্রান্ত হয় তাহা হইলে প্রকাশ অপ্রকাশবৎ হয় কেননা বিমর্শ-হীন প্রকাশ অপ্রকাশ। তারপর অন্তর্মুখীন অবস্থায় আত্মারূপ প্রকাশে যদি স্পন্দন বা ক্রিয়াশক্তি বা বিমর্শ উপস্থিত হয় তখন চৈতন্যরূপ প্রকাশে পূর্ণা-হন্তা বা পূর্ণাহং ভাসিতে থাকে—তখন আর আমি ছাড়া কিছুই থাকে না। চৈতন্যরূপ প্রকাশে পূর্ণাহং থাকে।

তারিখ—২৬।৭।৭০।

শুদ্ধ সত্ত্ব আর চিৎ প্রকাশের পার্থক্য জানিতে চাহিয়াছিলাম। বাবা বলিলেন, প্রাকৃত সত্ত্ব সব সময়ই রজঃ ও তমোগুণের সঙ্গে যুক্ত থাকে। কিন্তু শুদ্ধতত্ত্ব রজঃ তমোগুণ হইতে মুক্ত। শুদ্ধসত্ত্ব হইতে চিৎপ্রকাশে যাইতে হয় —চিৎপ্রকাশ হইতে চিৎস্বরূপে। শুদ্ধসত্ত্ব চিৎপ্রকাশের প্রায় কাছাকাছি।

তারিখ—৪।১০।৭০ বিকেল ৫॥টা।
শ্রীশ্রীমাতা আনন্দময়ী আশ্রম।

গুরুজী ঘুম হইতে উঠিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন, 'তস্য ভাষা সর্বমেব বিভাতি'—'ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব, ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব, ত্বমেব সর্বং মম দেবদেব।' এই দুইটি শ্লোকের যথার্থ তাৎপর্য কি আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি মামুলি উত্তর দিলাম। গুরুজী সন্তুষ্ট হইলেন না।

তারপর নিজেই বলিলেন, তাঁর প্রকাশে সবকিছু প্রকাশিত হয় ইহা ঠিক। কিন্তু এমন অবস্থাও তো আছে যেখানে তাঁর অপ্রকাশে সব অপ্রকাশিত।

তারপর বলিলেন, অধ্যাত্মসাধনার ক্রমবিকাশে বিশ্বাসই সর্বপ্রথম প্রয়োজন। যাহাকে নির্বিকল্প সমাধি বলা হয় তাহা বিশ্বাস ছাড়া আর কিছু নয়।

তারিখ—৫।১০।৭০ সকাল ৮টা।
শ্রীশ্রীমাতা আনন্দময়ী আশ্রম।

আহ্নিকের পর বাবা আবর্তগতি, সরল গতি, বিন্দ্বাত্মক গতি এবং বৃত্তাকার গতি লইয়া আলোচনা সুরু করিলেন। বলিলেন, কালের রাজ্যে সরল গতি নাই। সরল গতির কথা যাহা বলা হয় তাহা শুধু বুঝাইবার জন্য। সরল গতি থাকে না, অন্য বিরুদ্ধ শক্তির চাপে তাহা বক্র হইয়া যায়।

বিন্দুর মধ্যে অনন্ত গতিকে বিন্দ্বাত্মক গতি বলে। তারপর বৃত্তাকার গতি—ইহা উপরের কৃপায় হইবে। বৃত্তাকার গতির ফলে কালরাজ্যের অবসান হইবে।

তারপর আকাশের আলোচনায় আসিলেন। বলিলেন, আমরা ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে যে আকাশ দেখি তাহা ভূতাকাশ। আমরা স্বপ্নে যে আকাশ দেখি তাহা চিত্তাকাশ। এই দুই আকাশে ছাপাইয়া আছে চিদাকাশ তাহা চৈতন্যময়। চিদাকাশে দেশ ও কালের ব্যবধান নাই। সেখানে আছে শুধু নিত্য বর্তমান —দেশ ও কালের গণ্ডীর দ্বারা আবদ্ধ নহে।

তারিখ—৬।১০।৭০ মঙ্গলবার সকাল ৮॥টা (ষষ্ঠীপূজা)।
আলোচনা বিষয়ঃ সূর্য এবং আদিসূর্য।

বাবা বলিলেন, সূর্যকে ধ্যান করিলে সূর্য হওয়া যায়। সূর্য হওয়ার অর্থ চতুর্দশ ভুবনের অধিপতি হওয়া এবং এই চতুর্দশ ভুবনে কোথায় কি হইতেছে সবই দেখিতে পাওয়া যায়। তখন শ্বাস-প্রশ্বাস থাকে না—কালের গতি থাকে না—দেহাত্মবোধ থাকে না। তখন গুরু হওয়া যায়। দেহাভিমান লইয়া গুরুগিরি করা যায় না। যখন দেহাভিমান থাকে না তখনই গুরুগিরি করা যায়। সূর্য হওয়ার পরও স্থিতি আছে। আদি সূর্য হওয়া। আদি সূর্যের আভায় সব বিভাসিত—"তস্য ভাসা সর্বং ইদং বিভাতি।"

তারিখ—৬।১০।৭০ বিকাল ৫টা।

বাবা আলোচনাপ্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করিলেন, যদি গুরু কোন শিষ্যকে বলেন যার মধ্যে শক্তির বিকাশ হইয়াছে সে যেন যে জিনিষ তার দৃষ্টির মধ্যে তা যেন সে না দেখে অথচ চোখ মেলিলেই তাহা দেখিতে পায়। উত্তর অবশ্য

তিনি নিজেই দিলেন এবং বলিলেন, সেখানে মনকে ইন্দ্রিয় থেকে বিমুক্ত করিলেই তাহা সম্ভবপর।

তারিখ—৭।১০।৭০ বেলা ১২টা।
বাবার সৎপ্রসঙ্গ আলোচনা।

প্রথমে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা দেখা, তারপর চিত্তের দ্বারা দেখা, চিৎস্বরূপে দেখা। অর্থাৎ প্রথমে আমি চক্ষুদ্বারা সূর্যকে দেখি, তারপর ধ্যানের দ্বারা চিত্তে রেখাপাত করে—তারপর তাই হইয়া যাওয়া। অর্থাৎ আমি তখন সূর্যকে দেখি না। আমি সূর্য হইয়া সূর্য দ্বারা যা প্রকাশিত সবই দেখি। আমি সেই শক্তির অধিকারী হইলে সবকিছুই আমার দৃষ্টির সামনে প্রতিভাত হয়। প্রসঙ্গত রবীন্দ্রনাথের 'শান্তিনিকেতন' নিবন্ধের আলোচনা করিলেন এবং বলিলেন, রবীন্দ্রনাথ যখন শিলাইদহ ছিলেন তখন তাঁহার নৌকায় একজন চাকর কলেরায় আক্রান্ত হয়—তাহার জীবনের কোন আশা ছিল না। সেই মুমূর্ষু রোগী তাহার পিসীমাকে দেখিতে চায় কেননা তিনি তাহাকে খুবই ভালবাসিতেন। রবীন্দ্রনাথ তখন কল্পনানেত্রে সেই পিসীমার ভালবাসা অবলোকন করিলেন এবং সেইভাবে সেই রোগীকে দেখিলেন। তার ফলে কবির মনে রোগীর প্রতি অসীম ভালবাসার উদয় হইল।

আবার বলিলেন, ইচ্ছাশক্তি, জ্ঞানশক্তি, ক্রিয়াশক্তি কাজ করে না যখন দেখার ইচ্ছা না থাকে—তবু সেখানে সবই থাকে।

তারিখ—৮।১০।৭০ সকাল ১০-১৫ মিঃ (অষ্টমীপূজার দিন)।

আলোচনাপ্রসঙ্গে বাবা বলিলেন, যখন অল্প সময়ে অনেক বেশী জপ হয় তখন বুঝিতে হইবে সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি হইয়াছে। কিন্তু যখন সমানসংখ্যক জপ করিতে অনেক বেশী সময় লাগে তখন বুঝিতে হইবে তমোগুণ বেশী হইয়াছে।

যখন দেহাত্মবোধ থাকে না তখন জীব শিব হয়।

তারিখ—১২।১০।৭০।

আজ্ঞাচক্রের জায়গায় সূর্যের প্রতীক ধ্যান করা যেখানে সমস্ত মাতৃক গুটাইয়া আসে এবং জ্যোতি স্ফুরিত হয়।

মাতৃকা হইল বিকল্প। মাতৃকা গলিয়া গেলে বিকল্প থাকে না।

তারিখ—১৩।১০।৭০।

আজ সন্ধ্যায় একজন মহিলা আসিয়া বাবাকে বলিলেন, তাঁহার দীক্ষা বৈষ্ণবমন্ত্রে হইয়াছিল কিন্তু তাঁহার টান শক্তির প্রতি--এ অবস্থায় কি করণীয়

জিজ্ঞাসা করিলেন। বাবা উত্তরে বলিলেন, ইহা অতি কঠিন প্রশ্ন—ইহার কারণ দীক্ষাগুরু পূর্বজন্মের বিচার না করিয়া দীক্ষা দেওয়ার ফলে ইহার উদ্ভব হইয়াছে। যাই হোক বাবা তাঁহাকে বলিলেন গুরুদত্ত বীজমন্ত্র জপ করার পর ইষ্টদেবের নিকট হইতে অনুমতি লইয়া মায়ের ধ্যান করা।

আলোচনাপ্রসঙ্গে বলিলেন, সত্যিকারের প্রেম মাতৃপ্রেম। গুরুদেবের ভাষায় মায়ের কোলে বসিয়া মায়ের খেলা দেখা। রাধাকৃষ্ণের প্রেম যদিও প্রেম তবু উভয় পক্ষের কিছু আস্বাদন আছে। কিন্তু মাতৃপ্রেম ত্যাগের উপরে প্রতিষ্ঠিত। আরও বলিলেন, অবতার সাময়িকভাবে দুষ্টের দমনপূর্বক ধর্মের সংস্থাপন করিতে পারেন। কিন্তু মানুষের অসুরত্বের বিনাশ করিতে পারেন না। সেজন্য প্রয়োজন হৃদয়ের পরিবর্তন।

* * *

৮৪ লক্ষ যোনির মধ্যে দেবযোনি একটি, তবে তাহা মনুষ্যযোনির উপরে স্থিত।

তারিখ—১৪।১০।৭০।

আজ সকালে গুরুজী আলোচনাপ্রসঙ্গে বলিলেন, ৪টি অবস্থার কথাঃ জড়াবস্থা, জীবাবস্থা, যোগাবস্থা বা ঈশ্বরাবস্থা, চৈতন্য বা ব্রহ্ম বা পূর্ণাবস্থা। জড় অবস্থায় কোন জ্ঞানই থাকে না। জীবাবস্থায় বিকল্প জ্ঞান অর্থাৎ রূপ ও নামের প্রশ্ন ওঠে অর্থাৎ এটা এই, এটা ওই ইত্যাদি। তারপর ঈশ্বরাবস্থায় শুদ্ধ সংকল্প থাকে অর্থাৎ যাহা সংকল্প করা যায় তাহারই উদয় হয়। তারপর চৈতন্যাবস্থায় সংকল্প-বিকল্প কিছুই থাকে না—সেখানে শুধু অখণ্ড প্রকাশ থাকে।

* * *

আত্মস্বরূপের প্রথম দর্শন যখন হয় তখন নিজেকে নিজে দেখা যায়—নিজের মুখমণ্ডল, নিজের চেহারা প্রভৃতি। তখন সম্পূর্ণ বিশ্ব চোখের সামনে প্রতিভাত হয়—সম্পূর্ণ মানে entire creation, নিখিল সৃষ্টি।

* * *

চক্র বক্রগতির প্রতীক আর রেখা সরল গতির প্রতীক। চক্র যখন শক্তিতে পরিণত হয় তখন পরপ্রমাতা পূর্ণাহং হয়—দেহাত্মবোধ থাকে না তখন—শ্বাস-প্রশ্বাসও থাকে না। তখন time space vanish করে—তখন যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে দেখা যায়—যাহা ইচ্ছা তাহা দেখা যায়—দূরত্বের বা সময়ের প্রশ্ন মোটেই থাকে না।

তারিখ—১৬।১০।৭০ সকাল ৮-৫০ মিঃ।

গুরুজী বলিলেন, ভগবান নিজেকে নিজের কাছে প্রকাশ করেন। এখানে নিজেকে অর্থ ইষ্ট এবং নিজের কাছে অর্থ জীব যিনি আপন হইয়াছেন।

তারিখ—২৬।১০।৭০।

যোগীনদা (যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়) জিজ্ঞাসা করিলেন, বিশুদ্ধ সত্ত্ব কি? উত্তরে বাবা বলিলেন, বিশুদ্ধ সত্ত্ব ঈশ্বরের উপাধি। বিশুদ্ধ সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণরহিত।

তারিখ—২৭।১০।৭০ সন্ধ্যা।

আলোচনাপ্রসঙ্গে গুরুজী বলিলেন, শরণাগতি আসে ভগবৎ সাক্ষাৎকারের পরে—পূর্বে নয়। গীতায় সবটাই আরোহগতি। শরণাগতির পর অবরোহ-গতি আরম্ভ হইতে পারে।

রাত্রে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, জ্ঞাননেত্রের সঙ্গে অপর দুই নেত্র একই সঙ্গে কখন খোলা থাকে। উত্তরে গুরুজী বলিলেন, জ্ঞানের পূর্ণ বিকাশে অর্থাৎ অদ্বৈতে যখন প্রবেশ হয়। জ্ঞাননেত্রের প্রথম উন্মীলনে ভয়ানক আগুনের মত থাকে, কিন্তু পরে জ্ঞানের বিকাশে তাহা স্নিগ্ধ হয়।

তারিখ—৩০।১০।৭০ সন্ধ্যা ৫-৩০ মিঃ।

অনাত্মাতে আত্মবোধ কাটিয়া যাওয়া এবং আত্মাতে আত্মবোধ হওয়া এক জিনিষ নয়। অনাত্মাতে আত্মবোধ কাটিয়া গেলে আত্মাতে আত্মবোধ হয় না। যেমন চিদাকাশে স্থিতি হইলেও পুরোপুরি আত্মবোধ সম্পূর্ণ হয় না। একটি পুরোপুরি জানিতে পারিলেই আসল জ্ঞান হইবে।

৬টার সময় গুরুজী জিজ্ঞাসা করিলেন, পূর্ণত্ব কি? পূর্ণত্বে স্থিতি কি? তারপর নিজেই উত্তরদানপ্রসঙ্গে বলিলেন, সব স্থিতিতেই যে স্থিতি তাহাকে পূর্ণত্বে স্থিতি বলা যায়, কেননা সেখানে স্বাতন্ত্র্য বিদ্যমান। কোন সীমারেখা বা সংজ্ঞা দ্বারা তাহা নিরূপিত হয় না। কখনও তিনি অজ্ঞানীর মত ব্যবহার করেন। আবার কখনও মহাজ্ঞানীর মত। সুতরাং যিনি পূর্ণত্ব-প্রাপ্ত তাঁহাকে কোন definition বা সংজ্ঞা দ্বারা সীমিত করা যায় না।

তারিখ—২৮।১০।৭২।
শ্রীশ্রীমাতা আনন্দময়ী আশ্রম।

আজ দুপুরে খাওয়ার পর আন্দাজ ১টা নাগাদ বাবা হঠাৎ প্রশ্ন করিলেন, জীবের বিকাশ কোথা হইতে শুরু হয় এবং কোথায় শেষ হয়? তারপর আবার

নিজেই উত্তর দিতে আরম্ভ করিলেন—বলিলেন, entire creation-টা inorganic and organic life-এর সঙ্গে সঙ্গে, স্পন্দনের সঙ্গে সঙ্গে জীবনের শুরু হয়। এই জীবনের বিভাগ করিতে গিয়া বলিলেন, প্রাণময় কোষ, মনোময় কোষ, বিজ্ঞানময় কোষ, আনন্দময় কোষ। আবার মনোময় কোষের দুইটি বিভাগ আছে—একটি overmind আর একটি supermind. Overmind কূটস্থ আর Supermind সূত্রধর! তারপর জিজ্ঞাসা করিলেন, Supermind-লব্ধ জীব এবং অবতারে প্রভেদ কি? উত্তর শুনিবার পূর্বেই অন্যত্র যাইতে হইল সেইজন্য এই প্রভেদ সব জানিতে পারিলাম না।

তারিখ—৩।৯।৭৪।
শ্রীশ্রীমাতা আনন্দময়ী আশ্রম, বারাণসী।

প্রকাশ এবং মহাপ্রকাশ সম্বন্ধে বাবাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। বাবা উত্তরে বলিলেন, প্রকাশ দ্বৈতের মধ্যে আছে, সর্বত্র আছে আর মহাপ্রকাশ অদ্বৈত, সেখানে দ্বন্দ্ব নাই। জগতে একটা বস্তুই আছে। লোকে ভুলবশতঃ দুইটা মনে করে। মহাপ্রকাশ যখন খুলিবে তখন কাল বাধা দিতে পারিবে না—কালকে ভেদ করিয়া প্রকাশিত হইবে।

তারপর জিজ্ঞাসা করিলেন গায়ত্রীর শির কি? গায়ত্রী বাধা পায় কোথায়?

বাবা আবার বলিতে শুরু করিলেন—মহাপ্রকাশ আসিলে বাধা থাকে না। বিরুদ্ধ শক্তি সম্পূর্ণ অনুকূল কিন্তু মনে হয় বিরুদ্ধ।

গায়ত্রী হইতে সৃষ্টি আরম্ভ। সাতটা ছন্দ হইতে অনন্তলোক, infinite world সৃষ্টি। এই ৭টা ছন্দ চিনিতে পারিলে বেদজ্ঞ পুরুষ হওয়া যায়। ছন্দ মানে তাল, rhythm সাতটা ছন্দের মধ্যে সমস্ত সৃষ্টি আসে—গায়ত্রী মুখ্য আর জগতী শেষ। ছন্দ মানেই বেদ—ছন্দের মধ্যেই সবকিছু।

তারিখ—৫।১১।৭৪ সকাল ১০টা।
শ্রীশ্রীমাতা আনন্দময়ী আশ্রম, কাশীধাম।

বাবাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম ১০৮ সংখ্যার তাৎপর্য কি? বাবা উত্তরে বলিলেন, ইহার মধ্যে গভীর রহস্য আছে। অনেকভাবে এটা বুঝানো চলে। এটা পূর্ণের প্রকাশ।

সংখ্যা পূরণ হওয়া চাই—একাগ্রতায় তা হয়। একাগ্র হও যেমন করে হয়—কাঁদ, কাঁদিয়া ভাসাইয়া দাও। স্থায়ী একাগ্রতা চাই—এক হওয়া চাই। নাম লইবে একবার—দুইবার লইবার সময় কোথায়—বড় কঠিন। গুরুশক্তি অর্জন কর।

দীক্ষার মত দীক্ষা হইলে গুরুশক্তি সঞ্চার হয়। কৃপা আসিবেই আসিবে।

শ্রীধরের স্ত্রী আসিয়াছিল প্রণাম করিতে--তাহাকে আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন, 'ভগবানকে বিশ্বাস করিয়া—তাঁকে সব কিছু অর্পণ কর। তাহলেই নিশ্চিন্ত। সুখ-দুঃখ সব তাঁকে দিতে হবে—তিনি তোমার সঙ্গেই আছেন। স্বামী তো তিনিই।'

তারিখ—৬।১১।৭৪।
শ্রীশ্রীমাতা আনন্দময়ী আশ্রম, বারাণসী।

বাবা আলোচনাপ্রসঙ্গে বলিলেন, Time যাকে বলি সেটা কালের আবছায়া, আসল কাল নহে। আসল কাল হচ্ছে Eternity—তাকে ধরতে হবে। ক্ষণকে ধরতে পারলে সত্যর আভাস পাওয়া যাবে, অথচ সে সত্যতেই ভাসছে। ক্ষণকে ধরতে গেলেই সে সরে যায়—তাকে ধরাই আসল কাজ। তাকে ধরতে পারলে দেখা যাবে যে চাওয়ার অতীত—অথচ সবাই তাকে চায়। আমরা যাকে বলি ভাগ্য, কপাল—আমার কপাল নির্ভর করবে সেই ক্ষণকে ধরার মধ্যে।

তারিখ—৭।১১।৭৪ রাত্রি ১০টা।

ক্রিয়ার কথা জিজ্ঞাসা করায় বাবা বলিলেন, "সত্যকার ক্রিয়া তখনই হবে যখন নিষ্ক্রিয় হবে—যখন শান্ত হবে, যখন প্রকাশ খুলে যাবে। 'কর্ম্মণ্যকর্ম' ক্রিয়া করা মানে ক্রিয়া না করা বুঝা বড় কঠিন।"

তারিখ—৮।১১।৭৪ সকাল ১০টা।

আমার প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন, ক্রিয়ায় জ্ঞানের প্রকাশ হইতে পারে, কিন্তু ভক্তি বা কর্মের সমন্বয় হইবে কিসে?......কর্ম, জ্ঞান এবং ভক্তির সমন্বয়ই শ্রেষ্ঠ। বড় ভালও ভাল নয়, বড় মন্দও ভাল নয়—মধ্য পন্থা ভাল। জিজ্ঞাসা করিলাম, সত্যকার শরণাগতি কখন আসে। উত্তরে বাবা বলিলেন, কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয়ের পর। একটার কমবেশী হইলে হইবে না।

সন্ধ্যাবেলা বাবাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, আপনি যখন সন্ধ্যা করেন তখন আপনাকে প্রণাম করা উচিত কি না। উত্তরে বলিলেন, "দূর থেকে যদি আন্তরিকভাবে করে তাতে আপত্তি নেই। সে এক স্থিতিতে থাকে, আমি অন্য স্থিতিতে থাকলে কোন অসুবিধা হয় না। তবে প্রয়োজন sincerity-র—sincerely করলে যত দোষই থাকুক তিনি তার মাধ্যমে ধরবার সুযোগ পান। Sincerity is a basic necessity."

তারিখ—৯।১১।৭৪।

কাল ও ক্ষণের পার্থক্য বুঝাইতে গিয়া বাবা বলিলেন, "কালে কলন হয়, ক্ষণে কলন নাই। কাল সরে সরে যায়—ক্ষণ হচ্ছে eternity যা সরে সরে যায় না। ১০৮ পূর্ণের প্রতীক—অপূর্ণের প্রতীক,—it includes everything. জগতে একটা জিনিষই আছে। একের সঙ্গে একের যোগ হলে দুই হয়, আবার এক বাদ দিলে একই থাকে।" ১০৮ কি করে পেলাম জানতে চাওয়ায় বলিলেন, "নিজের সঙ্গে নিজের যোগ করে। নিত্যকর্ম ক্ষণে হয়, কালে হয় না। ক্ষণের শেষ নাই—ক্ষণের পর শূন্য। মহাশূন্য। গভীর রহস্যপূর্ণ।"

১০৮ এর আরও ব্যাখ্যা চাওয়ায় বলিলেন, "সবটাই কৌতুক।" জিজ্ঞাসা করিলাম কূটস্থ মানে?—উত্তরে বলিলেন, "নিষ্ক্রিয়। কূট মানে পাহাড়ের টুকরা।" আবার বলিলেন, "ঈশ্বর মায়ার অধিষ্ঠাতা। অনন্ত গতির মধ্যে অনন্ত স্থিতি='নিশ্চল অবস্থা' শান্ত অবস্থা—নিশ্চল অবস্থা। নিষ্ক্রিয় নয়, স্পন্দন আছে—শান্তম্, শিবম্, অদ্বৈতম্।"

জিজ্ঞাসা করিলেন, শান্ত অবস্থা এবং সাক্ষী অবস্থা, শান্ত অবস্থা—অথচ সাক্ষী অবস্থা নয়—এই দুই অবস্থার মধ্যে পার্থক্য কি?

তারিখ—১২।১১।৭৪।

প্রশ্ন করেছিলাম, জপের উদ্দেশ্য ইষ্টকে পাওয়া—তাঁকে পেয়ে গেলে কি আর জপের প্রয়োজন থাকে? উত্তরে বাবা বলিলেন, "কি বললে? ইষ্টকে পেলে বা ভগবানকে পেলে জপের প্রয়োজন নেই? পেয়ে তৃপ্তি হয় না, মনে হয় আরও চাই আরও চাই—এ ক্ষুধার শেষ নাই। তাই তাঁকে পাওয়া সত্ত্বেও চির-বিরহ বিরাজমান থাকে। ভগবানের আকাঙ্ক্ষা অন্য আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে তুলনীয় নয়। এখানে সাধারণ law apply করে না, নিয়ম খাটে না।"

তারিখ—১৪।১১।৭৪ সকাল ৯টা।

এক প্রশ্নের উত্তরে বাবা বলিলেন, "বুদ্ধি দিয়ে বুঝবার জিনিষ নয়, আস্বাদনের জিনিষ। তর্ক করো না। নিজে অহঙ্কার করো না। তাঁকে ধরবার চেষ্টা কর। তাঁর কৃপায় তাঁকে বুঝবার চেষ্টা ক'র। তাঁর কি অন্ত আছে? তিনি যে অনন্ত! তর্ক করে তাঁকে পাওয়া যায় না, জীবনটা নষ্ট হয়।" আমি যখন বলিলাম, শেষ নাই যার শেষ ফল কে বলবে—বাবা বলিলেন, "তা উপলব্ধি করা যায়। যেখানে ভাল লাগে সেখানে আটকে যাবে না। আরও আগে অগ্রসর হতে হবে। বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে পারবে না। যদি সমর্পণ

করতে পার তাহলে হয়। তর্ক করে বুঝতে পারবে না, আর বুঝলে তর্ক আসবে না—এটা সত্য জিনিষ।”

তারিখ—১৫।১১।৭৪।

বেদের অর্থ জিজ্ঞাসা করায় বাবা বলিলেন, বেদ বলিতে বুঝায় অনন্ত জ্ঞানরাশি। দ্বৈতজ্ঞান, অদ্বৈতজ্ঞান সব রকমের জ্ঞান—অখন্ড জ্ঞানরাশি।

বাবার কাছে জানতে চাইলাম ‘পপোঽহং পাপকর্ম্মাহং’ ইত্যাদি বলা হয় কেন? উত্তরে বলিলেন, “বাসনা মানেই পাপ। সব বাসনা ত্যাগ করতে হয় —পুণ্যও ত্যাগ করতে হয়, পাপও ত্যাগ করতে হয় তবে পরমপদ পাওয়া যায়। যা পড়বে তাতে ডুবে যাবার চেষ্টার ক'র। একটি শব্দের অনন্ত অর্থ। শব্দ অনন্ত, অর্থ অনন্ত, বোধ অনন্ত। একটি মন্ত্রের অর্থ চিন্তা করতে করতে সমস্ত জীবন কেটে যায়।

“ভগবানকে চিন্তা করে পাওয়া যায় আবার চিন্তা না করেও পাওয়া যায় —তিনি চিন্তার অতীত।

“বিকল্প মানে This or that or that। এই, এই—‘ক’ বললে ‘ক’, ‘খ’ বললে ‘খ’। শব্দ একটা অবয়ব—শব্দের বাইরে যেতে হবে। চেষ্টা যাতে না করতে হয় তার জন্য চেষ্টা কর। সে জিনিষ চেষ্টা করেও হয় না আবার চেষ্টা না করেও হয় না। অথচ চেষ্টা করতে হয়।”

ব্যাহৃতি কথার ঠিক অর্থ কি জিজ্ঞাসা করায় বলিলেন, “ব্যাহৃতি মানে উচ্চারণ। ছন্দ যা ব্যাহৃতিও তাই—ছন্দটা হচ্ছে প্রকাশ আর ব্যাহৃতি হচ্ছে ক্রিয়া।”

তারিখ—২৩।১।৭৫ রাত্রি ৯।।টা।

বারীনবাবু চিঠি লিখে প্রশ্ন করেছিলেন, ‘পরম গুরুদেবের ধারায় দীক্ষা ছাড়া কিছু হয় না—দীক্ষা অপরিহার্য। অথচ আমাদের দীক্ষা হ'ল না— আমাদের কি হবে।’ বাবা বলিলেন, ‘দীক্ষা দিলে দায়িত্ব নিতে হয়—আমি তা নেই না। আমার গুরুদেবই সব, তিনি খুব শক্তিশালী। ভক্তি, শ্রদ্ধা, প্রেম নিয়ে তাঁকে ধরে থাকতে পারলে তার একটা বিহিত হবেই—মৃত্যুর পূর্বেও হতে পারে। দীক্ষা নিলে একটা সংস্কার হয়—সেই ধারায় পড়া যায়—একটা যোগ হয়। মা নিজে দীক্ষা না দিলেও তিনি পিছনে থাকেন। তাঁর দায়িত্ব থাকে। বারীন দেশে কারও কাছ থেকে দীক্ষা নিতে পারে না?”

তারিখ—২৪।১।৭৫ রাত্রি ৯।।টা।

বাবার উপদেশ “ভাল লাগা, মন্দ লাগার উর্দ্ধে যেতে হবে। অহংকার

ভাল নয়। ভগবানের উপর নির্ভরতাই প্রয়োজন। সর্বাবস্থায় তাঁর উপর নির্ভর করতে হবে। আমাকে বাধা দেয় কে?—আমি। আমাকে মুক্ত করে কে? আমি। এই দুই আমি সমসূত্র হতে হবে। কেবল ভালও ভাল নয়, কেবল মন্দও ভাল নয়। দুইয়ের ঊর্ধ্বে যেতে হবে। 'আমার সব ভার তুমি নাও'—তুমি অর্থে গুরু বুঝ, মা বুঝ, ভগবান বুঝ, যা খুশী বুঝ। আমার ভালমন্দ সব তুমি গ্রহণ কর। তোমার ভাল আমার ভাল, চরম ভাল। আমার ভাল লাগা মন্দ লাগার অতীতে যেতে হবে।"

তারিখ—২৫।১।৭৫।

উমা মা, শ্যামা মা এবং আদি মা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায় বাবা বলিলেন, "তাঁরা নিত্য কুমারী—জন্ম নেন না। তাঁরা মানুষ নন, অথচ মানুষ।"

মনের চঞ্চলতা কি করে দূর হয় আলোচনাপ্রসঙ্গে বলিলেন, "মন চঞ্চল, বায়ুও চঞ্চল। মন যদি স্থির হয়, বায়ুও যদি স্থির হয় তখন অলৌকিক ক্রিয়া হয় নিষ্ক্রিয়তার ক্রিয়া, ভগবৎ ক্রিয়া, কুণ্ডলিনীর ক্রিয়া। তবে সাধারণতঃ মন চঞ্চল হয় গুণের মধ্যে, কিন্তু ত্রিগুণের অতীত হলে আর খারাপভাবে এলে মনকে চঞ্চল করতে পারে না। সত্ত্ব, রজ এবং তমর অতীতে যেতে হবে।

"শ্বাসের ক্রিয়ার উদ্দেশ্য মন স্থির হওয়া এবং বায়ু স্থির হওয়া। সুষুম্নার ক্রিয়া হওয়া মানে শক্তির জাগরণ হওয়া। আসল উদ্দেশ্য নিদ্রা এবং জাগরণের অতীত হওয়া। পূর্ণবস্তু লাভ করা। ভালও জগতের মধ্যে, মন্দও জগতের মধ্যে। ভালমন্দর অতীত হয়ে গেলে তখন জগৎ কোথায়! ভাল এবং মন্দ ত্রিগুণের মধ্যে কাজ করে। ভাল মন্দকে নাশ করে এবং নিজেও নাশপ্রাপ্ত হয়—তখন হচ্ছে ভালমন্দর অতীত অবস্থা। ভাল চাওয়া মানে একটা দিক চাওয়া। মন্দ চাওয়া মানে আর একটা দিক চাওয়া এবং তা ত্রিগুণের মধ্যে। উদ্দেশ্য ত্রিগুণাতীত হওয়া। কি আছে কি নেই ভাষায় প্রকাশ হয় না। ভাষায় প্রকাশ হলেই limited হয়ে যায়। যেখানে ত্যাগেরও ত্যাগ হয়ে যায় সেটাই পূর্ণ। প্রথমে ধরতে হবে তারপর ছাড়তে হবে। ইড়া, পিঙ্গলা ছেড়ে সুষুম্না ধরতে হবে। আবার সুষুম্নাকেও ছেড়ে তার অতীত হতে হবে। সে অবস্থা যা তা—যা তুমি ব'ল তাই। সে যে কি তা ভাষায় প্রকাশ হয় না। ত্যাগও একটা দিক্‌মাত্র। পূর্ণে তাই ত্যাগেরও ত্যাগ হয়।

"ইড়া, পিঙ্গলাকে ত্যাগ ক'র, সুষুম্নাকে গ্রহণ ক'র, আবার সুষুম্নাকেও ত্যাগ ক'র। তখন ত্যাগ ও গ্রহণের কোন পার্থক্য থাকবে না—ত্যাগ ও গ্রহণের অতীত হওয়া যাবে এবং সেটাই পূর্ণ। তাঁর উপর ভার দাও, তাঁর উপর

নির্ভর ক'র, তাতেই সব হবে। ভালর সন্ধান পেলে মন্দের সন্ধানে আসবে। কিন্তু ভালমন্দ দুইই যখন আসবে তখন দুয়ের ত্যাগ হয়ে যাবে। আসলটা পাওয়া যাবে। যতক্ষণ পূর্ণ নির্ভরতা না আসে ততক্ষণ ভাল হবার চেষ্টা করতে হবে। তারপর ভাল হওয়ার পর মন্দের অতীত হওয়া গেল। কিন্তু সেটা মন্দের অতীত, পূর্ণ নয়। ভালমন্দের অতীতে গেলে দেখা যাবে তার মধ্যে ভালও আছে, মন্দও আছে এবং সব কিছুই আছে সেটাই Transcendent—সেটাই আসল অবস্থা যেখানে সব পাওয়া যাবে। এটাই মনে রাখবে ভালমন্দের অতীত হতে হবে তাহলে ভয় নেই।

"সুষুম্না নির্গুণ অবস্থা। নির্গুণ-সগুণের অতীতে যেতে হবে—সেখানে সগুণও আছে, নির্গুণও আছে। বেদান্ত নির্গুণ অবস্থা আর অন্যান্য দর্শনে সগুণ অবস্থা। এমন অবস্থায় যেতে হবে যেখানে সবই আছে--যা চাওয়া যায় না তাও আছে।"

তারিখ—২৯।১।৭৫ সন্ধ্যাবেলা

সচ্চিদানন্দ ঝা বিহার থেকে এসে বাবাকে প্রশ্ন করলো, মহাপুরুষদের কষ্ট হয় কেন? বাবা বললেন, "তাঁহাদের কষ্টও হয় আবার আনন্দও হয়, আবার দুইয়ের অতীতও হয়ে যায়। দুইয়ের অতীত না হলে সে মহাপুরুষ বা মহাত্মা নয়।"

তারিখ—৩০।১।৭৫।

বাবা কথাপ্রসঙ্গে বললেন, "দীক্ষাতে খণ্ড জিনিষ পাওয়া যায় আর কৃপাতে অখণ্ড জিনিষ পাওয়া যায়।"

গীতার পঞ্চদশ অধ্যায়ের ষষ্ঠ শ্লোকের দ্বিতীয় পংক্তির ব্যাখ্যা জানিতে চাহিলাম বাবার কাছে, 'যদ্ গত্বা ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম'। বাবা বলিলেন, "সেখানে দেহ থাকতেও যাওয়া যায় না আবার দেহ গেলেও যাওয়া যায় না। দেহ থাকতে গেলে সগুণ, সাকার হয়, আর দেহ গেলে নিরাকার হয়। তিনি সাকারও নন্ আবার নিরাকারও নন্। তিনি দুইয়ের অতীত। অর্থাৎ যে অবস্থা প্রাপ্ত হলে সবই থাকে, আবার কোনটাই থাকে না। সেটা সগুণও নয় নির্গুণও নয় অথচ সব আছে—সেটাই পূর্ণ। সগুণ অবস্থাও নিবৃত্ত হয় না। নির্গুণ অবস্থাও নিবৃত্ত হয় না। সবই থাকে অথচ কোনটাই নয়। সেটাই পূর্ণ, সেটাই পরম ধাম। সেই মা। যা বলা যায় তাই।"

'তদ্ বিষ্ণোঃ পরমম্ পদম্ সদা পশ্যন্তী সুরয়ঃ'র ব্যাখ্যা জানিতে

চাহিয়াছিলাম। বাবা বলিলেন, "বিষ্ণুর পরমপদ, যার হ্রাসবৃদ্ধি নেই অর্থাৎ হ্রাসবৃদ্ধির অতীত জ্ঞানীগণ সেই পদ সর্বক্ষণ দেখেন।"

প্রসঙ্গতঃ বলিলেন, "সুষুম্না ভালোর ইঙ্গিত করে। কিন্তু তার অতীত অবস্থা মায়ের চরণ বা মায়ের কোল। তারপর আর ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ের ২৬ নম্বর শ্লোকে বলা আছে, 'অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িস্যামি'=সর্বপাপ বললে পুণ্যকেও বুঝায়। পুণ্যপাপ আলাদা করলে সেটাও পাপ হয়। পরম বস্তু আসল জিনিষ, তাতে পাপও নেই, পুণ্যও নেই।"

তারিখ—১।২।৭৫।

বাবাকে বলিলাম, "আমি পুরোপুরি আপনার শরণাগত হতে পারলাম না। আমার ইচ্ছা করে আপনার সব কথা ছেপে দি। এর মধ্যে আমার কি লাভ আছে জানি না।" বাবা বলিলেন, "লাভ আছে বইকি। লাভ হচ্ছে জ্ঞানের 'বিকাশ'।" তারপর বলিলেন, "গীতায় আছে 'মামেকং শরণং ব্রজ'—একমাত্র আমার শরণ লও।"

তারিখ—২৪।৩।৭৫।

বারীনবাবু বাবাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "দীক্ষা ছাড়া কি নামে কিছু ফল হয়?" বাবা উত্তর দিলেন, "নামের ফল হবে। ভগবানের নাম কখনো বৃথা যায় না। নামের ফল মুক্তি—নামে প্রেম, ভক্তি আসে না। সুষুম্নার ভেদ হওয়া চাই—সুষুম্না জাগা চাই তারপর তা ভেদ হওয়া চাই। সূক্ষ্ম জ্ঞানে চৈতন্যের বিকাশ হয়—প্রেমভক্তি থাকে না।"

বারীনবাবু বললেন, "পরম গুরুদেবের ধারায় দীক্ষা দেবার ব্যবস্থা নেই। সে ধারায় যারা বিশ্বাস করে তারা অন্য জায়গায় দীক্ষা নিতে চায় না। তাঁকে ধরে থাকলে কি সব হবে?" বাবা উত্তরে বললেন, "নিশ্চয়ই হবে। প্রথমে দীক্ষার ফল হবে না। প্রকাশ হলে সব হবে। প্রেমভক্তি চাই। প্রেমভক্তি থাকলে সব হয়। সে বস্তুকে পাওয়া চাই। ভগবানে প্রেমভক্তি বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করতে হবে—অথচ চেষ্টার দ্বারা কিছু হয় না। কিন্তু চেষ্টা করতে হবে। চেষ্টা না করলেও হবে না, চেষ্টা করলেও হবে না। ভক্তিটা চাই। প্রেমভক্তি—'তিনি আমার মা, আমি তাঁর'। সবই ঠিক, আবার কোনটাই ঠিক নয়। তাঁর তুলনা হয় না। 'আশ্রয় লইয়া ভজে তাঁরে কৃষ্ণ নাহি ত্যজে'। আশ্রয় কি? আশ্রয়—আমি তোমার।

"নামে সব কিছু হবে—প্রেম হবে, ভক্তি হবে, তবে ধৈর্য ধরে করতে হবে। ধৈর্য না থাকলে কিছুই হবে না।

"বুঝে নিয়ে কি করবে? জ্ঞানের অতীত তিনি। গুরুবাক্য নিয়ে চলতে হবে। একটা কিছু ধরতে হবে আবার ছাড়তে হবে—ছাড়তে হবে কেননা সেটা পূর্ণ নয়। যে কাজ করে সে আনন্দ পায় সে আনন্দও ত্যাগ হবে। আনন্দের উপরেও আনন্দ পায়। ধরে থাকতে হবে। আবার ধরাও থাকবে না ছাড়াও থাকবে না। সেটা পূর্ণ হবে—কিছুই অপূর্ণ নয়! আসল জিনিষ হচ্ছে ধৈর্য চাই।"

তারিখ—২৭।৩।৭৫।

আজ দোল। বাবাকে দোলের তাৎপর্য জিজ্ঞেস করলাম। উত্তরে বললেন, "দোলখেলা লীলা, যেখানে ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না এক হয়ে গেছে। অর্থাৎ সুষুম্না থাকলেও জ্ঞান আছে, তার অতীত যেতে হবে। জ্ঞান বড় জিনিষ। প্রেম তার থেকে বড় জিনিষ। শুধু জেনে কি হবে, তার অনুভব কোথায়? সুষুম্না বড় জিনিষ কিন্তু সুষুম্নার অতীত না হতে পারলে লীলার প্রকাশ কোথায়? মহাশক্তির খেলা ৬ দিক দিয়ে হয়—সে অনেক কথা। এটা যা আমরা করি তার বহিঃপ্রকাশমাত্র। অথচ সুষুম্না না খুললে কিছুই হয় না —শক্তি জাগে না।"

অন্য আর একটা প্রশ্নের উত্তরে বাবা বললেন, "ভাল লাগার অবস্থাটাকেও ভেদ করতে হবে। ভালমন্দর অতীত অবস্থায় যেতে হবে—সেটাই বড় কথা। আমাকে তাঁর মত হতে হবে। সুখদুঃখের অতীতে যেতে হবে। সেখানে সুখও আছে, দুঃখও আছে, আবার কিছুই নেই। অখণ্ড বস্তু পেতে হবে তা না হলে পূর্ণ জিনিষ পাওয়া যাবে না।"

তারিখ—২৮।৩।৭৫।

দিলীপ চক্রবর্তী নামে এক ব্যক্তি এসে বাবাকে কিছু প্রশ্ন করতে চাইলেন। বাবা বললেন, "গুরুকরণ হয়েছে কি? গুরু কর। ভগবানকে ডাক, কাঁদ। তাহলে সব হবে। গুরু মানে সদ্‌গুরু। রাস্তা খুলে যাবে। গুরুর চেষ্টা কর। একখানা বই পড়তে গেলে মাষ্টার চাই। গুরু কর, গুরু কর।"

তারিখ—৩০।৩।৭৫।

বাবা পূর্ণত্বের আলোচনাপ্রসঙ্গে বললেন, "খণ্ডনও থাকবে, মণ্ডনও থাকবে। আবার খণ্ডনও থাকবে না, মণ্ডনও থাকবে না, সব জিনিষের

মীমাংসা হয়ে যাবে। সক্রিয়ও থাকবে, নিষ্ক্রিয়ও থাকবে, আবার কোনটাই থাকবে না—সেটাই পূর্ণ। সুষুম্না জাগা বড় জিনিষ কিন্তু সেটা শেষ কথা নয়। তার অতীতে যেতে হবে। সমস্তই আছে অথচ কিছুই নেই সেটাই পূর্ণ জিনিষ।"

বাবাকে জিজ্ঞেস করলাম, সাধনা এবং সাধ্যের মধ্যে যদি পার্থক্য না থাকে তাহলে কি হয়? উত্তরে বললেন, "সাম্য হয়—সাম্য হলে ঊর্ধ্বগতি হয়, আবার অধোগতি হয়। আবার ঊর্ধ্বও নেই অধোও নেই সেটাই পূর্ণাবস্থা।"

বাবা আবার পূর্বের আলোচনায় ফিরে গিয়ে বললেন, "সুষুম্নার জাগ্রত অবস্থা এবং তার অতীত অবস্থা—সুষুম্নার সক্রিয় অবস্থা এবং তারপর নিষ্ক্রিয় অবস্থা এবং যখন দুইয়ের অতীত অবস্থা—সেটাই পূর্ণাবস্থা। সক্রিয়ও নয়, নিষ্ক্রিয়ও নয়, সেটাই পূর্ণ অবস্থা। সুষুম্নায় শুধু ব্রহ্মজ্ঞানলাভ হয়।"

বারীনবাবু বাবাকে প্রশ্ন করলেন, ভক্তিপ্রেমের জন্য অনুক্ষণ স্মরণই কি উপায়? উত্তরে বাবা বললেন, "ভাব-ভাবের দ্বারাই ঊর্ধ্ব অধোগতি হয়। ভাবের স্ফূর্তি হয় অনুক্ষণ সৎ চিন্তা এবং গুরুদত্ত ক্রিয়ার দ্বারা। অনুক্ষণ চিন্তায় জ্ঞান হবে। শুধু জ্ঞান হলে হবে না ভক্তিও চাই। আবার জ্ঞান ভক্তির অতীতে যেতে হবে। বিরোধীভাবের সমন্বয় করতে হবে। সেটা কঠিন। সুষুম্না জাগলে ব্রহ্মজ্ঞান হয়। তাতে কি হয়? প্রশ্ন হ'ল ধরে থাক, ভুলো না।

"ধরে থাকার শক্তি যে বলছেন কার কাছ থেকে আসবে?"—বারীনবাবু প্রশ্ন করলেন। বাবা উত্তর দিলেন, "উপর থেকে আসবে।"

বাবা আবার বললেন, "মাও হওয়া চাই আবার শিশুও হওয়া চাই। বিরোধীভাবের সমন্বয় না হলে পূর্ণ জিনিষ পাওয়া যায় না।"

তারিখ—১৩।৪।৭৫ রাত্রি।

অশোকবাবু বাবাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, হিন্দুদের মধ্যে না খেয়ে পূজা করার বিধি কেন? বাবা বললেন, "খেয়ে করার বিধিও আছে। আসল কথা হচ্ছে লোভ না থাকে। উপবাস করলাম অথচ খাব খাব ভাব থাকবে তাহলে চলবে না। আসলে প্রেম চাই। ভাবগ্রাহী জনার্দন। ভাবের উপর সব নির্ভর করে।"

তারপর বাবা আরও বললেন, "মাছ জলে ডুবে থাকলেও তার পিপাসা পায়—পিপাসা মেটে না। ভগবানের মধ্যে ডুবে থেকেও ভগবানকে পাওয়া যায় না। আসলে তাঁকে পেতে হলে অভাববোধ চাই। অভাববোধ না থাকলে তাঁকে পাওয়া যায় না। ভাবগ্রাহী জনার্দন।"

তারিখ—১৭।৪।৭৫।

তত্ত্বকথা আলোচনাপ্রসঙ্গে বাবা বললেন, "কর্মের ফল অহংকারজনিত আর কৃপায় তিনি আপন করে নেন। অহংকার দ্বারা কর্ম হয় এবং তার দ্বারা ফল হয় আর কৃপা দ্বারা তিনি কোলে তুলে নেন।

"ইড়া, পিঙ্গলা এবং সুষুম্না ও সত্য—তিনকে এক করে গুটিয়ে নিয়ে তবে তাঁকে পেতে হবে। সব এক হয়ে যাবে। বিশ্বাসের উপর সব জিনিষ চলে। শাস্ত্র কতটুকু! শাস্ত্র মন্থন করলে অমৃত পাবে। সমস্ত জীবন লক্ষ লক্ষ পুস্তক পড়লাম তাতে কিছু হয় না। অথচ অন্য পথে হয়।"

তারিখ—১৪।৪।৭৫ চৈত্র সংক্রান্তি।

অশোকবাবু বাবাকে জিজ্ঞেস করলেন, কালের সঙ্গে আকাশের সম্বন্ধ কি ?

উত্তরে বাবা বললেন, "কালের সঙ্গে দেহের সম্পর্ক আছে, কর্ম আছে আর আকাশ হচ্ছে শূন্য—শূন্যকে পূর্ণ করতে হবে।" আবার বললেন, "আনন্দ-রাজ্যে সুখও আছে, দুঃখও আছে আবার দুইয়ে মিলিয়ে আনন্দ আছে। ভগবানকে আপন করে নেওয়া বড় কঠিন। যোগী হলেও হয় না। তার উপর সব নিয়ে মার সন্তান—কোন অভাব থাকবে না। সুখও ভাল না, দুঃখও ভাল নয়—সুখদুঃখের অতীতে যেতে হবে। সুখও অনুভব করব, দুঃখও অনুভব করব অথচ তার দ্বারা অভিভূত হব না। সবই আছে, অথচ কিছুই নেই। মাকে ছাড়ব না—মা ছাড়া থাকব না। বিরক্তি থেকেই প্রেম আসে। ভালবাসা আসল জিনিষ। 'আমি তোমার', সুখেরও মূল্য নেই আবার দুঃখেরও মূল্য নেই। সুখও দরকার। যোগ, ঐশ্বর্য, সিদ্ধি তুচ্ছ।

"ভগবানের চেয়েও বড় জিনিষ ভগবানের ভালবাসা। ভালবাসার দ্বারা ভগবান আপন করে নেবেন এবং আমিও ভালবাসার দ্বারা ভগবানকে আপন করে নেব।

"ঐশ্বর্য্য থাকলেই বড়লোক হয় না। মন বড় হলেই বড়লোক হয়। জলে মাছ থাকলেও তার তৃষ্ণা আছে। ভগবৎসত্তা লাভ করেও তৃষ্ণা মেটে না, যতক্ষণ পর্যন্ত প্রেম ভালবাসা না আসে। ভগবৎসত্তা লাভ করলে ঐশ্বর্য্য আসে, বিভূতি আসে, কিন্তু পূর্ণত্ব প্রাপ্ত না হলে প্রেম আসে না। অধোঊর্ধ্ব সমান না হলে, পূর্ণতালাভ হয় না।

"বাসনা থাকে—বাসনার নিবৃত্তি হলেও হবে না। সমস্ত বাসনা গ্রহণ করে ত্যাগ করতে হবে। লক্ষ বৎসর তপস্যা ক'র তাহলেও কিছু হবে না। পরকে দেবার ক্ষমতা পেলে সব পাবে। ফাঁকি দিয়ে তা লাভ হয় না। বাসনা

পূর্ণ হওয়া চাই। যেখানে যা আছে সব নেবে, সব দেবে, তবে তো বুঝি বাহাদুরি। যে নিজের জন্য রেখে দেয়, সে খন্ড মানুষ। লোভ থাকলে হবে না। মহাকালে জীবের উপকার করা যায় না।

"লোভ হলে জিনিস খন্ড হয়ে যায়। লোভ হবে কেন? ইচ্ছা না করলেও পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে ভালবাসা।"

তারিখ—১৬।৪।৭৫।

বাবাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, সমস্ত ধর্মগ্রন্থের শেষে ফলশ্রুতি কেন?

উত্তরে বললেন, "শ্রদ্ধা বাড়াবার জন্য, তবে খন্ড। প্রত্যেকটি কর্মেরই একটা ফল আছে। আসল ফলশ্রুতি হচ্ছে পূর্ণকে পাওয়া অর্থাৎ সগুণ, নির্গুণ সবই থাকবে। ভগবানের ভালবাসা যে কত বড়, ভগবানও জানেন না। পূর্ণ থেকে পূর্ণ নিলে পূর্ণই থাকে।"

জিজ্ঞেস করলাম, গীতায় কোথায় প্রেমের কথা আছে। বললেন, "সর্ব-ধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ—সেখানেই সব আছে।

"ভগবানের মধ্যে ডুবে যেতে হবে। তারপর তিনিই সব করবেন। মাছ জলে থাকা সত্ত্বেও তার পিপাসা যায় না—ঠিক সেইরূপ। পূর্ণ ভগবৎসত্তার মধ্যে ডুবে তাঁকে পাবার পিপাসা ফুরোবে না। কালের মধ্যে থেকে কালা-তীতকে পেতে হবে।"

জিজ্ঞেস করেছিলাম, ইষ্টলাভের পর আবার জপের প্রয়োজন আছে কি? উত্তরদানপ্রসঙ্গে বাবা বললেন, "ইষ্ট বলতে কি বুঝ?—শক্তি, শিব না অন্য কিছু? ইষ্ট যদি বুঝায় পূর্ণ, তাহলে তাঁকে পাওয়া ফুরায় না। পূর্ণকে চাইলে আর অন্য কিছু চাওয়া থাকে না। তাঁকে পেলে আর কিছু পাওয়ার থাকে না।

"ভগবানকে সম্পূর্ণরূপে আপন করে নিতে হবে। বিদ্যা, অবিদ্যা সব কিছুকে নিয়ে তাঁকে পেতে হবে। তা না হলে খন্ডপ্রাপ্তি হবে। তাঁর মধ্যে সব আছে অথচ কিছু নেই। সব আছের মধ্যে থেকে আনন্দ ফুটে উঠবে। সব জিনিষ পেতে হবে—পেয়েও তৃপ্তি হবে না। সব জিনিষ তাঁর মধ্যে আছে। সবার মালিক তিনি। সবই আছে সবই সত্য, কিন্তু কোনটার কাজ নেই। কালের জগৎ তো। এককে ধরতে হবে। তাঁকে ধরলেই সব হবে।"

তারিখ—১৬।৪।৭৫।

তত্ত্বকথা আলোচনাপ্রসঙ্গে বাবা বললেন, "ইড়া, পিঙ্গলার ক্রিয়া বন্ধ হলে সুষুম্না জাগে—সুষুম্নার জাগরণের পর তিনটি নাড়ী এক হয়। তখন সাম্য

হয়, তারপর উর্ধ্বগতি হয়, আবার অধোগতি হয়। সমন্বয় হয়ে গেলে সব থাকে, কিছু থাকে না। শিশু মায়ের কোলে যায় নির্ভয়ে। সব সময় সে আশীর্বাদ করছে।

"কালের মধ্যেও গতি আছে, আবার কালের বাইরেও গতি আছে। এ ধরায় জায়গা আছে যেখানে গতি নেই, Logic-এ Contradiction আছে, ভগবানে Contradiction নেই। 'অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িস্যামি'—একেকে ধর। তাঁর মধ্যে এক, নানা, সব আছে, অথচ কোনটা নেই। সাধারণ মানুষ বুঝতে পারে না। This and that সেখানে নেই, অথচ সব আছে। শুনতে contradictory. ভগবৎতত্ত্ব লীলার জিনিষ। সব লোক বুঝতে পারে না। যার ভাগ্যে আছে সে বুঝতে পারবে। নির্গুণ হওয়া চাই। সব হওয়া চাই অথচ কোনটা থাকবে না। Contradiction আপন করে নিতে হবে। Philosophy system ধরে হয়েছে—এখানে কোন sysem নেই।

"মহাশূন্যের নীচে ভেদ আছে—উপরে ভেদ নেই। মায়ের কোলে ভেদ নেই—খন্ড নেই। মায়ের কোলে বসে ছেলে দুধ খায় এবং মাকে আপন করে নেয়। স্তনের থেকে মা ছেলেকে দূরে সরিয়ে নেয় আবার কাছে টেনে নেয় ভালোবাসায়।

"সগুণও খন্ড, নির্গুণও খন্ড—সগুণের অতীত নির্গুণের অতীত—সেই পূর্ণ জিনিষ পাওয়া যায় ভালবাসায়—প্রেমে। সেই-ই সগুণ, সেই-ই নির্গুণ, সে-ইতো।"

মায়ের চরণ এবং কোল কোন্‌টা ঠিক জিজ্ঞেস করায় বাবা বললেন—"দুইই ঠিক তবে শিশু কোলকেই জানে আর বড় হলে মায়ের চরণের কথা বলে। মায়ের কোলে উঠলে সগুণ, নির্গুণ সব সমন্বয় হয়ে যায়।

"শিশু হয়ে মায়ের কোলে যেতে হবে। উর্ধ্ব অধো সমান না হলে মায়ের কোলে যাওয়া যাবে না। আপন হয়ে কোলে যেতে হবে। বড় হয়ে ছোট হতে হবে। শিশু না হলে ভালবাসা পাওয়া যাবে না—প্রেম পাওয়া যাবে না। শিশু হতে হবে এবং তাঁকে মা জ্ঞান করতে হবে। শিশু হতে না পারলে বড় হওয়া যায় না। ছোট না হলে বড় হবে কি করে? ছোট হয়ে কোলে যাবে মার এটা শিশুর আব্দার। শিশু ছোট হয়ে বড় হয়েছে মা'র কোল আছে সেই জন্য। আপন হতে হবে।

"যে দুর্গা সেই অন্নপূর্ণা অথচ আলাদা—এটাই লীলা। ইচ্ছাশক্তি উমা-কুমারী। দুর্গা কুমারীতত্ত্ব। চিনতে হবে। চিনতে পারে না।

"ইচ্ছাশক্তি কুমারী। জ্ঞানশক্তি আলাদা—ক্রিয়াশক্তি আলাদা। দেখে কে,

চোখ নেই। সবই এক। কুমারীপূজাই দুর্গাপূজা। ষট্‌চক্রের মধ্যেই কুমারী আছে।"

তারিখ—৯।৯।৭৫।

বারীনবাবু আজ সকালে বাবাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, শরণাগতি এবং নির্ভরতার মধ্যে কোন পার্থক্য আছে কি না। বাবা বললেন, "দুটো একই জিনিষ।"

তারপর বারীনবাবু প্রশ্ন করলেন, সাধনায় প্রার্থনার স্থান কি? বাবা বললেন, "সাধনায় নিজে শক্তি অর্জন করা হয় আর প্রার্থনা হচ্ছে চাওয়া—এটা খণ্ড জিনিষ।"

জিজ্ঞেস করলাম, "আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণধূলির তলে' এটা কি প্রার্থনা নয়?" বাবা উত্তরে বললেন, "এটা অনেক উপরের জিনিষ—কালের অতীত, সৃষ্টির অতীত। যখন সবার জন্য চাওয়া হয় তখন আর তা খণ্ড থাকে না। অখণ্ড হয়ে যায়। প্রার্থনা সবার জন্য করলে আর খণ্ড থাকে না।"

তারিখ—১১।৯।৭৫।

"আবরণ আছে বলেই তুমি বন্ধ জীব। সৃষ্টি মানেই আবরণ। আবরণ সরে গেলেই আনন্দ পাবে। আবরণ না থাকলে সৃষ্টি হয় না। সাধনার উদ্দেশ্য হল আবরণ সরানো।

"ছন্দ মানে তালে তালে—সচ্ছন্দ হয় তাল থাকলে।"

তারিখ—১২।৯।৭৫।

"গুরু যা ইষ্টও তাই। গুরুও ভগবান্ ইষ্টও ভগবান্। অজ্ঞানে গুরু, ইষ্ট আলাদা। গুরু আছেন জ্ঞানদানের জন্য। ভগবান্ ছাড়া দ্বিতীয় বস্তু নেই। অজ্ঞান না থাকলে গুরু, ইষ্ট থাকে না।

"মানুষের স্বাধীনতা বা Freedom আছে। সে Freedom-এর সদ্‌ব্যবহার করলে আনন্দলাভ করতে পারে। কিন্তু সে Freedom-এর সদ্‌ব্যবহার করতে পারে না। কারণ Freedom ঠিক ঠিক ভাবে ব্যবহার করতে হ'লে তাঁর উপর নির্ভর করা চাই। আমরা তা করি না। আমাদের সে বিশ্বাস নেই। তাই আমরা লক্ষ্যভ্রষ্ট হই।"

তারিখ—১৮।৯।৭৫।

আজ দুপুরে খাওয়ার পর বাবা বললেন, "যখন খুলে যাবে তখনই এ

উৎসবের সার্থকতা হবে। পাপও খারাপ নয়, পুণ্যও খারাপ নয়। পাপ-পুণ্যের বিরোধই খারাপ।"

বিরোধ কখন হয় জিজ্ঞেস করায় বললেন, "পাপ যখন পুণ্যকে ঈর্ষা করে এবং পুণ্য যখন পাপকে ঘৃণা করে তখনই খারাপ হয়। পূর্ণের মধ্যে কোন-টাই খারাপ নয় এটা বুঝতে পারলে আনন্দই আনন্দ। মৃত্যু থাকলে স্বর্গ, নরক থাকে। যখন কাল থাকে না, মৃত্যু থাকে না, তখন স্বর্গ, নরকও থাকে না। তখন আনন্দই আনন্দ।"

তারিখ—৬।১০।৭৫।

আজ সকালে বীজদান এবং কায়াদান সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করায় বাবা বললেন, "পূর্ণ হতে গেলে দুইটিই প্রয়োজন। বীজও অপূর্ণ, কায়াও অপূর্ণ—দুইটির সমন্বয় হলে পূর্ণ হয়।" বাবা আরও বললেন, "শিশু মায়ের কোলে যাওয়ার জন্য উতলা হয় এবং ঝাঁপ দেয়—মাও হাত বাড়িয়ে কোলে তুলে নেয়—এখানেই হয় দুইয়ের মিলন। এটাই পূর্ণ"। রাত্রিতে বাবাকে জিজ্ঞেস করলাম, সৎসঙ্গের ফলে জীবন কিভাবে রূপান্তরিত হতে পারে? বাবা উত্তরে বললেন, "সৎসঙ্গ মানে কি বুঝ? জগতে একটাই সদ্‌বস্তু আছে, সৎ ছাড়া জগৎ নেই। জগৎ ব্রহ্মেরই রূপ। যে খারাপ তার মধ্যেও বহু বস্তু আছে। তোমার দৃষ্টি খোলেনি তাই তুমি দেখতে পাও না। দৃষ্টি খুললে দেখতে পাবে সৎ ছাড়া কিছুই নেই—এক সৎই আছে। দৃষ্টি খুলবে কি প্রকারে সেটা স্বতন্ত্র কথা।"

ধীরেন মুখার্জি মশাই জিজ্ঞেস করেছিলেন, হিন্দুধর্মে conversion আছে কি না। বাবা বললেন, "তার উত্তর পণ্ডিতরা দেবেন। সবকিছু কর্ম-ফল দ্বারা নির্দ্ধারিত হয়।" ধীরেনবাবু জিজ্ঞেস করলেন, কর্মফলের বাইরে কি করে যাওয়া যাবে? বাবা বললেন, "মুক্তি হলে।" প্রশ্নঃ মুক্তি কবে হবে? বাবার উত্তর, "শক্তি অর্জন করলে। জগতে যা কিছু হচ্ছে সব তাঁর ইচ্ছায়। তাঁর ইচ্ছায় ভালও হতে পারে! মুনিঋষিরা চিন্ময় হয়েছিলেন। জগতে পরিবর্ত্তন আসবে। তিনিই আনবেন।"

তারিখ—৯।১০।৭৫।

আজ সকালে কৃপা এবং পুরুষকার সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করায় বাবা বললেন, "কৃপা এবং পুরুষকার সঙ্গে সঙ্গে চলে। কৃপা ছাড়া পুরুষকার নেই। পুরুষকার ছাড়া কৃপা নেই।"

তারিখ—১৪।১০।৭৫।

বাবাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, দ্বন্দ্বের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায় কি করে? উত্তরদানপ্রসঙ্গে বাবা বললেন, "সুপ্ত শক্তি জাগরণের জন্য দ্বন্দ্বের প্রয়োজন। দ্বন্দ্ব নেই এরূপ হতেই পারে না। দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়েই দ্বন্দ্বাতীত অবস্থায় যেতে হয়। পূর্ণ সত্যকে পেলে দ্বন্দ্ব থাকে না। Struggle ভিন্ন জিনিষ খুলতেই পারে না। Struggle-এর মধ্য দিয়েই পুরুষকার কাজ করে।"

তারিখ—১৫।১০।৭৫।

বারীনবাবুর প্রশ্নের উত্তরে বাবার উপদেশ—"সব নিয়ে ভগবানের উপর বিশ্বাসটা রেখে যথাশক্তি নিজে চেষ্টা করবে। সমস্ত অর্পণ করবে গুরুকে—ভগবানকে। তাহলে উপর থেকে নীচে, নীচে থেকে উপরে আসবে এবং সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হবে। এটা চেষ্টা করতে হয়। কষ্ট হয়, দুঃখ হয়—যত বড় বড় লোক সবারই হয়েছে—নিরাশ হওয়ার কারণ নেই। আশা দিতে পারি না। আশা দিয়ে কি হবে? সমস্ত মূলে এমন ভাব হবে—উপর থেকে নীচে যাওয়া এবং নীচে থেকে উপরে আসা সাম্যাবস্থা হবে, সমভাব আসবে। চেষ্টা করতে হবে। সব সময় ভগবানের উপর বিশ্বাস রাখতে হবে—এই হচ্ছে কথা। বিশ্বাস কেউ দিতে পারে না। ভগবানকে স্মরণ কর। কখনও ভরসা হারাবে না। ভগবানের কৃপা সর্বদা অটুট রয়েছে। সব সময় আশা রাখতে হবে।

"আশা ভঙ্গ করাই যেখানে উদ্দেশ্য সেখানে আশা দেবেন কেন? এই সকল আশা থাকবে কি? ভগবানের উপর নির্ভর করতে হবে দুঃখের মধ্যেও, সুখের মধ্যেও। অধোও নেই, ঊর্ধ্বও নেই—অধো ঊর্ধ্ব সব সমান হয়ে যাবে এই হচ্ছে কথা। যত দুঃখকষ্ট আসুক নিরাশ হবে না কখনও।

"ভগবানের লীলা ভক্তের সঙ্গে খেলা। ভগবানের অধীন তো সকলেই। আশা তো রয়েছেই। তিনি তো আনন্দময়ই—এটা হবেই। তুমি যতই দুঃখ দাও আমি টলব না—আমি ছাড়ব না। গুরু শিক্ষা দেবেন। সবই হতে হবে। কিন্তু চরমে আনন্দ।"

তারিখ—১৬।১০।৭৫।

যোগেনদার (যোগীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়) মেয়ে বিকেলে এসে বাবাকে প্রণামের পর জিজ্ঞেস করলেন, কি করলে ভক্তি হয়? উত্তরে বাবা বললেন, "সমস্ত মনপ্রাণ তাঁকে ঢেলে দিতে হবে—দিতে হবে এবং নিতে হবে। তারপর দেওয়া থাকবে না, নেওয়াও থাকবে না।"

প্রসংগ পরিবর্ত্তন করে বলতে লাগলেন, "শ্বাসেতে গতি রক্ষা করতে হয়। গতি রোধ করলেও ভাল হয় না, আবার বেশী করলেও ভাল হয় না। দুইয়ের সাম্যাবস্থা চাই—দুটোর সমন্বয় করতে হয়। ব্যুত্থান এবং নিরোধের অতীত। ভগবানের মধ্যে ক্রিয়াও আছে, নিষ্ক্রিয়াও আছে। যোগের পক্ষে সাম্যাবস্থা দরকার। যোগীর পক্ষে সাম্য চাই। আনন্দের ত্যাগ হওয়া চাই। আনন্দ আমার অধীন। আনন্দও চাই না, নিরানন্দও চাই না—দুইয়ের অতীত—সমম্বয়, সমন্বয়।

"হ্লাদিনী শক্তির পরে আনন্দ—খন্ড হবে না—অখন্ড আনন্দ। খন্ড আনন্দ ভোগ।

"শিশু মায়ের কোলে ঝাঁপ দিয়ে যায়। মায়ের কোল পেলে সুখও চাই না, দুঃখও চাই না—সুখদুঃখের সাম্যাবস্থা চাই। সুখদুঃখের অতীত হতে হবে—স্থায়ী আনন্দ।

"ভোগটাও ত্যাগে পরিণত হয়। ত্যাগটা ভোগ হয়। বিরোধ থাকে না। বিরোধ না থাকলেই আনন্দ। শুধু ত্যাগে আনন্দ স্থায়ী হয় না। ভোগেও আনন্দ স্থায়ী হয় না। পূর্ণের মধ্যে সুখও থাকে, দুঃখও থাকে অথচ কোন-টাই থাকে না। মায়ের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়া—মা কোলে নেয়—এটাই আনন্দ। কোলে ঝাঁপিয়ে পড়া কঠিন, ভয় করে।"

দেবীপ্রিয়া জিজ্ঞেস করল, "আমরা 'অহং যাওয়া, অহং যাওয়া' বলি কিন্তু অহং যাবে কি করে?" উত্তরে বাবা বললেন, "অহং যাবে কোথায়?—পরিবর্ত্তন হবে! ঊর্দ্ধে যাবে অধোতে আসবে, দুইটি সমান সমান হয়ে যাবে তখন আর কিছু থাকবে না—তখন সমান সমান হয়ে যাবে। সাম্য হবে।

"যেখানে দুঃখও নেই, সুখও নেই, আবার সুখও আছে, দুঃখও আছে। দুই সমান হয়ে গেছে—সমান হয়ে সাম্যাবস্থা হয়ে যায়। দুঃখেরও সার্থকতা আছে। দুঃখও থাকবে না। এমন একটা জিনিষ আসবে যেটা অদ্বিতীয়—সুখ-দুঃখের অতীত পরমানন্দ অবস্থা। দুঃখ সুখে পরিণত হবে, সুখ দুঃখে পরিণত হবে—সুখ-দুঃখের অতীত।"

তারিখ—২০।১০।৭৫।

বিকেলে এক ভদ্রলোক এসে বাবাকে দর্শন করে বললেন, "অনেকদিন ধরে আপনাকে দেখবার বাসনা ছিল, আজ আপনার দর্শন পেলাম।" বাবা বললেন, "দুই হাত দুই পা-সম্বলিত মানুষ। আসল জিনিষ ভিতরে গুপ্ত আছে।"

আবার বললেন, "মায়ের কোলে উঠলে রসের আস্বাদ হয়। প্রেম, ভক্তি,

জ্ঞান সব সঙ্গে থাকলে রসের আস্বাদন হয়। শুধু জ্ঞান নীরস, শুধু ভক্তি অজ্ঞান। মায়ের কোলে উঠলে পূর্ণে যাওয়া যায়, সেখানে সব আছে।"

তারিখ—২২।১০।৭৫।

প্রশ্ন রেখেছিলাম বাবার কাছেঃ সাধারণভাবে ধর্মপথে অগ্রসর হওয়ার জন্য পথিককে বলা হয় শ্রেয়কে গ্রহণ ক'র, প্রেয়কে ত্যাগ কর। উত্তরে বললেন, "এটা পূর্ণত্ব নয়। এটা onesided পূর্ণ। মন্দের মধ্যেও ভাল আছে সেটা দেখে কে? ভগবানের রাজ্যে মন্দ জিনিষ নেই। মন্দের মধ্যেও ভাল আছে। ভালটাও ভাল, মন্দটাও ভাল—সবটাই ভাল। ভগবানের রাজ্যে খারাপ নেই। মন্দটাও ভাল হয়। চরমটা আনন্দ, পূর্ণ আনন্দ।

"আমি লাফিয়ে পড়লে মা তখনই কোল পাতেন।

"দুঃখ পাপের ফল, পুণ্যের ফল সুখ, সেটা জগতের জিনিষ।"

তারিখ—২৬।১০।৭৫।

বাবা বললেন, "ইচ্ছা করবে না, ইচ্ছা হবে। ইচ্ছাও হবেও না। তারপর এমন অবস্থা আছে ইচ্ছা করা এবং ইচ্ছা হওয়ার অতীত—দুইয়ের কোনটাই নয়।"

তারিখ—২৭।১০।৭৫।

কর্মবর্জিত কৃপার অর্থ কি জিজ্ঞেস করায় বাবা বললেন, "অহৈতুকী কৃপা, স্বাভাবিক কৃপা।"

গোপালদা জিজ্ঞেস করলেন, অনেকে মহাপুরুষদের নিকট গেলে কর্ম ব্যতিরেকেই কৃপা পান কেন? উত্তরে বাবা বললেন, "সে জানে না তার প্রাপ্য পূর্বজন্মার্জিত।" আবার বললেন, "ভগবানের মধ্যে সবকিছু আছে—ভগবান বড় কঠিন জিনিষ।"

জিজ্ঞেস করেছিলাম, ক্রিয়াশক্তি কি মায়াশক্তিরই রূপান্তর? উত্তরে বললেন, "ক্রিয়াশক্তি এবং জ্ঞানশক্তি একই সঙ্গে কাজ করে এবং তার অতীত হয়ে যায়, ঠিক তা উপলব্ধি করলে বুঝা যায়।"

তারিখ—২৯।১০।৭৫।

বাবাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, দেহে থাকতে কর্মের গতি ক্ষিপ্র হয় কিন্তু দেহাতীতে কর্মের গতি শ্লথ হয় কেন? বাবা সোজাসুজি উত্তর না দিয়ে বললেন, "দেহ না থাকলে দুঃখের বোধই হয় না। অধোও পূর্ণ নয়, উর্ধ্বও পূর্ণ নয়। কর্ম স্বভাবে হয়—সে অবস্থা কি, ভাষা দিয়ে বুঝানো যায় না।"

তারপর বললেন, "গুরু চেনা বড় কঠিন, যতক্ষণ গুরুর কৃপা না হয়। বাহিরে rough, রুক্ষ। ভিতরে আনন্দে ভরা।"

তারিখ—৩০।১০।৭৫।

বাবাকে জিজ্ঞাসা করলাম, পরমপদ দেখা এবং পরমপদ লাভ করা এই দুইয়ের মধ্যে কি পার্থক্য আছে? উত্তরে বললেন, "সর্বদাই দেখতে পায়। সংযোগ থাকলে বিলয় থাকবে সংযোগও নেই, বিলয়ও নেই অথচ দুইই আছে —সমন্বয় করতে হবে।

লাফ দিলাম এবং মায়ের কোলে গেলাম—শূন্যে পড়লাম না। সমন্বয় না করলে শাস্ত্র ধ্বংস হয়ে যাবে। সব side দেখতে হবে।"

আবার বললেন, "মারার মধ্য দিয়ে আশ্রয় আছে। দেখলে মনে হয় মারে কিন্তু আশ্রয় আছে।"

তারিখ—১।১১।৭৫।

বাবা বললেন, "ভগবানের কৃপা limited নয়। উপর থেকে নীচে, নীচে থেকে উপরে অনবরত বয়ে যাচ্ছে। ভগবানের কৃপার জন্য প্রার্থনা কর।"

তারিখ—৩।১১।৭৫।

বাবাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, যদি সেই মহাপ্রকাশের আবির্ভাব হয় তাহলে মানুষ যে ক্রমবিকাশের ধারা ধরে অগ্রসর হয়েছে তার কি মূল্য থাকবে না? উত্তরে বললেন, "সব বদলে যাবে। সবই নিত্য হবে। অনিত্য বলে কিছু থাকবে না।"

তারিখ—১।১।৭৬।

বাবা বললেন, "অদৃষ্টকে পুরুষকার খণ্ডন করতে পারে না। অদৃষ্ট এবং পুরুষকারের অতীত যে অবস্থা আছে সেখানে গেলে অদৃষ্ট কাজ করে না। পুরুষকারও কাজ করে না। পুরুষকারও transcend করতে হবে, অদৃষ্টও transcend করতে হবে অর্থাৎ তার অতীতে যেতে হবে। তিনি যখন ভার নেবেন তখন অদৃষ্টের ভয় কেটে যাবে। সেখানে পুরুষকারও আছে, অদৃষ্টও আছে অর্থাৎ পূর্ণ জিনিষ কিন্তু কোনটাই নেই। কর্তৃত্ব থাকলে সে অবস্থা আসে না।"

তারিখ—২।১।৭৬।

রজনীকান্তের গান উদ্ধৃত করে ব্যাখ্যা চাইলাম। 'জানি না কিছু, বুঝি না কিছু, দাও হে জানায়ে বুঝায়ে।'

বাবা বললেন, "এটাই আসল জিনিষ। তাঁর লীলা। বড়ও তিনি, ছোটও তিনি। তিনি বুঝিয়ে না দিলে আমি কি করে বুঝব? আমি বড় হব, আমি ছোট হব—এও অহংকার। তিনি কোলে নেবেন এটাই আসল জিনিষ। তিনি ছাড়া কিছু নেই। তিনি বুঝলে বুঝি, না বুঝলে বুঝি না। তিনি সবের মূল, আবার বুঝা না বুঝার অতীত। তিনি আমায় গড়ে নেবেন। আমার কাজ হচ্ছে গা ঢেলে দেওয়া। জানারও মূল তিনি, না জানারও মূল তিনি। সব হয়ে যায়, বুঝতে চাই না—বুঝার দরকারও নেই। সবের মূলে তিনি। তিনিও আমি, আমিও তিনি। তিনি ছাড়া কিছু নেই। তিনিই জাগিয়ে নেবেন।"

অমরনাথ নামে এক ভদ্রলোক এসেছিলেন সাহারানপুর থেকে বাবার কাছ থেকে সাধনপদ্ধতি জেনে নেবার জন্য। বাবা তাঁকে উদ্দেশ করে বললেন, "ভগবানে বিশ্বাস রাখুন। তিনি সব করবেন। আমি তাঁর বাচ্চা। তিনিই সব করেন। মানুষ কিছুই করে না।"

তারিখ—২১।১।৭৬ রাত্রি।

বাবাকে বললাম, মনে একটা প্রশ্ন জাগছে তার সমাধান হওয়া দরকার। প্রশ্নটা হচ্ছে, শিব জীব হয়েছেন লীলায়, আবার শিব হবেন অনুগ্রহের ফলে অর্থাৎ নিজে সঙ্কুচিত হয়ে জীবত্ব গ্রহণ করেছেন। পরম গুরুদেব বলতেন মানুষ কি ভগবান হয় গো—মানুষ মানুষই থাকে। উত্তরে বাবা বললেন, "মানুষ ভগবান হয় না এও সত্য, আবার মানুষ ভগবান হয়, আবার তার অতীতও হয়, এও সত্য।"

তারিখ—২১।১।৭৬।

এক প্রশ্নের উত্তরে বাবা বললেন, একই আছে, দুই নেই। লীলাচ্ছলে, খেলাচ্ছলে বহু হয়েছেন—ছোট হয়েছেন, বড় হয়েছেন। অথচ ছোটও নেই, বড়ও নেই। Centre থেকে Circumference এবং Circumference থেকে Centre-এ যাবার খেলা।"

জিজ্ঞাসা করলাম, জীব তাহলে অজ্ঞানে এই খেলায় অংশ গ্রহণ করছে? উত্তরে বাবা বললেন, "মহাপ্রকাশের সময় জ্ঞানে খেলায় অংশগ্রহণ করবে। তিনি না বুঝিয়ে দিলে বুঝতে পারা যায় না। জ্ঞানে খেলা নেই, মায়ায় সব আছে। মায়াতীত অবস্থায় কিছুই নেই, আবার সব আছে।"

তারিখ—৬।২।৭৬।

বারীনবাবু প্রশ্ন করলেন, পরিবেশ সৃষ্টি হলে মহাপ্রকাশ খুলবে, না

মহাপ্রকাশ হলে পরিবেশ সৃষ্টি হবে। উত্তরে বাবা বললেন, "দুই একই সঙ্গে হবে।" তারপর আবার বললেন, "মহাপ্রকাশের স্থিতি ঊর্ধ্বে অধোতে নয়—মধ্যে। মহাপ্রকাশ হলে ষট্‌চক্র আলোকিত হয়ে যায়। নাভি, হৃদয়, সহস্রার আলোকিত হয়ে মহাপ্রকাশ খোলে।"

তারিখ—৭।২।৭৬।

বারীনবাবু প্রশ্ন করলেন, মানুষ চেষ্টা দ্বারা কতটা লাভ করতে পারে? উত্তরে বাবা বললেন, "পূর্ণত্ব পর্যন্ত।"

প্রশ্ন: এই চেষ্টার প্রেরণা কার কাছ থেকে আসে?

উত্তর: "পূর্ণের দিক থেকে—ভগবানের নিকট থেকে আবার যার কাছ থেকে যায় তার কাছ থেকে। চেষ্টার দ্বারা প্রাপ্তিতে প্রকারভেদ আছে—ছোট, বড় সব কিছু পাওয়া যায়—সেখানে সমন্বয় হয়।"

প্রঃ ভগবৎপ্রাপ্তির চেষ্টা কি করে বাড়ান যায়?

উঃ "নানা উপায় আছে, যার যেটা লেগে যায়।"

প্রঃ গুরুশক্তি ভগবৎপ্রাপ্তিতে সাহায্য করে কি না?

উঃ "করে এবং করে না। আগ্রহ বেশী হলে সাধকের মধ্য গুরুশক্তি কাজ করে।"

প্রঃ শরণাগতির ভাব ভাল, না প্রপত্তির ভাব ভাল?

উঃ "দুইই এক।"

তারিখ—১০।৪।৭৬।

বাবাকে জিজ্ঞেস করলাম, শারীরিক দুর্বলতা ছাড়া আর কি অসুবিধা আছে? উত্তরে বললেন, "সবই তো অসুবিধা—সবই অপূর্ণ। মানুষও অপূর্ণ—এখনও খণ্ড।" পূর্ণতা কবে আসবে জিজ্ঞেস করায় বললেন, "দেখ কবে হয়।"

তারিখ—১৪।৫।৭৬ বিকেল।

বাবাকে জিজ্ঞেস করলাম, লোক কাশীবাসী হবার কথা বলে কিন্তু হরিদ্বারবাসী, কনখলবাসী হবার কথা বলে না কেন?

উঃ "কাশী নিত্যধাম।"

গোপালদা জিজ্ঞেস করল, গ্রহণের আধ্যাত্মিক তাৎপর্য কি?

উঃ "দুই জিনিষ এক হয়ে যায় গ্রহণের সময়।"

প্রঃ দুই বলতে কি বুঝায়?

বাবা উত্তরে বললেন, "আমি আর তুমি।"

তারিখ—১৭।৫।৭৬।

প্রশ্ন করেছিলাম বাবাকে, প্রকাশে এবং মহাপ্রকাশে পার্থক্য কি?

উত্তরে বললেন, "একই জিনিষের দুটো দিক—মহাপ্রকাশ অখন্ড।"

প্রঃ প্রকাশ কি খন্ড? উত্তরে বললেন "না"।

(স্বগতোক্তি) "তাঁর খেলা তিনিই জানেন।"

প্রশ্ন করলাম, এখন তো অজ্ঞানের মধ্যে অভিনয় করছি। জ্ঞানলাভের পরে কি অভিনয় থাকবে?

উত্তরে বললেন, "বুঝতে পারবে জ্ঞানচক্ষু খুললে তবে, সবাই বুঝতে পারবে না।"

ওঁকার সম্বন্ধে মা যাহা বলিয়াছেন, তাহা শাস্ত্রের কথা ও তাহা পূর্ণ সত্য। শাস্ত্রে বলা হইয়াছে যে ওঁকার এবং 'অথ' এই সৃষ্টির আদি শব্দ। ওঁকার শব্দ ব্রহ্মস্বরূপ। পরব্রহ্মের বহিঃপ্রকাশই শব্দব্রহ্ম। তিনি পরাশক্তির স্বরূপ। উপনিষদে ওঁকারকে উমা বলিয়া অর্থাৎ পরশিবের পরাশক্তি বলিয়া নির্দেশ করিয়াছে। সৃষ্টির মূলে এই শব্দই রহিয়াছে। ইহাই ব্যাহৃতিরূপে ভূ ভুর্ব স্বঃ। ইহাকে গ্রহণ করিয়া বিশ্ব রচনা করিয়া থাকে। শব্দ, শাস্ত্র অনুসারে, পর ও অপর ভেদে দুই প্রকার। পর শব্দই আদি শব্দ অথবা আদি স্পন্দন, যাহা হইতে বিশ্বে যাবতীয় পদার্থ এবং ভাবনিচয় বাহিরে প্রকাশিত হইয়াছে। শব্দ পর-অপর ভেদে দ্বিবিধ, ইহা বলা হইয়াছে। অপর শব্দ তিন প্রকার। প্রথমটিতে শব্দ এবং অর্থ অখন্ড অনুভবে নিত্য প্রকাশমান রহিয়াছে। দ্বিতীয়টিতে ঐ শব্দ শুদ্ধ বিকল্পরূপে চিত্তাকাশে স্ফুরিত হইতেছে। তাহার পর তৃতীয় স্তরে ঐ শুদ্ধ বিকল্প বহির্মুখ হইয়া বাহ্য বায়ুর আঘাতপ্রাপ্ত হয়। যতক্ষণ শুদ্ধ সংকল্প রাজ্য ছিল বাহ্য বায়ুর স্পর্শ ছিল না। সেখানে জ্যোতিনাদ দিব্য সম্পদরূপে নিরন্তর উচ্ছ্বসিত হইয়া চিদাকাশের দিকে ধাবমান হইয়াছে। বাহ্য বায়ুর সংস্পর্শে আসিয়া শব্দ ঘনীভূত হয়, তখন প্রাণের সঙ্গে যোগ হয়, শ্বাসপ্রশ্বাসের উদয় হয়, এবং শ্রোত্রগ্রাহ্য মূলবর্ণরূপে শব্দ প্রকাশিত হয়। ইহাকে 'বৈখরী' বলে। ইহাই জীবের বন্ধাবস্তা। এই বিরাট বাহ্যপ্রপঞ্চ সব ইহারই অন্তর্গত। লোক-লোকান্তর অসংখ্য বিরাজমান কিন্তু সবই বাহ্য বায়ুর অন্তর্গত। বিশেষ এই স্তরে দেহের অভিমান স্পষ্ট থাকে। শব্দের সঙ্গে তার প্রকাশ্য অর্থের এখানে কৃত্রিম সম্বন্ধ স্থাপিত। তখন শুদ্ধ বিকল্পের স্থানে অশুদ্ধ বিকল্পের শ্বাস প্রশ্বাসের গতি ইড়া-পিঙ্গলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হয়। সুষুম্না নাড়ী একপ্রকার বন্ধ থাকে। এই যে বৈখরী ইহা লৌকিক জগতে শব্দরূপে ও ভাষারূপে সকলের নিকট পরিচিত। শুদ্ধশব্দ বৈখরী বা অন্তর্বৈখরী নহে। অন্তর্বৈখরীর পর শুদ্ধ বিকল্পের আভাস জ্যোতি উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রাপ্ত হওয়া যায়। বায়ুর বামাবর্ত দক্ষিণাবর্তের গতি থামিয়া যায়। ইহার পর ঐ শব্দ ক্রমশ আদিবাক ও পরাবাক পর্যন্ত পৌঁছিয়া যায়। তাহাই

প্রকৃত শব্দ-ব্রহ্ম যাহা পরব্রহ্মের সহিত অভিন্ন। তখন পূর্ণ অহং বোধের উদয় হয়। জগতের সর্বত্র অহং-ই বিরাজ করে। যোগী ঋষিগণ পরাবাক্-কেই ওঁকাররূপে নির্দেশ করেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, অতীত-অনাগত-বর্তমান, স্থূল-সূক্ষ্ম-কারণ সব কিছু উহা হইতে উদ্ভূত। এই যে শব্দমূলক জগৎ-সৃষ্টি ইহা বিশ্বের সকল ধর্মেই কিছু কিছু বর্ণিত হইয়াছে।

যত প্রকার বীজ-মন্ত্র তন্ত্রশাস্ত্রে প্রচলিত সেই যাবতীয় মন্ত্রসমূহ পূর্ণ অহং সত্তা হইতেই স্ফুটিত হইয়াছে। ইহাকে প্রাপ্ত হইলে জাগরণ অর্থাৎ পূর্ণ চৈতন্য লাভ হয়। পৃথিবীর যত ভাষা সকলের মূলে বর্ণমালা। বর্ণ যেভাবে সজ্জিত হোক্ না কেন মূলে একই। এই বর্ণমালা দিয়া ভাষা রচিত হয়। ভাষার দ্বারা ভাবের প্রকাশ হয়। কিন্তু মূলে যে বর্ণাতীত নাদ রহিয়াছে তাহাই বোধের মূল। যাহা সকল দেশের ভাষাস্থিত বর্ণমালার পৃষ্ঠভাগে বর্তমান রহিয়াছে, তাহার মূল জ্যোতি। এই মহা জ্যোতি ওঁকার স্বরূপে পৌঁছিয়া দেয়, সুতরাং প্রত্যক্ষ ভাবে না হইলেও পরোক্ষভাবে ওঁকারই সকল ভাষার মূল। যাহারা জপ করিয়া মন্ত্রচৈতন্য করিয়াছে, তাহারা বুঝিতে পারিবে।

ঐ যে বলা হইয়াছে অশুদ্ধ শব্দ হইতে শুদ্ধ শব্দের সঙ্গে অন্তর্জগতে প্রবেশ—উহার মর্মগ্রহণ আবশ্যক। পূর্বেই বলিয়াছি, চিত্তের ঊর্ধ্বমুখ মার্গ খুলিয়া গেলে নাদের প্রকাশ আপনা আপনি ঘটে; বৈখরী অক্ষরের সঙ্গে অথবা নাদের সঙ্গে অনুস্বার সংযোগ করিলে নিরন্তর জপের প্রভাবে ঐ অনুস্বার নাদে পরিণত হইয়া যায়। নাদে পরিণত হইলে স্থূল আবরণ কাটিয়া যায়। তান্ত্রিক প্রক্রিয়া-বিশেষের মধ্যে বর্ণ অথবা পদের পরে অনু-স্বারের নিরন্তর চিন্তনের ইহাই উদ্দেশ্য। নাদে উপনীত হইলে বিশ্বব্যাপী স্রোত খুলিয়া যায়। গ্রন্থিবন্ধন সব খসিয়া যায়। ভাবগ্রন্থি, দ্রব্যগ্রন্থি প্রভৃতি নানা প্রকার গ্রন্থি জীবভাবের মধ্যে বিদ্যমান থাকে। ঐ সব গ্রন্থির মূল গ্রন্থি—অহং বা অহংকার। ব্রহ্মগ্রন্থি, বিষ্ণুগ্রন্থি, রুদ্রগ্রন্থি, উহারই প্রকারভেদ, শুধু স্থূল গ্রন্থি নহে ভাবগ্রন্থিও কাটিয়া যাওয়া আবশ্যক। তবে সে অবস্থাকে মুক্তাবস্থা বলা যায়। দেহাত্মবোধের মূলে যে অহংকার সেটি সর্বজনপরিচিত। সব গ্রন্থি কাটিয়া গেলে জীব তখন তৎ তৎ ভিন্ন আকারে নিজেকে প্রকাশমান দেখে না। সমস্ত বিশ্ব তখন তাহার আপন হইয়া যায়। গ্রন্থিহীন বলিয়াই তখন তাহাকে মুক্ত পুরুষ বলা চলে।

গায়ত্রী সম্বন্ধে কয়েকটি কথা

যাঁহারা গায়ত্রী জপ করেন তাঁহাদের পক্ষে এই কয়েকটি কথা মনে রাখিলে ভাল হয়। গায়ত্রী বেদমাতা বলিয়া আমাদের দেশে প্রাচীনকাল হইতে পূজিত। গায়ত্রী ভিন্ন ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব সিদ্ধ হয় না। গায়ত্রী মন্ত্রের ঋষি বিশ্বামিত্র। তিনি ক্ষত্রিয়, এই গায়ত্রীর প্রভাবে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন। গায়ত্রী কামধেনুস্বরূপা। গায়ত্রী মন্ত্রের লক্ষ্য সবিতা বা সূর্য। বেদ অনুসারে "সূর্য আত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ" অর্থাৎ সূর্যই স্থাবর ও জঙ্গমের জনক। গায়ত্রী মন্ত্রের কয়েকটি ভাগ আছে। প্রথম প্রণব বা ওঁকার; তারপর মহাব্যাহৃতি ভূ ভুর্বঃ স্বঃ, তারপর ত্রিপদা গায়ত্রী ২৪ অক্ষর। তারপর গায়ত্রীর শির। আমি ইহার মধ্য মধ্য অংশ সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিব।

গায়ত্রী মন্ত্রের প্রথম যে ওঁকার তিনি শব্দব্রহ্মের স্বরূপ, বিশ্বসৃষ্টির মূল। তারপর তিনটি ব্যাহৃতি আছে, ভূ-ভুর্বঃ-স্বঃ। এই তিনটি ব্যাহৃতি বিস্তারবশতঃ সপ্তব্যাহৃতি রূপে প্রকাশিত হয়। যাহাকে স্বঃ বা স্বর্গ বলা হয় তাহা দুই ভাগে বিভক্ত। একটি নিম্ন স্বর্গ আর একটি ঊর্দ্ধ স্বর্গ। নিম্নটিকে বলে ইন্দ্রলোক, ভোগপ্রধান দেবতাদের রাজধানী। এইখানে নানা প্রকার দেবদেবী, রম্ভা ইত্যাদি আনন্দ ভোগ করেন। এ স্বর্গটি সুকৃত কর্মের ফলে অর্থাৎ পুণ্য কর্মের ফলে এই লোক লাভ হয়। যাহারা জ্ঞানী অথচ কর্মযুক্ত তাহারা এই স্বর্গে যায় না।

ঊর্দ্ধ স্বর্গ চার প্রকার। মহঃ, জন, তপঃ ও সত্য। পিতৃযান গতির ফলে নিম্ন স্বর্গে গতি হয়। জ্ঞান ও কর্ম সমুচ্চয় হইলে জ্ঞানের সংস্রব থাকার দরুণ কর্ম হইতে ঊর্দ্ধগতি হয়। এইটি ঊর্দ্ধ স্বর্গের গতি। সত্য-লোক অথবা ব্রহ্মলোক পর্যন্ত ইহার ব্যাপ্তি, ভূলোক হইতে সত্যলোক পর্যন্ত সপ্তলোকই বিশ্ব। এই স্বর্গ হইল ঊর্দ্ধলোক। স্বর্গের নীচে ও পৃথিবীর উপরে অন্তরীক্ষ, ইহার নাম ভুবর্লোক, সেখানে গ্রহ নক্ষত্রাদি সঞ্চরণ করে। সকলের নীচে পৃথিবী ভূলোক। এই ভূলোকের মধ্যেও বিভাগ আছে। সর্ব-প্রথম ভূ-পৃষ্ঠ। ইহাকে আমরা পৃথিবী বলি। পুরাণমতে সপ্ত দ্বীপ, সপ্ত সমুদ্র বিদ্যমান। ভারতবর্ষ জম্বুদ্বীপের অন্তর্গত। পৃথিবীর নীচে আছে অধোলোক। তাহার প্রথমে সপ্তপাতাল, পাতালের নীচে নরক। নরকের সংখ্যা অগণিত কিন্তু তার তিনটি স্তর আছে। রৌরব, কুম্ভীপাক প্রভৃতি প্রধান। সকলের নীচে যে নরক সেখানে আলোক প্রবেশ করে না তাহার নাম অবীচি। এই সমষ্টি লইয়া যে জগৎ তাহার নাম ব্রহ্মাণ্ড, যাহার উপরে

সত্যলোক। ব্রহ্মলোক জ্যোতিস্বরূপ, নীচে অবীচি অন্ধকার, মাঝে আছে আলো-অন্ধকার।

এই যে বিশাল বিশ্ব ইহার সৃষ্টি হইয়াছে ওঁকার হইতে। গায়ত্রী মন্ত্রের তিনটি ভাগ আছে, ব্রহ্ম-গায়ত্রীতে তিনটি ভাগ আছে, দেব-দেবতার গায়ত্রীতেও তিনটি ভাগ আছে। গায়ত্রীকে বলা হইয়াছে সবিতা বা প্রসবকারী সূর্য; ইনি পরমাত্মাস্বরূপ। ইঁহার অনন্তশক্তি আছে সেগুলিকে ভর্গ বলে। তন্মধ্যে যেটি শ্রেষ্ঠ শক্তি অর্থাৎ বরেণ্য শক্তি তাহারই উপাসনা করিতে হয়। এই বরেণ্য শক্তি ব্রহ্মজ্ঞানরূপ—মহাশক্তি। ইহাকে ভর্গ বলা হয় এইজন্য যে ইহা জীবের কর্মরাশিকে ভর্জন বা দগ্ধ করে। উপাসক এই বরেণ্য শক্তি বা মহাশক্তিকে উপাসনা করেন। যেখান হইতে এই শক্তি প্রসূত হয় তাহার উপাসনা চলে না। এই যে উপাসনা ইহা ধ্যান রূপ। এই সবিতৃদেবের মহাশক্তির উপাসনার ফলে তাহার স্বরূপকে হৃদয়ে স্থাপিত করা সম্ভবপর হয়।

ধ্যান প্রসার হইলে সাধকের হৃদয়ে এই তেজোময়ী মহাদেবী প্রকাশিত হন। হৃদয়ে এই দেবতা প্রতিষ্ঠিত হইলে তিনি ভক্তের জ্ঞান ও কর্ম উভয় ক্ষেত্রে প্রেরণা দান করেন। তদনুসারে জ্ঞানেন্দ্রিয়কে জ্ঞানের পথে, সত্য জ্ঞানের জন্য প্রেরণা করেন। কর্মেন্দ্রিয়কে কর্মের জন্য শুভ কর্মের পথে প্রেরণা করেন। এই যে উপাসনা ইহা ব্যক্তিগত হইলেও ইহার ফল সমষ্টিগত। তাই এইখানে বহুবচন প্রয়োগ করা হইয়াছে, 'ধীমহি'—'নঃ'। ইহার তাৎপর্য এই সাধকের উপাসনারূপ কর্মের দ্বারা জীবমাত্র উপকৃত হউন। এই গায়ত্রীর তিনটি পদ তাই ইহা ত্রিপদা গায়ত্রী। গায়ত্রীর চতুর্থ পাদ অতি গুপ্ত, তাহা উচ্চকোটী সন্ন্যাসী ব্যতীত কাহারও উচ্চারণ করিতে নাই।

ভাস্কর রায় 'বারিবস্যারহস্য'তে ইহা আলোচনা করিয়াছেন।

* * *

সত্যাপি ভেদাপগমে নাথ তবাহং ন মামকীনস্ত্বম্।
সামুদ্রো হি তরঙ্গঃ ন ক্বচন সমুদ্রো হি তারঙ্গঃ ॥

এই স্তোত্রটি শঙ্করাচার্যের প্রৌঢ় বয়সের রচনা। তিনি যখন এই শ্লোকটি রচনা করিয়াছিলেন তখন তিনি অদ্বৈতের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহার দ্বারা বোঝা যায় যে সাধন-ভক্তি জ্ঞানের পূর্বে উদিত হয়। তাই বলা হয় 'ভক্তির্জ্ঞানায় কল্পতে'। কিন্তু প্রকৃত ভক্তি যাহাকে পরাভক্তি বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে তাহা অদ্বৈত জ্ঞানের ফলেই ভাগ্যবানের হৃদয়ে উদিত হয়। শঙ্করাচার্য বলিয়াছেন, জ্ঞানের দ্বারা ভেদ সর্বপ্রকারে অন্তর্হিত হইয়া গেলে সব অভেদ স্বরূপে একই রূপে প্রতিভাত হয়। সুতরাং ঐ অবস্থা যথার্থ

অদ্বৈত অবস্থা, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ভেদের অভাববশতঃ অদ্বৈত স্বরূপ প্রাপ্তি হইলেও ভক্তির অবসর লুপ্ত হয় না। নদীর তরঙ্গ ও জল উভয়ই এক। কারণ উভয়েই একমাত্র জলের স্বরূপ তথাপি মনুষ্য ব্যবহার কালে উভয়কে পৃথক রূপে উল্লেখ করিয়া থাকে। এইরূপ ব্যবহার করিয়া থাকে যে জলের তরঙ্গ—তরঙ্গের জল এ কথা কেহ কখনও বলে না। সেই প্রকার জীব ভগবানের স্বরূপগত একত্বভাব প্রাপ্ত হইলেও উভয়কে এক বলিয়া নির্দেশ করা হয় না। ভগবান্ ও ভক্ত আত্মা উভয়েই অভেদাত্মক হইলেও ভগবানকে আশ্রয়, ভক্তকে আশ্রিত মনে করা হয়। সেইজন্য গীতাতে প্রথমে বলা হইয়াছে "ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি", এই বলিয়া পরে বলা হইয়াছে 'মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্'।

আত্মা যে ব্রহ্মস্বরূপ তাহা জ্ঞানের দ্বারা প্রাপ্ত হইলেও, 'মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্' বাক্যের দ্বারা বোঝা যাইতেছে, পরাভক্তি লাভ করিয়া থাকে। পরাভক্তি বা স্বরূপা ভক্তি তাহা লাভ করিতে হইলে অদ্বৈত জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া আবশ্যক। অদ্বৈত জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়ার পর ভাগ্যবান সাধক কেহ কেহ তাঁহার মহাকৃপায় তাঁহার প্রতি পরাভক্তি লাভ করিয়া থাকেন। অদ্বৈত জ্ঞান হইলে ভক্ত ও ভগবানের স্বরূপ মূলতঃ অভিন্নরূপে প্রতীত হইলেও, জীবের আত্মা জ্ঞানের মহিমাতে ব্রহ্মস্বরূপের সহিত অভিন্ন হইলেও ব্রহ্মকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করেন এবং তাহার ফলে এই অদ্বৈত ভূমিতেও তাহার প্রতি ভক্তির উদয় না হইয়া পারে না। এই ভক্তির নাম পরাভক্তি। যাহারা শুষ্ক-জ্ঞানী তাহারা এই ভক্তি রসের আস্বাদন করিতে পারে না। শুষ্ক-জ্ঞানী এই পরাভক্তির অবস্থা প্রাপ্ত হইলে ভগবানের সহিত এক হইয়া নিরন্তর তাঁহার মহিমা অনুভব করিতে থাকেন। বস্তুর স্বরূপ এক, ইহারই নাম অদ্বৈত কিন্তু একটির মহিমা অনন্ত অপরটি তাহার অংশরূপ। সেইজন্য ভাগ্যবান ভক্ত জ্ঞানের দ্বারা ভগবানের সহিত নিজের অভিন্নতা বোধ করিয়াও সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বুঝিতে পারেন যে তাঁহার এই অদ্বৈত জ্ঞান ভগবৎ কৃপা হইতে উপলব্ধ। তাই মুক্ত হইয়াও ভক্তির গৌরবে তাঁহার সহিত অভিন্নতা লাভ করিয়াও অনন্তকাল তাঁহার মহিমা কীর্তন করিতে বাধ্য হন। এই ভক্তি জ্ঞানোত্তরা ভক্তি অর্থাৎ অদ্বৈত জ্ঞানের পরে ইহার উদয় হয়। জ্ঞানের পূর্বে যে ভক্তির উদয় হয় তাহা জ্ঞানে পর্যবসিত হয়। জ্ঞানের পূর্বে যে ভক্তি থাকে জ্ঞানের পর তাহা আর থাকে না। তাহা কিন্তু পরাভক্তি নহে। কারণ ঐ ভক্তি জ্ঞানরূপে পর্যবসিত হয়। উহার লক্ষ্য মোক্ষপ্রাপ্তি। কিন্তু জ্ঞানোত্তরা ভক্তি আত্মাকে চিরদিন ভগবানের মহিমা অনুভব করিতে বাধ্য করে। পূর্বোক্ত বিবরণ হইতে বোঝা যাইবে জ্ঞানী দুই প্রকার। এক প্রকার জ্ঞানী ভক্তি সাধনার

দ্বারা জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া অর্থাৎ ভগবদ্‌ভাব অদ্বৈতরূপে প্রাপ্ত হইয়া সেইখানে মোক্ষ লাভ করেন এবং ঐখানেই তাঁহার গতিরোধ হয়। আর এক প্রকার সাধক আছেন তাঁহারা জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া এবং জ্ঞানের পর মুক্তি লাভ করিয়াও ভগবানের গুণকীর্তনে নিত্য তন্ময় থাকেন। ইঁহাদের যে ভক্তি তাহাই জ্ঞানোত্তরা পরাভক্তি। এই প্রকার ভক্তির শেষ নাই কারণ ইহা অহৈতুক। অন্য প্রকার ভক্তির শেষ আছে। কারণ জ্ঞানের মাধ্যমে মোক্ষলাভই তাহার লক্ষ্য। জ্ঞানোত্তরা ভক্তি মোক্ষকে তুচ্ছ মনে করে।

শঙ্করাচার্য কৃত দক্ষিণামূর্ত্তি স্তোত্র বিশ্লেষণ

এই শ্লোকগুলিতে গুরুর স্বরূপ এবং কৃত্য ব্যাখ্যা করিয়া গুরুকে আত্ম-নমস্কার নিবেদন করা হইতেছে। এই বিষয় বিশেষভাবে বুঝিতে হইলে গুরু ও শিষ্যরূপী জীব এবং বিশ্বের স্বরূপ আলোচনা আবশ্যক। সাধারণ জীব বিশ্বকে সর্বপ্রকারে নিজ হইতে পৃথক দেখিয়া থাকে, এবং নিজ হইতে সর্বপ্রকারে ভিন্ন বলিয়া জানে। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে এই বিশ্ব প্রত্যেক জীবাত্মারই অন্তরে ভাসমান হইয়াও বাহ্যরূপে অনুভূত হয়। ইহার কারণ অবিদ্যার প্রভাব। বাস্তবিক পক্ষে বিশ্ব জীবের বাহিরে নহে। জীব যখন শ্রীগুরুর কৃপায় প্রবুদ্ধ হইতে পারিবে তখন সে বুঝিতে পারিবে বিশ্ব বস্তুতঃ তাহার বাহিরে নহে। দর্পণে যেমন নিজের মুখকেই দেখা যায় এইপ্রকার অবিদ্যা বা অজ্ঞানবশতঃ এই বিশ্ব প্রত্যেক আত্মার নিজ স্বরূপে বিদ্যমান হইলেও আত্মাই বিশ্বকে বাহিরে দেখিয়া থাকে। ইহার মূল কারণ অজ্ঞানের প্রভাব। অজ্ঞান কাটিয়া গেলে তখন আর বিশ্বকে বাহিরে দেখিতে পায় না। তখন দেখিতে পায় যে বাহিরে কিছুই নাই। সব কিছু আত্মার মধ্যেই আছে এবং তাহার মধ্যে প্রকাশ হইতেছে। মায়ার প্রভাবে মনে হয় যে ইহা বাহিরে আছে। কিন্তু সাক্ষীভাব পরিগ্রহপূর্বক নিজের স্বরূপের দিকে নিরীক্ষণ করিলে ইহার সত্যতা নির্ণয় করিতে পারিবে। জীব নিজে নিজে সাধারণতঃ এই অবস্থায় উপনীত হইতে পারে না। জীব অনাদিকাল হইতে সুষুপ্ত হইয়া রহিয়াছে। যখন এই অনাদি কালের সুষুপ্তি ভঙ্গ হইবে এবং সে প্রবুদ্ধ হইবে তখন সাক্ষী অবস্থা প্রাপ্ত হইবে। ইহাই জাগরণ। জাগিবার সময় সে নিজেই আশ্চর্য হইয়া নিজেকে দেখিতে থাকে। এই জাগরণ যিনি সম্পন্ন করিয়া দেন তাঁহাকেই গুরু বলা হয়। যখন গুরু কর্তৃক আত্মজাগরণসম্পন্ন হয় তখন দেখিতে পাওয়া যায় যে অদ্বৈত আত্মস্বরূপ বিশ্বরূপে ভাসিতেছে।

যাঁহার কৃপায় এই বিচিত্র লীলা সংঘটিত হয় তাঁহাকেই গুরু বলা হয়। তাঁহাকে নমস্কার।

এই যে বিরাট সৃষ্টি এবং ইহার ভিতরে অনন্ত বিচিত্রতা রহিয়াছে, জীবগত ও পদার্থগত অনন্ত ভেদ রহিয়াছে, ইহা সৃষ্টির পূর্বেও ছিল, সৃষ্টির পরেও রহিয়াছে। সৃষ্টির পূর্বে আত্মা অথবা ব্রহ্মের মধ্যে জগতের প্রত্যেকটি বস্তু বিদ্যমান ছিল তখন মায়ার প্রভাবে আত্মস্বরূপ বা ব্রহ্মস্বরূপ হইতে এই বিচিত্র জগৎ নির্গত হয় নাই। এই জগতে আত্মার স্বরূপ এক হইয়া বিদ্যমান ছিল, পরে মায়ার প্রভাবে সেই নির্বিকল্প সত্তাকে সবিকল্পরূপে সৃষ্টিরূপে প্রকাশ করা হইয়াছে। সৃষ্টির পূর্বে সকল বস্তুই ছিল, সৃষ্টির পরেও আছে। সৃষ্টির পূর্বে নির্বিকল্প রূপে ছিল কিন্তু সৃষ্টির পরে নানাপ্রকার বিকল্প লইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। মায়া দেশ এবং কালের সৃষ্টি করিয়া থাকে। বাস্তবিক পক্ষে অতীত, অনাগত ও বর্তমান বলিয়া কিছু নাই এবং দূর ও নিকট বলিয়াও কিছুই নাই। নির্বিকল্প অবস্থায় দেশ ও কালের ক্রিয়া হয় না। কালগত তারতম্য—যেমন বর্তমান, অতীত, ভবিষ্যৎ, ইহা নির্বিকল্প অবস্থায় থাকে না। দেশগত তারতম্য—ইহা অতি নিকটে এবং বহুদূরে—এইরূপ থাকে না। সৃষ্টির সঙ্গে মায়ার প্রভাবে দেশগত, কালগত বৈচিত্র্য হয়। যখন গুরুকৃপায় মায়া তিরোহিত হয়, তখন সবই নিত্য বর্তমান এবং নিত্যসন্নিহিতবৎ এইরূপে প্রকাশ হয়। এইজন্য যিনি মহাজ্ঞান লাভ করিয়াছেন তাঁহার নিকট কোনও বস্তুই দূর নহে—ইচ্ছামাত্র সবই সম্মুখে উপস্থিত থাকে। দেশকালের ব্যবধান মায়া হইতে উদ্ভূত হয়। এই মায়া নিবৃত্ত হয় শ্রীগুরুর কৃপাতে। এই যে গুরু ইঁহারই নাম সদ্‌গুরু।

শঙ্করাচার্য বলিয়াছেন—

প্রকৃত গুরুর ব্যাপার মহাযোগীর ন্যায়। মহাযোগী যেমন ইচ্ছামত সব জিনিষ ফুটাইয়া তুলিতে পারেন, সদ্‌গুরুও তাহাই ঠিক সেইরূপেই সব নিজের ভিতর হইতে সৃষ্টি করেন, অর্থাৎ ঈশ্বরভাব প্রাপ্ত না হইলে সদ্‌গুরুভাব প্রাপ্ত হওয়া যায় না। সদ্‌গুরু মহাযোগীর ন্যায়।

বেদ ও গুরু এই উভয়ের সম্বন্ধ জানা আবশ্যক। বেদ অনাদি, অনন্ত, নিত্য ও বর্তমান—এই বেদ হইতে যিনি পূর্ণ বাক্য উদ্ধার করেন তিনি সদ্‌গুরু। পূর্ণ গুরুবাক্য 'তত্ত্বমসি'। বেদবাক্য লোক-লোকান্তর, মুনিঋষির অতীত! কেহ যেন মনে না করে যে বেদ একটি পুস্তক। অখণ্ড

জ্ঞানরাশিই বেদ। এই বেদ সাধারণতঃ লোকের বোধগম্য নহে। গুরু ইহাকে মন্থন করিয়া জীবোদ্ধারের পথ নির্দেশ করেন। শ্রীদক্ষিণামূর্তিস্বরূপ শ্রীগুরুদেবকে স্মরণ করি।

গুরুর স্বরূপ কি প্রকার তাহা বলিতেছি। বহু ছিদ্রবিশিষ্ট ঘটের মধ্যে অবস্থিত বিরাট প্রদীপের প্রভাববশতঃ উজ্জ্বল ও ভাস্বর জ্ঞান যাহার চক্ষুরাদি করণবর্গকে আশ্রয় করিয়া বহির্গত হইয়া স্পন্দিত হয়, সেই স্পন্দনের নাম প্রকাশ বা জ্ঞান। এই যে আত্মস্বরূপের প্রকাশমান জ্ঞান ইহাই আদিজ্ঞান বা প্রকাশ। ইহার অনুকরণে অর্থাৎ এই প্রকাশে প্রকাশমান হইয়া সমগ্র বিশ্ব প্রকাশমান হয়। ইহার দ্বারা বোঝা গেল গুরুর স্বরূপ যাঁহাকে দক্ষিণামূর্তি নাম দেওয়া হইয়াছে, জ্ঞানস্বরূপ এবং ইহা আত্মার স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম। জ্ঞান-রূপে 'আমি জানি' এই আকার অবলম্বন করিয়া ইহা স্পন্দিত হয়। এই জ্ঞান বা প্রকাশ অনুকরণে সমগ্র বিশ্ব প্রকাশিত হয়। জ্ঞানরূপী দক্ষিণামূর্তি গুরুতত্ত্বের ইহাই মহিমা।

দেহ-প্রাণ-ইন্দ্রিয়বর্গ-বুদ্ধি প্রভৃতি শূন্যরূপে বর্ণিত হওয়ার যোগ্য। স্ত্রী বালক বা মূর্খ-অন্ধ-জড়-সদৃশ ভ্রান্তিবশতঃ অহং অহং বলিয়া থাকে—এইটি মহামায়ার মোহ। মায়াশক্তির বিলাসের দ্বারা কল্পিত হয় যে মহামোহ, তাহাকে পালন করিতে সমর্থ একমাত্র শ্রীগুরুমূর্তি যাঁহাকে দক্ষিণামূর্তি বলিয়া বর্ণনা করা হয়। এই শ্লোকে বলা হইয়াছে যে গুরু নিজে জ্ঞানশক্তির দ্বারা মহামোহকে নাশ করিয়া থাকেন—এই মহামোহ মায়াশক্তির খেলা হইতে উদ্ভূত তাহাতে সন্দেহ নাই। সুতরাং তাৎপর্য এই—একমাত্র সেই গুরুই মায়াশক্তি-প্রসূত মহামোহকে নাশ করিতে পারেন।

রাহু গ্রহণকালে সূর্যকে এবং চন্দ্রমাকে গ্রাস করিয়া থাকে, মায়া সেই-প্রকার জীবকে আচ্ছন্ন করিয়া থাকে। পুরুষ সত্তামাত্র এবং করণবর্গের উপসংহারবশতঃ সুষুপ্ত থাকে। তারপর—পূর্বে এতক্ষণ আমি সুপ্ত ছিলাম —এই ভাব লইয়া জাগিয়া উঠে। ইহা গুরুরূপী জ্ঞানশক্তির প্রভার প্রভাবে ঘটিয়া থাকে। ইহা জাগ্রত কালে ঘটিয়া থাকে। এই জাগরণের মূল কারণ গুরুরূপী দক্ষিণামূর্তির প্রভাব।

বাল্য, যৌবন ও বার্ধক্য প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন অবস্থাতে, জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তি প্রভৃতি বিভিন্ন স্থিতিতে অর্থাৎ এই সকল পরস্পর ভিন্ন বা ব্যাবৃত্ত অবস্থা সকলের মধ্যে যাহা অভিন্নরূপে অনুবৃত্ত থাকে তাহাই অহংভাব। এই অহংভাব বালক, যুবক, বৃদ্ধ সকলের ভিতর স্ফুরিত হইতেছে। জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তি সকল অবস্থাতেই ইহা স্ফুরিত হইতেছে। যিনি গুরুরূপী দক্ষিণা-

মূর্তিস্বরূপ তিনি ভক্তসকলের মধ্যে শুদ্ধ মুদ্রার দ্বারা নিজের স্বরূপ প্রকাশ করিয়া থাকেন। এইপ্রকার গুরুমূর্তিকে নমস্কার। অর্থাৎ দেহের বিভিন্ন অবস্থা এবং স্থিতিতে, জাগ্রৎ-স্বপ্নাদির বিভিন্ন অবস্থায় সর্বত্রই পরস্পর ভেদের মধ্যে অর্থাৎ বিভিন্ন পরিস্থিতির মধ্যে অহংরূপে অভিন্ন প্রকাশ যিনি ব্যবস্থিত করিয়া থাকেন, তিনি গুরুমূর্তি, দক্ষিণামূর্তি তাঁহাকে নমস্কার। ইহার তাৎপর্য এই যে নানাপ্রকার ভেদের মধ্যে অহংরূপে অভিন্ন জ্ঞান গুরু-কৃপাতে সম্ভব। যে বালক সে-ও অহং অনুভব করে, যে বৃদ্ধ সে-ও করে—বালক ও বৃদ্ধের অবস্থা ভিন্ন হইলেও অহংবোধ একই! এই এক অহং-প্রকৃতির উদয়ের মূল কারণ গুরুকৃপা সেই দক্ষিণামূর্তিকে নমস্কার।

এই সমগ্র বিশ্ব কার্য-কারণ ভাবের মধ্য দিয়া দর্শন করা হয়। অর্থাৎ ইহার অন্তর্গত কোন বস্তু কার্যরূপে, কোন বস্তু কারণরূপে দর্শন করা হয়। তেমনি কেহ স্বরূপে এবং কেহ অধিষ্ঠাতা স্বামীরূপে—ঠিক সেইরূপ কেহ শিষ্যরূপে, কেহ আচার্যরূপে, কেহ পিতারূপে, কেহ পুত্র-কন্যারূপে ভিন্ন ভিন্ন ভাব লইয়া প্রকাশিত হয়। স্বপ্ন অবস্থাতে হউক বা জাগরিত অবস্থাতে হউক পুরুষ মায়ার দ্বারা ঘূর্ণিত হইয়া থাকেন। মায়ার দ্বারা পুরুষকে স্বপ্নাবস্থাতে কিম্বা জাগরিত অবস্থাতে যিনি নিরন্তর ঘুরাইতেছেন তিনি গুরুমূর্তি, দক্ষিণামূর্তি, তাঁহাকে নমস্কার। ইহার দ্বারা বলা হইল যে সমগ্র বিশ্বকে মায়ার অধীন স্বরূপে যিনি নিরন্তর ঘুরাইতেছেন তিনি গুরু-মূর্তি, দক্ষিণামূর্তি অর্থাৎ সমগ্র বিশ্ব এই গুরুমূর্তি বিভিন্ন অবস্থাতে আকর্ষণ করিয়া চক্রাকারে ঘুরাইতেছেন। যিনি এই প্রকার স্বভাববিশিষ্ট তিনি গুরুমূর্তি, দক্ষিণামূর্তি—তাঁহাকে নমস্কার।

যিনি গুরুমূর্তি দক্ষিণামূর্তি তিনিই শিবরূপী—তাঁহার অষ্টমূর্তি সর্বত্র প্রসিদ্ধ। এই অষ্টমূর্তি কি কি? পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, চন্দ্র, সূর্য ও যজমান অর্থাৎ জীবাত্মা এই অষ্টমূর্তি যাঁহার তিনিই শিব অর্থাৎ জগদ্গুরু। অষ্টমূর্তির মধ্যে পঞ্চভূত আছে। তাহার পর চন্দ্র-সূর্য অর্থাৎ কাল আছে। অষ্টম মূর্তি জীব। এই অষ্টমূর্তি শিবের এবং সেই শিবই জগদ্গুরু। যে চিন্তাশীল সাধক, সে চিন্তা করিয়া দেখিতে পায় যে এতদ্ভিন্ন অন্য কিছু বিদ্যমান নাই—সমগ্র বিশ্ব ইহারই অন্তর্গত—পঞ্চভূত, কাল অর্থাৎ চন্দ্র-সূর্য, জীবাত্মা—এই সবই পরমাত্মা দক্ষিণামূর্তির গুরুর স্বরূপ জানিবে।

এই দক্ষিণামূর্তি স্তোত্র হইতে সর্বাত্মক ভাব পরিস্ফুট ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে সেইজন্য এই স্তোত্র শ্রবণ করিলে ইহার অর্থ মনন করিলে, ধ্যান এবং

কীর্তন করিলে তাহার প্রভাবে ঈশ্বরত্ব উদয় হয়—যাহার সঙ্গে সর্বাত্মক ভাবরূপী মহাবিভূতি জড়িত থাকে। এই যে ঈশ্বরত্ব বা মহাবিভূতি ইহার স্বরূপ এক হইলেও অষ্টধা বিভক্ত হইয়া অষ্টসিদ্ধি নামে পরিচিত হয়। বস্তুতঃ ইহা অব্যাহত ঐশ্বর্যস্বরূপ। সর্বাত্মক ভাবের উদয় হইলে খণ্ড খণ্ড বিভূতির কোন মূল্য থাকে না।

বটবৃক্ষের সমীপে ভূমিভাগে উপবিষ্ট দক্ষিণামূর্তি দেবতা বিরাজমান রহিয়াছেন। ইনি সকল মুনিগণকে জ্ঞানদান করিয়া থাকেন। ইনি ত্রিভুবনের একমাত্র গুরু এবং ঈশ্বরস্বরূপ। ইঁহার কৃপাতে জন্ম-মৃত্যুজনিত দুঃখ-কষ্ট নষ্ট হয়; ইনি ত্রিভুবনের গুরু। ইঁহাকে নমস্কার।

এক আশ্চর্য দৃশ্য দেখিতে পাইলাম। দেখিলাম যে বটবৃক্ষের মূলপ্রদেশে (সংসারে) অসংখ্য বৃদ্ধ শিষ্য রহিয়াছেন এবং সঙ্গে তাঁহাদের গুরুও রহিয়াছেন। তিনি কিন্তু নিত্য যুবক। শিষ্যগণ কালের অধীন, তাই তাঁহাদিগকে বৃদ্ধ বলিয়াছেন। গুরুর উপরে কালের প্রভাব নাই, তাই তিনি নিত্য যুবক। আশ্চর্য বিষয় দেখিলাম, গুরু শিষ্যকে উপদেশ দান করিতেছেন মৌন মুদ্রার দ্বারা, কোনও কথা উচ্চারণ না করিয়া। সেই উপদেশ প্রাপ্ত হওয়া মাত্র সমগ্র সংশয় ছিন্ন হইয়া যায়। সুতরাং গুরুর মৌন ব্যাখ্যা শক্তিপাত ভিন্ন আর কিছু নহে।

দক্ষিণামূর্তিকে নমস্কার করিতেছি। এই দক্ষিণামূর্তি প্রণবের মুখ্য অর্থ অর্থাৎ ওঁকার বা প্রণবের প্রকৃত বাচ্য। তাই প্রণবরূপে ইঁহাকে বোঝা যায়। ইনি শুদ্ধ-জ্ঞানরূপ দেহসম্পন্ন, মলহীন, প্রশান্ত।

যিনি সর্ববিদ্যার আধার, যিনি সংসার রোগের চিকিৎসক, যিনি সর্বলোকের গুরু দক্ষিণামূর্তি তাঁহাকে নমস্কার।

আমি যে দক্ষিণামূর্তি গুরুকে নমস্কার করিতেছি তাঁহার স্বরূপ কি প্রকার? তিনি পরব্রহ্ম তত্ত্বকে শুধু মৌনাবলম্বন করিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। তিনি নিজে নিত্য যুবক, কিন্তু তাঁহার শিষ্যগণ সকলেই ব্রহ্মনিষ্ঠ ঋষি এবং বৃদ্ধ শরীর। দক্ষিণামূর্তি আচার্যসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ—তিনি নিজের হস্তে চিন্ময় মুদ্রা ধারণ করিয়াছেন, তিনি আনন্দস্বরূপ। তিনি স্বাত্মারাম এবং তাঁহার বদন নিত্য মুদিত। এইপ্রকার দক্ষিণামূর্তি নামক যে জগদ্‌গুরু, তাঁহাকে প্রণাম করিতেছি।

অধ্যাত্ম সাধনায় জপ ও ধ্যানের স্থান

অধ্যাত্ম সাধনার মধ্যে জপ ও ধ্যান দুটি প্রধান। জপ-রহস্য বুঝিবার পূর্বে শব্দতত্ত্ব অথবা বাক্‌তত্ত্ব জানা আবশ্যক। শব্দ অথবা বাক্ চারিপ্রকার। পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা ও বৈখরী। পরাবাক্ শব্দব্রহ্মের স্বরূপ, পরম শিবের সঙ্গে অভিন্ন। উহার বাহ্য স্ফূর্তি তিন প্রকার। প্রথম পশ্যন্তী রূপে, দ্বিতীয় মধ্যমা, তৃতীয় বৈখরীরূপে। সমগ্র বিশ্ব বিশ্লেষণ করিলে যোগ-দৃষ্টিতে তিনটি বিভাগ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা যোগীদিগের সুপরিচিত। একটি শব্দ ও আর একটি অর্থ, আর তৃতীয়টি জ্ঞান। অর্থ মানে পদার্থ। শব্দ উহার বাচক, অর্থ শব্দের বাচ্য তাই তাহাদের বাচ্য-বাচক সম্বন্ধ। তেমনি জ্ঞান ও অর্থের সম্বন্ধ আছে। অর্থ বিষয় ও জ্ঞান বিষয়ী, তাই তাহাদের বিষয়-বিষয়ী সম্বন্ধ। এই কারণে শব্দ-অর্থ-জ্ঞান এই তিনেরই পরস্পর সম্বন্ধ আছে। শব্দের সহিত অর্থের বাচ্য ও বাচক সম্বন্ধ। জ্ঞানের সহিত অর্থের বোধ্য ও বোধক সম্বন্ধ। বৈখরী অবস্থায় শব্দ ও অর্থ পরস্পর ভিন্ন। শব্দ বাচক, অর্থ বাচ্য বস্তু, উভয়ের ভেদ আছে। মধ্যমা অবস্থায় শব্দ ও অর্থের উভয়ের ভেদাভেদ সম্বন্ধ—পশ্যন্তী অবস্থায় উভয়ের অভেদ সম্বন্ধ—শব্দ ও অর্থ একই বস্তু—পশ্যন্তী অবস্থায় তিনেরই পূর্ণ স্বরূপ প্রকাশমান। পশ্যন্তী অবস্থা পর্যন্ত জীব উঠিতে পারিলে তাহার জীবন কৃতার্থ হইয়া যায়। সদ্‌গুরু যখন শিষ্যকে কৃপা করেন তখন পশ্যন্তী অবস্থা হইতে দিব্য চৈতন্য আহরণ করিয়া কল্পনা রাজ্যের মধ্য দিয়া বাহ্য বায়ুমণ্ডলে বৈখরী শব্দযোগে নাম অথবা মন্ত্রবীজ শিষ্যকে প্রদান করেন। তিনি যে বস্তুটি প্রদান করেন সেটি বিশুদ্ধ চৈতন্যাত্মক—কিন্তু স্থূল শব্দের আবরণে ঢাকিয়া নিজ শিষ্যকে গোপনে উহা প্রদান করেন। শিষ্য ঐ শব্দটিকে দেবতারূপে গ্রহণ করিয়া থাকে। সে গুরুর নিকট হইতে যাহা পাইয়াছে তাহা একটি সাধারণ স্থূল শব্দমাত্র। গুরুর আদেশে ঐ শব্দ অবলম্বন করিয়া সাধক চলিতে থাকে। সাধনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঐ স্থূল বাহ্য আবরণটি ভাঙ্গিয়া ফেলা। ঐ আবরণটি ভাঙ্গিতে হইলে ধ্যান ও জপ আবশ্যক। জপ-ক্রিয়ার প্রভাবে ঐ বাহ্য আবরণটি কাটিয়া যায়। তখন ভিতরের সারবস্তু প্রকাশ হয়। ইহা জ্যোতিঃস্বরূপ। তখন চিত্ত জ্যোতির্ময় হইয়া যায়। এই যে নিরন্তর জপ ইহার আঘাতে গুরুদত্ত মন্ত্রের বাহ্য পর্দাটি ছিন্ন হইয়া যায়। তখন ভিতরের দিব্য জ্যোতি

ইষ্ট-দেবতার আভাসরূপে প্রকাশ হয়, হৃদয় আলোকিত হইয়া যায়। ইহার নাম চিত্তশুদ্ধি। এই সময় নাদের উদয় হয়। এই নাদের ফলে চিত্তের বহির্মুখ গতি রুদ্ধ হয়, অন্তর্মুখ গতি খুলিয়া যায়। শ্বাসের ক্রিয়া শান্ত হয় এবং স্নিগ্ধ জ্যোতি স্বাভাবিক বেগে অন্তর্মুখ হইয়া ঊর্ধ্বদিকে আরোহণ করে। তখন ভৌতিক জগতের অনুভব থাকে না। অশুদ্ধ মনের সংস্কারের খেলাও থাকে না। ঐ জ্যোতি ক্রমশঃ নির্মল হইয়া সমস্ত অন্তর প্রকাশিত করে। ঠিক ঊষাকলের মত রাত্রের অন্ধতামস কাটিয়া যায়। অন্ধকারের পরপারে ইষ্টদেবতার সাক্ষাৎকার হয়। ইহা পশ্যন্তী অবস্থার কথা। গুরু মন্ত্ররূপে যে শব্দ কৃপাপূর্বক শিষ্যকে অর্পণ করেন ইহাই তাহার প্রকৃত স্বরূপ। এই অবস্থা প্রাপ্তি হইল আত্মসাক্ষাৎকারের পূর্বাভাস।

বৈদিক সাহিত্যে যাহাকে শব্দব্রহ্ম বলে, তন্ত্র সাহিত্যে তাহাকে পরাবাক্ বলে। শব্দব্রহ্মের গর্ভে বিশ্ব অব্যক্ত ভাবে বিদ্যমান থাকে। সৃষ্টির সময় পরাবাক্ হইতেই বহির্মুখী গতি আরম্ভ হয়। এই পরাবাক্ ভগবানের স্বাতন্ত্র্য শক্তিস্বরূপ। ইহারই নাম চিৎশক্তি। ভগবান একাধারে শিব ও শক্তি উভয়ই। শিবরূপে তিনি শান্ত, নিস্পন্দ অক্ষয় ও অব্যয়—শক্তিরূপে সমস্ত কর্মের বিভাগ করেন। এই শিবের সঙ্গে শক্তির সহযোগবশতঃই আত্মা নিজেকে পূর্ণ অহং রূপে গ্রহণ করে। এই পূর্ণ অহংভাব পরমাত্মার পরম স্বরূপ। এইখানে আবরণ নাই, জীব ও জগৎ নাই। কিন্তু এই পূর্ণ অহং-এর সংকোচবশতঃ আবরণের সৃষ্টি হয়। এই আবরণ নিজের স্বরূপের আবরণ এবং এই আবরণের ঊর্দ্ধে অনাবৃত স্বরূপ সর্বদা থাকে। আবরণটি একটি লীলামাত্র। এই আবরণের সঙ্গে সঙ্গে দুটি ব্যাপার সংঘটিত হয়। একটি স্বরূপ-বিস্মৃতি, অপর অন্য একটিকে নিজ স্বরূপ বলিয়া তাহাকে আপন বলিয়া গ্রহণ করা। বেদান্তে ইহার নাম লয় ও বিক্ষেপ। লয় তমোগুণের ক্রিয়াতে হয়, বিক্ষেপ রজোগুণের ক্রিয়াতে হয়। আত্মস্বরূপে যখন আবরণ উদিত হয় তখন সর্বপ্রথম একটি মহাশূন্যের আবির্ভাব হয় ইহা একদিকে। অপরদিকে পরিচ্ছিন্ন প্রমাতার উদয়। ইহাকে বলে মায়া-প্রমাতা। ইহাই চিত্ত। ইহাকে বেদান্তে জীব বলে—তন্ত্রে ইহাকে পশু বলে। শুদ্ধ দ্রষ্টারূপী চিদাত্মক এই মায়িক প্রমাতাই জীবাত্মা। আর এই দ্রষ্টার সম্মুখে দৃশ্যরূপে মহাশূন্য ভাসিতে থাকে—এই মহাশূন্যকে পণ্ডিতরা আকাশ বলেন, সেখানে কেবল শূন্য—শূন্য আর শূন্য, কোনও দৃশ্য নাই। এই শূন্য জীবরূপী দ্রষ্টার দৃশ্যরূপে প্রকাশ হয়। উভয়ের মধ্যে যে সম্বন্ধ উহাই দৃষ্টিরূপে পরিচত হয়। এই যে দৃশ্য ইহাকে দ্রষ্টা এখনও আপন বলিয়া মনে করে না। ইহার পর সংবিৎ প্রাণরূপে আত্মপ্রকাশ করে। তখন ঐ মহাশূন্যে দ্রষ্টা পর পর চলনশীল অসংখ্য দৃশ্য

দেখিতে পায়। ঐ সবগুলি প্রত্যেকক্ষণে চলনশীল। ইহাই অনাদি অবিদ্যার বিক্ষেপ শক্তির ক্রিয়া। সংবিতের মধ্যে যখন প্রাণের আবির্ভাব হয় তখন ঐ দৃশ্য সকলের মধ্যে কোন একটিকে আপন বলিয়া গ্রহণ করে। তখন ঐ দৃশ্যটি দ্রষ্টার নিজের সহিত এক হইয়া যায়—ইহাই অভেদ জ্ঞান বা তাদাত্ম্য বোধ। এখন আর দ্রষ্টা শুদ্ধ দ্রষ্টা নহে। এখন দ্রষ্টা দেহাত্মবোধ সম্বন্ধ, কারণ এই দৃশ্য তাহার দেহ হইয়া যায়। কিন্তু ইহা স্থূল দেহ নহে—ইহা আত্মার প্রাক্তন কর্মজনিত সংস্কারের উত্থান। এই দেহটিকে লইয়া আত্মা স্থূল জগতে আসিবার জন্য মার্গ অন্বেষণ করে। ইহার পর কর্মশক্তির প্রভাবে যোগ্য পিতামাতার সংসর্গে মাতৃগর্ভে প্রবেশ করে। মাতৃগর্ভে মাতৃকা শক্তির দ্বারা তাহার দেহ রচিত হয়। তাহার পর দেহের পরিপুষ্টি ঘটে। পরে মাতৃগর্ভ হইতে কালের রাজ্যে প্রবেশ করে। মাতৃগর্ভে থাকা কালে মায়ের সত্তার দ্বারা সে নিজের সত্তা লাভ করে। মায়ের খাদ্যরূপে গৃহীত পঞ্চভূত হইতে রস-রক্তাদিক্রমে তাহার পুষ্টি জন্মে। দেহটি পরিপূর্ণরূপে রচিত হইলে বৈষ্ণবী মায়ারূপে গর্ভ হইতে দেহটি বাহিরে আসিয়া পড়ে। ইহার নাম প্রসব। এইপ্রকারে জীব কালরাজ্যে প্রবেশ করে। কালরাজ্য হইতে বাহির হইলে নিজের স্বরূপ-জ্ঞান আবশ্যক। যার জ্ঞান যে ভূমি পর্যন্ত পরিসমাপ্ত হয় তার গতিও ততটা। এইজন্য পূর্ণ অদ্বয়-স্বরূপে স্থিতিলাভ করিতে হইলে পূর্ণ স্বরূপ জানা আবশ্যক। প্রত্যেকেরই আত্মস্বরূপ সেই পূর্ণসত্তা বটে কিন্তু তাহাকে চিনিতে না পারিলে তাহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। প্রত্যেকের যেটি পূর্ণ আত্মস্বরূপ তাহার নাম পরমাত্মা। প্রত্যেকের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য যাই থাকুক, আত্মস্বরূপে ভেদ নাই। আত্মস্বরূপ চিনিতে হইলে বাহ্য আবরণ ভেদ করিয়া অন্তঃপ্রবিষ্ট হইয়া নিজ মূল স্বরূপ অন্বেষণ করিতে হইবে। শুধু দেব-দেবীর রূপ বলিলে আত্মস্বরূপ হয় না। শুধু জ্যোতি বলিলে আত্মস্বরূপ হয় না। প্রকাশ বলিলেও আত্মস্বরূপ হয় না। আত্মস্বরূপটি নিজের অহং। প্রত্যেকে মহামায়ার মায়াপঙ্কে ডুবিয়া নিজস্বরূপ ভুলিয়া গিয়াছে। মায়া হইতে উদ্ধার এবং মহামায়াকে অতিক্রম—ইহা প্রথমে আবশ্যক। ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতি রাজ্য হইতে বিবেকজ্ঞান দ্বারা চিদ্‌রূপ নিজেকে কৈবল্যে স্থাপিত করিতে পারে ইহা সত্য; কিন্তু ইহাতে তাহার প্রকৃত আত্মলাভ হয় না। এই অবস্থায় প্রাকৃত দেহ হইতে মুক্ত হওয়ার দরুণ কর্মসংস্কার কাটিয়া যায় —জন্ম-জন্মান্তর ভোগরূপ সংসার নিবৃত্ত হয়। অধোলোকে পুনর্বার জন্ম-গ্রহণ করার আবশ্যকতা থাকে না। ইহা দুঃখ-নিবৃত্তির সোপান কিন্তু ইহা পূর্ণত্ব নহে। শুধু জেলখানা হইতে মুক্ত হইলে রাজগদী লাভ হয় না, তাহার রাজকীয় শক্তি-সামর্থ্য চাই। কৈবল্যপ্রাপ্ত মুক্ত পুরুষের তাহা থাকে না। সুতরাং বুঝিতে হইবে, যে-জ্ঞানের ফলে কৈবল্যলাভ তাহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ

জ্ঞান আবশ্যক। আত্মার পরমস্বরূপ পরমেশ্বরের সহিত অভিন্ন, সেই স্বরূপ শুদ্ধ দুঃখ নিবৃত্ত হইলেই প্রাপ্ত হয় না। তাহার জন্য আবশ্যক দিব্যজ্ঞান —ইহা সাংখ্য-যোগীর বিবেকজ্ঞান নহে। ইহার নাম শুদ্ধবিদ্যা। ইহা একমাত্র শ্রীভগবানের নিকট হইতে পাওয়া যায়,—অবশ্য সদ্‌গুরুর কৃপায়। শ্রীভগবান্ যখন জীবের অনাদি সংসারের হেতুস্বরূপ মল পরিপক্ব হইয়াছে দেখিতে পান, তখন মহা করুণায় আবিষ্ট হইয়া জীবকে করুণা দান করেন—ইহার নাম শুদ্ধবিদ্যা। এই জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়ার পর ক্রমশঃ উচ্চ উচ্চ অধিকার প্রাপ্তি ঘটে, মহামায়া-রাজ্যে প্রবেশ হয় এবং অধিকারী পুরুষের ন্যায় (জগতের) মায়িক জগতের সেবা-কার্যের প্রতি লক্ষ্য করিতে হয়। ক্রমশঃ ক্রমশঃ অধিকারবাসনা নিবৃত্ত হইলে উদ্ধর্বগতির ফলে এই মহাজ্ঞানের পূর্ণ বিকাশ হয়। তখন কালের রাজ্য শেষ হইয়া যায়। মায়া, যোগমায়া রাজ্য সব অস্তমিত হয়। অনন্ত বিশ্বের মূল কারণ শিবশক্তির সন্ধান পাওয়া যায়। যেখানে শিব ও শক্তি পৃথক সেখানে অপূর্ণ—এই অপূর্ণ স্থানে শিব পূর্ণস্বরূপ, চৈতন্য-স্বরূপ—অখন্ড চৈতন্যস্বরূপ এবং শক্তি তদ্রূপ নহে কিন্তু অনন্ত ঐশ্বর্যের একমাত্র আধার। ইহা তত্ত্বরূপী শিবশক্তি কিন্তু যে পূর্ণত্বের যাত্রী সে শিব-শক্তিতে বিশ্রাম করে না—তাহার নিকট শিব ও শক্তি অভিন্ন হইয়া যায়, তখন শিব শক্তিময় ও শক্তি শিবময় হয়। ইহাই নিষ্কল অবস্থা। ইহা পরম সংবিৎ—ইহার নাম পরব্রহ্ম। এ স্থানে সাধক নিজে যাইতে পারে না। মহা-মায়ার সকল তত্ত্বে উন্মনী শক্তির অনুগ্রহ ব্যতীত এই পরমপদে পেঁছান যায় না। সাধক সমগ্র বিশ্ব ভেদ করে বটে কিন্তু পূর্ণত্ব লাভ হয় না। সন্ধ্যা-বেলায় পারঘাটে অবস্থিত পথিকের ন্যায় তাহাকে পারের নৌকার জন্য অপেক্ষা করিতে হয়। ইহার নাম উন্মনী শক্তির উদয়! পরম শিব হইতে উন্মনী শক্তির উদয় হয়। ঐ শক্তি তাহাকে পরমপদে লইয়া যায়, পূর্ণত্ব দেয়। তখন জীবও নহে, শিব, শুদ্ধ শিবও নহে, পরম শিব। প্রতি জীবের পূর্ণত্ব লাভের অধিকার আছে, কিন্তু সকলেরই প্রাপ্তি হয় না। তবে পথের পরিচয় সকলেরই থাকা উচিত।

(প্রণাম—ভগবানের চরণ আর নিজের মস্তককে এক করা। সব সময় ইহা মনে রাখা।)

দীক্ষার আবশ্যকতা

সাংখ্যের জ্ঞান, বেদান্তের জ্ঞানে দীক্ষার আবশ্যকতা নাই কিন্তু পরমেশ্বর হইতে জ্ঞান প্রাপ্ত করিতে দীক্ষা ভিন্ন আর পথ নাই।

যে জ্ঞান পরম শিবে নিত্য বিরাজমান, তাহার কণা শিষ্য প্রাপ্ত করে; সেই কণাকে অবলম্বন করিয়া মহাজ্ঞানে উপনীত হইতে পারে। ইহারই নাম দিব্য-জ্ঞান, ইহার মূল পরমেশ্বর স্বয়ং। সদ্‌গুরুরূপে দীক্ষার দ্বারা ইহাই তিনি সঞ্চার করেন। জীবের যতক্ষণ দেহাত্মবোধ রহিয়াছে ততক্ষণ এই জ্ঞান সাক্ষাৎ-ভাবে পরমেশ্বর হইতে আসে না। মানুষ অথবা সিদ্ধপুরুষ অথবা দেবতা, কাহারও মাধ্যমে ইহা প্রকাশিত। ইহা গুরুপদবাচ্য। দিব্য গুরু, তাহার নীচে সিদ্ধগুরু, তাহার নীচে মানুষ গুরু। গুরু ভিন্ন ভিন্ন হইলেও গুরুশক্তি একই। সাধারণ যোগ্য শিষ্য মানবীয় গুরু হইতে জ্ঞানপ্রাপ্ত হইতে পারে। যাবার অধিকার সম্পদ্ আছে, সে সিদ্ধগুরু লাভ করিতে পারে। যাহার অধিকার উচ্চ সে দিব্যগুরু লাভ করে। মনে রাখিতে হইবে গুরু আলাদা হইলেও জ্ঞান এক। সাধারণ মনুষ্য দিব্যগুরু লাভ করিতে পারে না। কি প্রকারে জ্ঞান পাইবে? কেহ যদি যোগ্য হয় সে পারে। মৎস্যেন্দ্রনাথ, গোরখনাথের গুরু, সাক্ষাৎ ভগবতী হইতে জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শঙ্করা-চার্যের পরমগুরু গৌড়পাদ শুকদেব হইতে জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন। তিনি সিদ্ধগুরু। এইরূপ সর্বত্র বুঝিতে হইবে। এইটি জানা আবশ্যক, সমস্ত জ্ঞানই শ্রীভগবানের চরণ হইতে বহির্গত হয়। যদি তাহাই হয় তবে গুরুর প্রয়োজন কি? গুরুবর্গ জ্ঞানের বাহক। সাক্ষাৎ ভগবান্ হইতে যাহারা জ্ঞানলাভ করিতে পারে না তাহাদের জন্য গুরু অত্যন্ত আবশ্যক—সিদ্ধ যোগী-দের প্রয়োজন হয় না। ভগবানই জ্ঞানের আধার। মানুষের যতক্ষণ দেহাত্ম জ্ঞান থাকে, সাক্ষাৎভাবে জ্ঞানলাভ হইতে পারে না। ভগবৎ ইচ্ছাতেই আসে পরম্পরাক্রম। রূপ ধরিয়া সাক্ষাৎভাবেও জ্ঞান আসিলে, দেহাভিমান থাকিলে তার আধারের যোগ্যতানুসারে ক্রিয়াশক্তির প্রকাশ হয়। ইহার প্রকারের নাম দীক্ষারহস্য। দেহাভিমান থাকিলে দীক্ষা দরকার। আর একটি রহস্য জানিতে হইবে। ভগবানের শক্তিপাত যদি অত্যন্ত তীব্র হয় তাহা হইলে শক্তিসঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে শিবত্ব লাভ করে—কোন সাধন করিতে হয় না। যদি ভগবানের শক্তিপাত কিঞ্চিৎ নূ্যন হয় তাহা হইলে সাধকের প্রাতিভ জ্ঞানের উদয় হয়, অর্থাৎ বাহ্যগুরু দরকার হয় না, ভিতর হইতে জ্ঞান হয়। ইহা অনৌপদেশিক জ্ঞান, ইহার নাম প্রাতিভ। ভগবানের শক্তিপাত আরও যদি মৃদু হয় তাহা

হইলে অন্তর্জগতে চিন্ময় গুরুর দর্শন হয়। চিন্ময় স্বরূপ হওয়ার জন্য শিষ্য জ্ঞানপ্রাপ্ত করে। ইহা নীচের অবস্থা। যখন শক্তিপাত আরও কম হয়, তখন বাহিরের গুরুর আবশ্যক হয়। শুধু গুরুর উপদেশ হইতে জ্ঞান সঞ্চারিত হইলেও শিষ্যকে সাধন করিতে হয়।

এইরূপ অনন্ত প্রকার ভেদ আছে। আর একটা কথা মনে রাখিতে হইবে। গুরু জ্ঞান দিয়া পৌরুষ অজ্ঞানটি নিবৃত্ত করেন কিন্তু বৌদ্ধ অজ্ঞানটি দেহাত্ম-বোধের, তাহা গুরু নাশ করিতে পারেন না। সাধনার দ্বারা নাশ করিতে হয়। দেহাত্মবোধ থাকিলে সাধনার প্রয়োজন হয়। পৌরুষ-অজ্ঞান নিবৃত্ত হইলে গুরুকৃপার ফলে জ্ঞান হয়। কিন্তু দেহাত্মবোধ থাকার জন্য প্রাপ্ত জ্ঞানের উপলব্ধির জন্য (বুদ্ধিস্থিত) সাধনার আবশ্যক হয়।

প্রশ্নঃ চৈতন্য ও প্রাণের সম্বন্ধ কি?

উত্তরঃ চৈতন্য, সংবিৎ, প্রাণ, প্রকৃতির সম্বন্ধে তুমি যে প্রশ্ন করিয়াছ তাহার উত্তর ক্রমশঃ দিতেছি। সংবিৎ চিচ্ছক্তির নামান্তর। চিৎরূপ শক্তি এবং চৈতন্য এক বস্তু নহে। কারণ চিৎ থাকিলেও চৈতন্য না থাকিতে পারে—কারণ যাহাকে আমরা জড় পদার্থ বলি তাহাতে চৈতন্য নাই। কিন্তু চিৎ তাহাতেও আছে। সমগ্র বিশ্বের মধ্যে এমন কোন স্থান হইতে পারে না যেখানে চিৎ নাই। জড়পদার্থ চৈতন্যপদার্থে পার্থক্য—উভয়ে চিৎ সমরূপে বিদ্যমান থাকিলেও চৈতন্যপদার্থে চিৎ প্রতিফলিত হয়—জড়পদার্থে প্রতিফলিত হয় না। সুতরাং চিৎ থাকিলে যে চৈতন্য থাকিবে এমন কোনও কথা নাই। চিৎ-এর প্রতিফলন আবশ্যক। সূর্যের কিরণ সর্বত্র সমভাবে প্রতীত হয় কিন্তু স্বচ্ছ জলরাশিতে কিংবা স্বচ্ছ আধারে তেজরূপে প্রতিফলিত হয়, উইঢিপি বা বল্মীকে তাহা হয় না। চিচ্ছক্তি থাকা চাই, উহা প্রতিফলিত হওয়া চাই। সংবিৎ চিচ্ছক্তির নামান্তর কিন্তু যতক্ষণ সংবিৎ সংবিৎ রূপে থাকে ততক্ষণ সৃষ্টির বিকাশ সম্ভব নহে। তান্ত্রিক সিদ্ধান্তানুসারে অহং বলিতে যাহা বুঝায় তাহার একপ্রান্তে 'অ', ইহা বিশুদ্ধ প্রকাশ বা চিচ্ছক্তি। কিন্তু যাহাকে 'হ' বলা হয় তাহা বিমর্শ কলা। প্রকাশ হইতে বিমর্শ পর্যন্ত সমগ্র মাতৃকা রাশি। অহংপদবাচ্য এই বিমর্শ হইতে ক্রমশঃ প্রাণের বিকাশ হয়। প্রাণের বিকাশ না হইলে জড়দেহে অহংবোধ অর্থাৎ দেহাত্মবোধ উদয় হইতে পারে না। তিনটি অবস্থা বিশেষ ভাবে চিন্তা করিবে—একটি অবস্থা পূর্ণ অহং, এই অবস্থায় বিশ্ব অহং-এর অন্তর্গত, তাই অহং পূর্ণ। কিন্তু যখন ভগবান্ স্বাতন্ত্র্যবলে নিজেকে সঙ্কুচিত করেন এবং এক কল্পিত আবরণের

উদ্ভাবনা করেন তখন সৃষ্টির অনন্তর আদি অবস্থায় যে স্থিতির উদয় হয় তাহা একটি ত্রিপুটী। একদিকে আছে পরিচ্ছিন্ন মায়া-প্রমাতা বা চিদ্‌অণু ইহাকে পশু বা জীব বলে। অপরদিকে বিশাল আবরণ। তখন ঐ অণুরূপী জীবই হয় দ্রষ্টা। আর ঐ বিশাল আবরণ বা মহাশূন্যই হয় দৃশ্য। উভয়ের সম্বন্ধ দৃষ্টিরূপ। ইহা ত্রিপুটী। এই অবস্থাতেও প্রাণের উদয় হয় নাই। ইহার পর যখন ঐ মহাশূন্যে পরাবাকের প্রেরণায় প্রতিক্ষণে অসংখ্য দৃশ্য চলিতে থাকে—একের পর এক, তখন ঐ চিদ্‌অণু দ্রষ্টা তাহা দেখিতে থাকে, ইহার পর কোন একটি বিশিষ্ট দৃশ্য দেখিয়া তাহাতে আকৃষ্ট হয় এবং উহাকে আলিঙ্গন করিতে চেষ্টা করে—আপন করিতে চেষ্টা করে। এই যে ব্যাপারটি ইহাই হইল প্রথম ক্ষণে প্রাণের প্রথম আবির্ভাব। ইহার পর প্রাণের ক্রমশঃ বিকাশ হয় তাহার বিবরণ এখানে অনাবশ্যক।

চৈতন্যের সহিত প্রাণের সম্বন্ধ আছে কিন্তু বিশুদ্ধ চিৎ-এর সহিত প্রাণের কোন সম্বন্ধ নাই। যেখানে বিশুদ্ধ চিৎ প্রকাশরূপী ক্রমশঃ বিমর্শের দিকে অভিমুখ হইয়া সৃষ্টিধারায় প্রবাহিত হয় সেখানেও চৈতন্য নাই তবে চৈতন্যের দিকে উন্মুখ হওয়ার প্রবাহের ধারাটি আছে।

প্রশ্ন : প্রাণ না থাকিলেও কি চৈতন্য থাকে ?

উত্তর : যাহাকে আমরা প্রাণ বলিয়া গ্রহণ করিতেছি তাহা সৃষ্টির সঞ্চারের পর কার্যশীল হয়। বলা বাহুল্য সৃষ্টির মূলে আকাশ। তাহার পর বায়ু। এই বায়ুই প্রাণরূপে প্রকাশ পায়। সৃষ্টির অতীত অবস্থায় ইহার কোনও সম্বন্ধ নাই কিন্তু স্বয়ংপ্রকাশ।

তাহার জন্য প্রাণের অথবা মনের কোনও অপেক্ষা নাই। শুদ্ধ চিৎ যদি সদ্রূপ বলিয়া মনে করে তবে তাহা অব্যক্ত। যখন সৎ চিদ্‌রূপে স্ফুরিত তখনই প্রকাশের সূচনা। এই প্রকাশ হইতেই প্রকাশান্তরের আবির্ভাবের ফলে ও তাহার সহিত যোগে আনন্দের অভিব্যক্তি হয়। এই আনন্দ হইতে ইচ্ছা প্রভৃতির মাধ্যমে সমস্ত বিশ্ব প্রকাশ পায়। ইচ্ছা প্রভৃতি বলিতে ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়া এই তিনটি বুঝিতে হইবে। এই পর্যন্ত সম্পন্ন হইলে অন্ত্যকলা রূপে 'হ' বিমর্শ শক্তির স্রোতের ধারা নিরোধ করিয়া দেন। এইটি পূর্ণ অহং +আপনাতে আপনি ক্রীড়াশীল। এই পূর্ণ অহং হইতে স্বাতন্ত্র্য বশে ইদং-এর সৃষ্টি হয়। ইহা একপ্রকার মহাকালের রাজ্য। অতীত অনাগত ভবিষ্যৎ কাল থাকে না। অথচ সমগ্র বিশ্ব ইদংরূপে প্রতিভাত হয়। এইখানে অহং

ইদংরূপে আবির্ভূত। অহং-এর পূর্ণ প্রকাশ এইখানে নাই। ইহার পর ব্রাহ্মী সৃষ্টি প্রভৃতি অনন্তরূপে প্রকাশিত হয়।

প্রাণায়াম

আসন ঠিক হইলে প্রাণায়াম হয়।

প্রাণায়াম—প্রাণকে নিয়ন্ত্রণ করা।

মনুষ্যের দেহে জীবিত অবস্থায় প্রাণশক্তি ও মনঃশক্তি নিরন্তর কার্য করিতে থাকে। এই উভয়শক্তির মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ আছে। সেইজন্য প্রাণ চঞ্চল হইলে মন চঞ্চল হয়—মন চঞ্চল হইলে প্রাণ চঞ্চল হয়, উভয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ আছে। সাধারণ যোগের প্রণালী সম্বন্ধে প্রথমে প্রাণকে নিয়ন্ত্রণ করিতে হয়। প্রাণকে নিয়ন্ত্রণ করাই প্রাণায়াম। প্রাণায়াম আরম্ভ করিবার পূর্বে আসন সিদ্ধ হওয়া আবশ্যক। আসন সিদ্ধ হইলে দীর্ঘকাল পর্যন্ত একাসনে বসিয়া থাকিলেও দেহের চাঞ্চল্য আসে না। প্রথমাবস্থায় যোগীর পক্ষে শুদ্ধ স্থিরাসনে বসা অভ্যাস করাই আবশ্যক। আসন স্থির হইয়া গেলে দীর্ঘকাল পর্যন্ত শরীরে কম্পন উঠে না। তখন শরীর এত হাল্কা হয় যে উহা আছে কি নাই তাহা মনে হয় না। দীর্ঘকাল আসন ঠিক ভাবে করিতে পারিলে বিনা চেষ্টায় প্রাণের ক্রিয়া ক্ষণিকের জন্য শান্ত হইয়া যায়। দেহে এরূপ অবস্থা উদয় হইলে গুরু বুঝিতে পারেন যে শিষ্য প্রাণায়ামের যোগ্য হইয়াছে। তখন চেষ্টাপূর্বক প্রাণায়ামের ক্রিয়া করিতে হয়। এইখানে একটি রহস্যের কথা বলিতেছি। মনুষ্যের নিজ সত্তায় সর্বাপেক্ষা বাহিরে আছে দেহ। দেহের অভ্যন্তরে সর্বপ্রথম প্রাণের ক্রিয়া—প্রাণের স্তরের পরে মনের ক্রিয়া জানিতে হইবে। আরো গভীরে প্রবেশ করিলে বুদ্ধির স্তরে প্রবেশ করা যায়। দেহের স্তরে থাকা কালে আসন অভ্যাস আবশ্যক। তাহার পরে প্রাণের স্তরে প্রাণায়াম করা সম্ভবপর হয়। প্রাণায়ামে উত্তীর্ণ হইলে তার ক্রিয়া ইন্দ্রিয় ও মনের উপর হইয়া থাকে। এটি প্রত্যাহারের অবস্থা। পরে প্রত্যাহার সিদ্ধ হইয়া গেলে যোগী বাহ্য জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। কারণ তখন কোনও ইন্দ্রিয় ক্রিয়া করে না। তাহার পর অন্তর্জগতে প্রবেশ করে। সেখানকার ক্রিয়ার নাম ধারণা-ধ্যান-সমাধি। সেই সময় বাহ্য জগতের বিষয়ের কোন জ্ঞান আসে না, কিন্তু মনের সংস্কার কার্য করিতে থাকে। এটি ধারণার অবস্থা। হাতে জল লইয়া জল ফেলিয়া দিলে টপটপ করিয়া জল পড়ে—সেটা এই অবস্থা। মন স্থির হইয়া গেলে ধ্যান হয়। এই স্থলে মনের ক্রিয়াতে অবিচ্ছিন্ন ভাব তৈলধারার ন্যায়। এইটি ধ্যানের অবস্থা। তাহার পর মন অভীষ্ট বিষয়েতে

আবিষ্ট হয়—মনের ধারা প্রবাহ থাকে না। ইহার নাম সমাধি। সমাধি ক্রমশঃ পরপর উচ্চভূমিতে করিতে হয়। সর্বপ্রথমে সমাধির বিষয় স্থূল বাহ্য আবরণ। ইহার পর সূক্ষ্ম বাহ্য আবরণ। প্রথমটিকে বিতর্ক সমাধি, দ্বিতীয়টিকে বিচার সমাধি বলে। বিতর্ক সমাধির ভিতরে দুটি অবস্থা আছে। বিচারের মধ্যেও দুটি অবস্থা আছে। সবিতর্ক ও নির্বিতর্ক অথবা সবিচার বা নির্বিচার ইত্যাদি। এইখানে একটা বিষয় বুঝিতে হইবে। কোন বিষয়ে চিত্তের সমাধি হইলে প্রজ্ঞার উদয় হয়। ইহাকে সমাধিজনিত জ্ঞান বলে। জ্ঞানের উদয়ের পর ঐ জ্ঞানটিকে শুদ্ধ বা নির্মল করিতে থাকে। বিকল্প জ্ঞানের মল সাংকর্য। সবিকল্প হইতে নির্বিকল্পে যাওয়াই জ্ঞানের শুদ্ধি। বিতর্ক ভূমিতে শব্দ ও জ্ঞানের সাংকর্য বা মিশ্রণ ঘটে। এই সাংকর্য কি প্রকার? শব্দের সহিত যেমন অর্থের সম্বন্ধ। তেমনি জ্ঞানের সহিত অর্থের সম্বন্ধ আছে। এই জন্য জ্ঞানের মধ্যে শব্দসংস্কার থাকিয়া যায়। এইজন্য সমাধি হয় সবিকল্প। কিন্তু যখন এই সংস্কার বা শব্দসংস্কার কাটিয়া যায় তখন জ্ঞান নির্মল হয়। ইহাই নির্বিকল্প অবস্থা। যাহা সবিতর্ক তাহা সবিকল্প, যেটি নির্বিতর্ক সেটি নির্বিকল্প। ইহার পর সূক্ষ্মস্তরে সবিচার-নির্বিচার সমাধিতে সূক্ষ্ম বিষয় লইয়া সবিকল্প নির্বিকল্পে ভেদ আছে। ইহার পর বাহ্য জগতের বিষয়ে সমাধি সম্ভব নয়। তখন সমাধি হয় করণবর্গ লইয়া। তার উপরে গ্রহীতা সমাধি। ইহার নাম অস্মিতা। এইখানে সম্প্রজ্ঞাত সমাধি সমাপ্ত হইয়া যায়। এ অবস্থায় সমস্ত বিশ্বের জ্ঞান অধিগত হয় কিন্তু আত্মসাক্ষাৎকার হয় না। বিবেক-খ্যাতির উদয় হয় না। পর-বৈরাগ্যের উদয় হয় না। ইহার পর যে যোগী কৈবল্যের দিকে অগ্রসর হইয়া থাকেন তাঁহাকে পর-বৈরাগ্যের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। নিম্নস্তরের বৈরাগ্য বিষয়-বৈরাগ্য। ইহা স্থূল। পর-বৈরাগ্য প্রকৃতি হইতে বৈরাগ্য। ইহা সূক্ষ্ম। এই অবস্থায় বিবেক-খ্যাতির অভিব্যক্তি হয়। একসময় পুরুষের সাক্ষাৎ অর্থাৎ আত্মসাক্ষাৎকার হয়। সঙ্গে সঙ্গে গুণময়ী প্রকৃতির সাক্ষাৎকার হয়। কিন্তু গুণময়ী প্রকৃতির প্রতি বৈরাগ্য জন্মে। নিজের আত্মা অপরিণামী—প্রকৃতি পরিণামশীলা। ইহার পর ধীরে ধীরে আত্মস্বরূপে স্থিতি লাভ হয়, যাহা প্রকৃতি হইতে নিত্য মুক্ত। ইহাই রাজ-যোগের সাধনার ক্রম।

বিবেক জ্ঞান ও বিবেকজ জ্ঞান দুটি পৃথক্ জিনিষ। বিবেক জ্ঞান পুরুষ ও প্রকৃতির ভেদ জ্ঞান। ইহার ফলে পুরুষ ও প্রকৃতির বিবেক হয়। বিবেকজ জ্ঞান অতি শ্রেষ্ঠ বিভূতিস্বরূপ। বিবেকজ জ্ঞান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জ্ঞান নাই। ক্ষণ এবং ক্ষণের ক্রম বা প্রবাহে সংযম করিতে পারিলে বিবেকজ জ্ঞান উৎপন্ন হয়। ইহারই একটি অংশ তারক জ্ঞান। তারক জ্ঞান সর্ববিষয়ের সর্বপ্রকার অবস্থা বিষয়ে ক্রমহীন। যাহাকে আমরা সর্বজ্ঞত্ব বলি তাহা তারক জ্ঞানের

অন্তর্গত। ইহা বিবেকজ জ্ঞান হইতে উদ্ভূত হয়। বিবেক জ্ঞান ও বিবেকজ জ্ঞানে পার্থক্য এইভাবে বুঝিতে হইবে।

প্রাণায়ামের সম্বন্ধে আরও কয়েকটি জ্ঞাতব্য বিষয়—প্রাণায়ামের তিনটি অঙ্গ—পূরক, রেচক ও কুম্ভক। বায়ুর দুটি অবস্থা—একটি স্থির ও স্তম্ভিত, অপরটি স্পন্দনশীল। বায়ু যখন ক্রিয়া করে, ভিতর হইতে বাহিরে যায়। বাহির হইতে ভিতরে প্রবেশ হয়। স্তম্ভিত অবস্থায় ভিতরে প্রবেশ হইলে তাহার নাম অন্তঃকুম্ভক। বায়ু যখন বাহিরে স্থির হয় তখন তাহাকে বাহ্য-কুম্ভক বলে। অন্তঃকুম্ভকে পূরকান্ত কুম্ভক বলে। বাহ্যকুম্ভককে রেচকান্ত কুম্ভক বলে। যখন শ্বাস গ্রহণ অথবা ত্যাগের ভাব না রাখিয়া কুম্ভক করা যায়, তাহা কেবল কুম্ভকের পূর্বসূচনা। সাধারণতঃ প্রাণায়ামের মাত্রা আছে। ইহা শিষ্যের অবস্থানুসারে গুরুর উপদেশ-সাপেক্ষ। ১-৪-২ ইহাই প্রচলিত অনুপাত অর্থাৎ শ্বাস প্রশ্বাসের চারগুণমাত্রা স্থিতি ভিতরে, দ্বিগুণে রেচন। এই সম্বন্ধে আপন আপন গুরুনির্দ্দিষ্ট অনুপাত অনুসারে চলা আবশ্যক। এই প্রসঙ্গে আর একটি রহস্যের বিধি বলা যাইতেছে। বায়ুর ত্রিবিধ গতি লক্ষ্য করা যায়। একটি বাহ্য এবং আভ্যন্তরীণ গতি, অধঃ-উদ্ধর্বগতি—শরীরের নিম্ন প্রদেশ হইতে হৃদয়ের দিকে। আরেকটি হৃদয় হইতে উদ্ধর্ব-গতি। এই গতিটি অতি রহস্যময়। এই গতির ফলে চিদাকাশের সঙ্গে সংশ্রব ঘটে—হৃদয় হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত ৩৬ আঙ্গুল প্রাণের গতি হয়। যোগীর পক্ষে এই গতির অধিকারী হওয়া শ্রেষ্ঠ। প্রাণায়ামের ক্রিয়া নিজে নিজে করিতে নাই। কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম হইলে রোগ হইতে পারে। সাধারণ দৃষ্টিতে বলিতে গেলে বলা যায় প্রত্যাহারের পর যেটি অন্তরঙ্গ যোগ তাহাই শ্রেষ্ঠ। সমাধির অনেক রহস্য আছে, এখানে তাহা বলা হইল না। সমাধির মুখ্য উদ্দেশ্য প্রজ্ঞার উদয়।

পূরক মানে বাহির হইতে বায়ু শ্বাসের দ্বারা ভিতরে গ্রহণ করা।

ঐ ভিতরের বায়ুকে ভিতর হইতে বাহিরে আনা—ইহার নাম রেচক।

আর স্তম্ভিত রাখা—ইহার নাম কুম্ভক। ইহা বাহিরে হইতে পারে ভিতরে হইতে পারে।

রেচক—রিক্ত করা, পূরক—ভরিয়া লওয়া। ভিতরে হউক, বাহিরে হউক, স্তম্ভিত রাখা, ইহার নাম কুম্ভক। ইহার ভিতরে রহস্য আছে। রেচন ও পূরণ বাম নাসা অথবা দক্ষিণ নাসা দিয়া, ইহা উপদেশসাপেক্ষ। সাধারণ নিয়মে এক নাসা দিয়া ভিতরে প্রবেশ করাইয়া অন্য নাসা দিয়া বাহির করা, এইরূপ পর্যায়ক্রমে। প্রাণায়ামে মাত্রার সংখ্যা সব সময় ধ্যানে রাখা আবশ্যক।

ইহা অভ্যাসের জন্য;—পরিপক্ক হইলে প্রয়োজন নাই। ঠিক ঠিক প্রাণায়াম করিতে পারিলে মলিনতা শুদ্ধ হইয়া যায়। প্রতিদিনের সঞ্চিত মলিনতা প্রাণায়ামের দ্বারা শুদ্ধ করিতে হয়।

জপরহস্য

সাধনার দুটি অঙ্গ—জপ ও ধ্যান। যোগাভ্যাস করিতে হইলে এই দুইটি বিশেষ রূপে অভ্যাস করা আবশ্যক। চিত্ত যখন বহির্মুখ থাকে তখন ক্রিয়াযোগ আবশ্যক হয়, চিত্ত যখন অন্তর্মুখ থাকে তখন সমাধিযোগ হয়। ক্রিয়াযোগের অন্তর্গত তিনটি ক্রিয়া রহিয়াছে। একটি তপস্যা, দ্বিতীয়টি মন্ত্রজপ, তাহার নামান্তর স্বাধ্যায়, তৃতীয়টির নাম ঈশ্বর-প্রণিধান বা ধ্যান। তপস্যা বলিতে পরমার্থ জীবনের উন্নতি লাভ করার জন্য কষ্টসাধন করা। যতটুকু শরীরে সহ্য করা যায় ততটুকু করা আবশ্যক, বেশী নয়। গুরুদত্ত ইষ্টমন্ত্র জপ করা—ইহার নাম স্বাধ্যায়। এই জপ সংখ্যা রাখিয়া করা যায়, বিনা সংখ্যায়ও করা যায়। সংখ্যা রাখা স্থূল ভাবেও হইতে পারে, অভ্যাস হইলে মনে মনে অন্যভাবেও হইতে পারে। নিত্য জপ যাহার করণীয়, তাহার সংখ্যা রাখা আবশ্যক। প্রথমে সংকল্প করিয়া বসিতে হয়। নিত্য জপ, তাহার নিত্য সংখ্যা। সেই সংখ্যাকে অন্ততঃ পক্ষে পূর্ণ করা আবশ্যক। তাহার পর উহার পক্ষে যতটা অধিক সম্ভব নির্দ্দিষ্ট সময়ে পূর্ণ করা আবশ্যক। বিনা সংখ্যার জপ সর্বাবস্থায় করা যায়। জপ আরম্ভ করিবার পূর্বে গুরু এবং ইষ্টদেবতাকে প্রণাম করিয়া লইবে। সংখ্যা রাখিয়া যে জপ করা যায় তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধিলাভ। বিনা সংখ্যায় যে জপ তাহার উদ্দেশ্য বিশ্বকল্যাণ।

(জপ সমর্পণ জল দিয়া করিতে হয়)

কালীরহস্য

প্রশ্ন ঃ কালীর গলাতে মুণ্ডমালা কেন?

উত্তর ঃ কালীমূর্তি সাক্ষাৎ জগদম্বার মূর্তি, পরাশক্তির একটি রূপ। পরাশক্তির বহুরূপ আছে, কালী তাহার একটি রূপের অন্তর্গত। কালীর প্রকারভেদ আছে—দক্ষিণাকালী, বামাকালী, শ্মশানকালী, কালকালী, কামকলাকালী ইত্যাদি ইত্যাদি। আপাততঃ দক্ষিণাকালীর বঙ্গদেশে প্রচার অধিক, তাহার কথা বলিতেছি। কালীমূর্তির নীচে শবরূপী শিব থাকেন। শিবের

চৈতন্যশক্তি দেহ হইতে উত্থিত হইলে দেহ শবাকারে পরিণত হয়। ঐ শবের উপর চৈতন্যশক্তি ক্রিয়া করিয়া থাকেন। শিবের বক্ষের উপরে কালী বিরাজমান। শিবত্ব লাভ না করিলে কালীকে হৃদয়ে ধারণ করা যায় না। শিবত্ব লাভ করিয়া শবাবস্থা প্রাপ্ত হইলে কালীর সন্ধান পাওয়া যায়। শিবই শব হইতে পারে, জীব কখনও হইতে পারে না। কালীর মূর্তিতে চার হাত দেখা যাইতেছে, তাহাতে একটিতে বরমুদ্রা আরটিতে অভয়মুদ্রা বিদ্যমান আছে। অপরদিকে একটিতে খড়্গ ও অপরটিতে অসুরের মস্তক। এই যে অসুর, ইহার নাম মহামোহ। ইহাকে জ্ঞানের দ্বারা কাটিতে হইবে। জ্ঞানের প্রতীক অসি। জ্ঞানের দ্বারা মহামোহ কাটা হইয়াছে বুঝিতে হইবে। এই যে মহামোহ ইহা মনুষ্যের বিকল্প-জাল। এই বিকল্পের মূল মাতৃকা অর্থাৎ বর্ণমালা। পঞ্চাশ বর্ণমালা আছে। সেগুলি মোহের কারণ। বিকল্পের উদ্বোধ হেতু সেইগুলিকে কাটাইয়া শূন্যাবস্থা প্রাপ্ত হইতে হয়। যে মুণ্ড হাতে বিধৃত সেটি মহামোহ। ঐ সকল মহামোহের বিকল্পহেতুভূত এই মুণ্ড ধারণ করিয়া আছেন বিশ্বের সকল বিকল্পের জননী। বিকল্পের নাশ তিনি করেন জ্ঞানের দ্বারা। জ্ঞানের প্রতীক অসি। একহাতে বরমুদ্রা—সংসারের সুখ দান করেন। আরেক হাতে অভয় মুদ্রাতে মোক্ষ দান করেন। তিনি দিগম্বরা, কারণ তিনি আকাশস্বরূপ, তাঁহাকে আবরণ কে করিবে? তাহা বুঝিবার জন্য দিগম্বরা। এইপ্রকার বৈশিষ্ট্যের ব্যাখ্যা আছে। জিহ্বা বার করার মূলে নির্বিকল্প অবস্থায় অবস্থান করার সূচনা—শবরূপী শিবের হৃদয়ে এইভাবে বিচরণ করেন। তিনি শ্মশানবাসিনী। শ্মশান শব শয়ান, অর্থাৎ সেইখানে এইপ্রকার শব অবস্থান করে। জীবভাবে কালীর আবির্ভাব নাই। জীবভাব পরিণত হয়ে শিবভাবের আবশ্যক হয়। শিবভাব হইতে শিবশক্তি নির্গত হইলে আদ্যাশক্তিরূপে খেলা করে। জীব শব হইতে পারে না কারণ জীবের মৃত্যু হয়। জীব শব হইতে পারিলে শিব হয়, তাহার পূর্বে নয়। মহাশূন্য ভেদ করার পূর্বে মহাবিদ্যার প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। ইহার মধ্যে তিন প্রকার কালী-তারা-ষোড়শী। সংসারের ঐশ্বর্য, মাধুর্য সমস্ত শোষিত হওয়ার পর যে পর-চৈতন্যের স্পন্দন জাগিয়া উঠে, তাহাই কালী। ইহা অমাবস্যার সূচনা। ষোড়শী ললিতা কালীর বিপরীত। কালী অমাবস্যা, ইনি পূর্ণিমা, সৌন্দর্য ও ঐশ্বর্যের প্রতীক স্বরূপ। ইঁহার নামান্তর ললিতা, ত্রিপুরসুন্দরী। ইঁহার অনন্ত ঐশ্বর্য আছে, তাই ইঁহাকে রাজরাজেশ্বরী বলে। কালী হইতে ষোড়শীতে যাইবার রাস্তায় তারা আসেন। তারা মানে তারিণী। দশ অবতারে রাম যাহা, তারা তাহাই। দশ অবতারে ব্রহ্মনাম, তারিণীও তাই। দিক্ ভেদ মাত্র। ইহার গভীর রহস্য আছে। প্রকাশ্য নহে। এই যে মুণ্ডমালা কালীর গলায় শোভা পাইতেছে—এই সবের

সংখ্যা পঞ্চাশটি। এই পঞ্চাশটি বিকল্পের হেতু মানুষের দেহে ষটচক্রের রূপে বিদ্যমান রহিয়াছে। মূলাধারে চার বর্ণ, স্বাধিষ্ঠানে ছয়, মণিপুরে দশটি, অনাহতে বারোটি, কণ্ঠে বিশুদ্ধে ষোল, ভ্রূ মধ্যে আজ্ঞাচক্রে দুটি এই পঞ্চাশটি বর্ণ ক্রিয়া করে, এইগুলি বিকল্পের মূল। ইহাতে অজ্ঞান সাগরে ডুবিয়া যায়, বিকল্প কাটিয়া গেলে নির্বিকল্পে উপস্থিত হয়। সেই জ্ঞানই খড়্গ রূপে দেখা যাইতেছে, বর্ণগুলি মালা রূপে দেখা যাইতেছে। কালীর চার হাতে যাহা আছে, তাহার নাম বরমুদ্রা, অভয় মুদ্রা, খড়্গ, অসুর মুণ্ড। চিন্তা করিলে বুঝা যায় যে মনুষ্য হৃদয়ে মূল বিকল্প রূপে যাহা তাহাকে অজ্ঞান রাজ্যে ঘুরাইয়া নিয়া বেড়ায় তাহার সবগুলিকে তিনি খড়্গ দ্বারা কাটিয়াছেন। ঐ সকল বিকল্পের মূল হেতু যে মহামোহ অসুর তাহাকেও খড়্গ দ্বারা কাটিয়াছেন কিন্তু ত্যাগ করেন নাই, আভূষণ রূপে সংযোগ করিয়াছেন, কেননা তিনি মাতৃশক্তি। বিকল্পাত্মক সংসারের ঊর্দ্ধে যাহারা, তাহাদের জন্য বর স্বর্গাদি দিব্যসুখ রহিয়াছে। যাহারা তাহা চায় না তাহাদের অভয় দেন, মোক্ষের আশ্বাসন দিয়াছেন। এইভাবে কালী চতুর্বর্গ ফলদায়িনী ইহাতে সন্দেহ নাই। মানুষকে জগদম্বা বা মহাকালীকে ধারণ করিতে হইলে শিবভাব আনিতে হইবে, ইহাই রহস্য।

বর ও অভয় ডানদিকে, খড়্গ ও নরমুণ্ড বাঁ দিকে। বর মানে জাগতিক সম্পদ ধার্মিকের প্রার্থনীয়, মুমুক্ষুর অভয় প্রার্থনীয়, তাৎপর্য এই যোগ্য অধিকারীকে দান করেন। উপরে হাতে খড়্গ বা অসি তাহা জ্ঞানের প্রতীক, বাঁ দিকে নীচে যে নরমুণ্ড তাহা অসুর মুণ্ড, ইহা মহামোহ, ইহার মানে দেহাত্মবোধ প্রকৃতি প্রভৃতি অনাত্ম বস্তুতে অহং ভাবের উদয়। অসি হইল জ্ঞান ইহা মনে রাখিতে হইবে। মুণ্ডমালা পঞ্চাশটি বর্ণ মাতৃকার প্রতীক অর্থাৎ অ আ ক খ ইত্যাদি। বর্ণ বা মাতৃবর্গ ভাষা দ্বারা মনুষ্য হৃদয়ে বিকল্পের উদয় হয় বৈখরী বা 'ক' অবস্থায়। ঐ সকল বিকল্প নষ্ট হয় জ্ঞানের দ্বারা। আত্মজ্ঞান রূপ অসির দ্বারা ঐ সকল পঞ্চাশটি বিকল্প হেতুকে নাশ করিয়া অর্থাৎ শোধিত রূপে মা নিজের গলাতে পরিধান করেন এবং মুণ্ডমালা পরিধান করেন। মার কৃপায় দেহের অহং বোধ নষ্ট হয় জ্ঞানের দ্বারা। তাহা তিনি দান করেন। বিকল্প শোধন করিয়া শুদ্ধ বিকল্পময় মালারূপে ধারণ করেন। জীব বিকল্প শূন্য হইয়া থাকিতে পারে না। ইহা দক্ষিণা কালী মূর্তির তাৎপর্য।

সারাংশ—'মা দক্ষিণাকালী জীবের প্রতি অশেষ করুণাময়ী। তিনি শুদ্ধ যে মুমুক্ষুকে আপন সন্তান মনে করেন তাহাই নয় কিন্তু মোক্ষ না চাহিয়াও

যাঁহারা ধর্মপথে থাকিতে চান তাঁহাদের জন্য তাঁহার বরমুদ্রা। অভয় মুদ্রা মুমুক্ষু সন্তানের জন্য। আর অশুদ্ধ বিকল্প ত্যাগ করিয়া শুদ্ধ বিকল্প গ্রহণপূর্বক যাহারা সৎপথে থাকিতে চায় তাহাদিগকেও সন্তানরূপে গ্রহণ করেন। তাঁহার মুণ্ডমালা, অসি, নরমুণ্ড সমষ্টিভাবে ইহাই প্রকাশ করে। এই সংসারে যাহারা মোহে বিজড়িত, তাহারা অসুরের অধীন। এই অসুরটি অহঙ্কাররূপী মহামোহ। এই অসুরকে মা জ্ঞানরূপ অসি দ্বারা কর্ত্তিত করিতেছেন। এই নাশব্যাপার তাঁহার বামহস্তে বিধৃত মুণ্ড ও খড়্গ দ্বারা দ্যোতিত হইতেছে। তাঁহার গলাতে যে মুণ্ডমালা, তাহা শাস্ত্র অনুসারে বর্ণ-মালার দ্যোতক। এই বর্ণমালা বৈখরী বাক্‌স্বরূপ এবং অশুদ্ধ বিকল্পের উৎপাদক।

ন সোঽস্তি প্রত্যয়ো লোকে
যঃ শব্দানুগমাদৃতে।

এই বৈখরী শব্দ হইতে অশুদ্ধ বিকল্প উদয় হয়। তাহাদের উৎপাদক-রূপী এই ৫০টি বর্ণ মায়ের হস্তস্থিত জ্ঞানের দ্বারা কর্ত্তিত ৫০টি অসুর মুণ্ড বুঝিতে হইবে। এইগুলিকে তিনি ত্যাগ করেন নাই। মহামোহরূপ যে মূল অসুর তাহাদের অনুচররূপ ব্যক্তিগত অসুর, তাহাদিগকে নাশ করিয়াও মা তাহাদিগকে নিজ দেহে ধারণ করিয়াছেন। ইহার দ্বারা বুঝা যায়, অশুদ্ধ বিকল্পরূপী নয় কিন্তু শুদ্ধ বিকল্পরূপী যে অহম্ভাব তাহাকে তিনি ত্যাগ না করিয়া ধারণ করিয়া আছেন। এর দ্বারা বুঝা যায় মা চতুর্বর্গ ফলপ্রদা।

আগমিক দৃষ্টিতে সাধনার উদ্দেশ্য

আগম শাস্ত্র অনুযায়ী সাধনপ্রণালী দ্বিবিধ দৃষ্টিতে দেখা যায়। এক-দৃষ্টি অনুসারে কৈবল্যভাব মুখ্য—পুরুষকৈবল্য অথবা ব্রহ্মকৈবল্য। সব দৃষ্টিতেই ভগবত্তা অথবা পরমশিবত্ব তথা স্বাতন্ত্র্যময়ী পরাসংবিতের প্রাপ্তি প্রধান লক্ষ্য। সাংখ্যসাধনার লক্ষ্য, বিবেকজ্ঞানমূলক কৈবল্যলাভ—পুরুষ আপন কেবল স্বরূপে প্রকৃতি থেকে মুক্ত হয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই পুরুষ চিৎস্বরূপ। বেদান্তের কৈবল্যও প্রায় এই প্রকার নিরঞ্জন ভাবপ্রাপ্তি। বেদান্ত ও সাংখ্যের মধ্যে পার্থক্য এই, সাংখ্যে আত্মা বহু আর বেদান্তে এক। সাংখ্যে অচিৎ ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিরূপা আর বেদান্তে অনির্বচনীয় মায়ারূপা। আত্মার স্বরূপস্থিতি প্রায় একই প্রকার। আত্মার পরমেশ্বরত্ব অথবা পূর্ণত্ব

উভয়ত্রই দুর্লভ। সাংখ্যের জ্ঞান বিবেক জ্ঞান আর আত্মার স্থিতি অচিৎ থেকে মুক্ত হ'য়ে চিৎস্বরূপে। কিন্তু তাতে বিমর্শ থাকে না! বেদান্তেও প্রায় একই প্রকার অবস্থা—বিমর্শহীন স্থিতি, কিন্তু তাতে আত্মার স্বাতন্ত্র্য-শক্তির বিকাশ হয় না।

আগমিক দৃষ্টিতে ইহা থেকে আরও অধিক বৈলক্ষণ্য আছে। উহারও লক্ষ্য অচিৎ থেকে চিৎ পৃথক হওয়া—অচিৎ প্রকৃতিরূপা হোক মায়ারূপা অথবা মহামায়ারূপা হোক। কিন্তু আত্মার স্বতঃসিদ্ধ শিবত্বের উদ্বোধন হয় না। এইজন্য চিৎস্বরূপের সঙ্গে চিদ্‌রূপা স্বরূপশক্তির বিকাশ হওয়া চাই—তা' হ'লেই চিৎস্বরূপ শিবরূপে প্রকট হ'তে পারে। বস্তুতঃ শিবশক্তি অভিন্ন, দুই-ই চিৎস্বরূপ তথা আনন্দস্বরূপ। শিবশক্তির সামরস্য পূর্ণত্বে মোক্ষ দেয়। এই জন্য মোচকজ্ঞান তথা তারকজ্ঞানযুক্ত আত্মা চিৎস্বরূপ—এ জানাই যথেষ্ট নয়। চিৎস্বরূপভূতা শক্তিরও উহাতে স্বাতন্ত্র্যরূপে অভিব্যক্ত হওয়া চাই। ইহারই নাম স্বাতন্ত্র্যময় বোধ—শৈবদৃষ্টি অনুসারে অথবা বোধাত্মক স্বাতন্ত্র্য, শাক্ত দৃষ্টি অনুসারে।

স্বাতন্ত্র্য আর বোধে ব্যবধান হ'লে বিশ্বসৃষ্টি হয়। ইহাতে অজ্ঞানের আবির্ভাব হয়। অতএব মুখ্য জ্ঞান শুদ্ধবিদ্যা। সদ্‌গুরু এই শুদ্ধবিদ্যা সঞ্চারের দ্বারাই জীবকে শিবত্বে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন। অনাত্মায় আত্ম-বোধ যেমন অজ্ঞান, তেমনি আত্মায় অনাত্মবোধও অজ্ঞানপ্রসূত। আত্মার আত্মবোধই মুখ্যজ্ঞান। কিন্তু ইহা সাংখ্যে অথবা বেদান্তে নাই। এই জ্ঞানের নাম পূর্ণাহন্তা জ্ঞান—যে জ্ঞানে জীব আপনাকে পরমশিবরূপে অথবা পরমেশ্বররূপে অনুভব করতে পারে, কেবল ত্রিগুণ অথবা মায়া থেকে মুক্ত রূপে নয়।

বিবেক জ্ঞান দ্বারা আত্মা অচিৎ থেকে মুক্ত হ'লে উহার চিদ্‌রূপ প্রকাশিত হয়, কিন্তু ঐ চিদ্‌রূপের বিশুদ্ধ রূপে সাক্ষাৎকার ঘটে না এজন্য অবিবেক নিবৃত্ত হ'লেও আত্মা আপনাকে জানতে পারে না। আগম অনুসারে আত্মার অনাত্মবোধই অজ্ঞান। কিন্তু ইহা বিশুদ্ধ মায়ারাজ্যের ব্যাপার। প্রকৃতি অথবা মলিনমায়ার ঊর্ধ্বের ব্যাপার। শুদ্ধবিদ্যার উদয় হ'লে সর্বত্র অহং রূপের ভাণ হয়। 'ইদং' ভাবের ক্রমশঃ হ্রাস হয়। যখন ইদং পূর্ণরূপে লোপ পায় তখন একমাত্র অহংভাবই থাকে। ইনি পূর্ণ ঈশ্বর, পরমেশ্বর অথবা পরমশিব। শাক্তদৃষ্টিতে ইনিই পরাসংবিদ্, আদ্যাশক্তি, মহাশক্তি অথবা জগদম্বা।

প্রথম যাত্রায় জড়ভাব ত্যাগ ও মনুষ্যভাব প্রাপ্তি—
দ্বিতীয় যাত্রায় মনুষ্যভাব ত্যাগ ও ভগবদ্ভাব লাভ—
তৃতীয় যাত্রায় ভগবদ্ভাবে মগ্ন হয়ে অনন্ত বৈচিত্র্যের সন্ধান—

পরমপূর্ণ আত্মস্বরূপ ভগবৎসত্তা তথা ব্রহ্মসত্তা থেকে নির্গত হয়েছে। এর মূলে পূর্ণ পরব্রহ্মের আত্মপ্রকাশের সঙ্কল্প বুঝতে হবে। ভগবৎসত্তায় যখন নিজেকে জানবার সঙ্কল্প উদয় হয় তখন ক্রমে ক্রমে আত্মা তথা বিশ্বের আবির্ভাব হয়। আত্মা সর্বপ্রথম অখন্ড বিরাট অনন্ত সত্তা থেকে 'অহং'রূপে স্ফুরিত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রকৃতি 'ইদং'রূপে আবির্ভূত হয়। কোন কোন আচার্য এই অহং-ইদংকে পুরুষ-প্রকৃতি নামে বর্ণনা করে থাকেন। ক্রমশঃ আত্মারূপী পুরুষ প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে ক্রমবিকাশের পথে অগ্রসর হয়। এখানে মনে রাখা দরকার আত্মা চিদ্রূপ, প্রকৃতি অচিদ্রূপ। অভিব্যক্ত অবস্থায় চিৎ আর অচিৎ অবিবিক্তরূপে প্রকাশমান। অচিত্তত্ত্ব অহংরূপী আত্মার দেহরূপে কল্পিত হয়—প্রথমে অস্পষ্টরূপে, পরে ক্রমশঃ অধিকতর স্পষ্টরূপে প্রকৃতি দেহাদিরূপ নিয়ে ভোক্তা আত্মার সঙ্গে মিলে যায়। ইহাই ৮৪ লক্ষ যোনির ক্রমবিকাশের ধারা। এই ধারায় স্থাবর সত্তা থেকে জঙ্গম সত্তার উৎপত্তি হয়। এখানে মনে রাখা প্রয়োজন স্থাবরেরও ক্রম আছে এবং জঙ্গমেও ক্রম আছে। শেষে মানুষের উৎপত্তি। ইহাই প্রকৃতিরূপা শক্তির প্রথম ক্রমবিকাশ।

এই ক্রমবিকাশের পথে প্রথমে অন্নময় কোষের উদ্ভব হয়, তারপর ক্রমশঃ প্রাণময় কোষের বিকাশ হয়—প্রাণময় কোষ থেকে মনোময় কোষের বিকাশ। মনোময় কোষের প্রাথমিক বিকাশ মনুষ্যেতর জীবে দেখা যায়। কিন্তু উহার পূর্ণবিকাশ যখন হয় তখনই মনুষ্যদেহের উৎপত্তি হয়। মনুষ্যেতর জীবে মনের আভাস আছে—ঠিক মন নেই। মনোময় কোষের বিকাশ আর মনুষ্য দেহের উৎপত্তি প্রকৃতির বিবর্তনের সর্বপ্রথম মুখ্য ফল। মনের লীলাক্ষেত্রে ষট্চক্রের বিকাশ হয় এবং বিবেক হওয়ার দরুণ কর্ম করার অধিকার আসে।

মানব দেহেই নৈতিক জীবন সম্ভব। পশুপাখী আদি ইতর জীবে নৈতিকতার কোন প্রশ্ন নেই সেখানে বিবেকের বিকাশ নেই। মনুষ্যদেহেই মনোময় কোষের পূর্ণবিকাশ হয়। ধর্মাধর্মরূপ কর্মসংস্কার এই দেহেই সম্ভব এবং আপন আপেক্ষিক স্বাতন্ত্র্যের বিকাশ এই দেহেই হয়। মানুষের

কর্মের পিছনে প্রবর্তকরূপে কর্তৃত্বাভিমান থাকে এবং কর্মের ফলভোগ মানুষকেই করতে হয়। এখানে মনে রাখতে হবে ধর্মাধর্মরূপ কর্মের ফল সুখ-দুঃখের অনুভব। মনুষ্যেতর যোনিতে আত্মা কর্তাও ছিল না, ভোক্তাও ছিল না। কিন্তু মনুষ্যদেহ পেয়ে আত্মা কর্তা এবং ভোক্তা হয়ে যায়। কর্তা হ'য়ে কর্ম করে, আর ভোক্তা হ'য়ে ফল ভোগ করে। বাস্তবে ইচ্ছার উদয় মানব দেহেই সম্ভব। কিন্তু মনে রাখা উচিত মানবদেহ পাবার পর মানব প্রকৃতির বিকাশ হয়—মানব প্রকৃতির বিকাশ হতে সময় লাগে। ইহা পশুভাব, বীরভাব নয়। যখন আকৃতিগত মানুষ প্রকৃতিগত মানুষভাব পায় তখন পশুভাব, বীরভাব যথার্থ মনুষ্যভাবে পরিণত হয়। এই মানবদেহই ভগবৎ প্রাপ্তির উপযোগী, কেন না মনুষ্যভাবের পূর্ণবিকাশই ভগবদ্ ভাব।

পশুভাবে সাক্ষাৎ ভগবদ্‌ভাবে উন্মেষ সম্ভব নয়। মানবদেহ প্রাপ্তির পর যথার্থ মনুষ্যত্ব যতদিন বিকাশপ্রাপ্ত না হচ্ছে ততদিন মানুষ কর্মের অধীন থাকে। স্বকৃত কর্মের ফল ভোগ করার জন্য বারে বারে জন্মগ্রহণ ও লোক-লোকান্তর পরিভ্রমণ করতে হয়। কর্মের প্রভাবে মানুষ পশুপাখী প্রভৃতির রূপও ধারণ করে ফলভোগ করার জন্য; অথবা দেবযোনিতেও যেতে পারে। কর্মফল ভোগ শেষ হবার পর পুনরায় মনুষ্য ভাবের পুনরাবৃত্তি ঘটে। এই প্রকারেই কোটি কোটি জন্ম অতিবাহিত করার পর মানুষের কর্তৃত্বাভিমান শিথিল হয়। তখন বুঝতে পারে যে কর্তা নয়—প্রকৃতির গুণে প্রভাবিত হয়ে সে কর্ম করে। আরও কিছু দূর অগ্রসর হলে বুঝা যায় বাস্তবে কর্তা প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা স্বয়ং ভগবান্—তিনিই সবকিছু করেন। অভিমানবশতঃ জীবাত্মা মনে করে সেই কর্তা। এর পরে আসে কর্মসন্ন্যাস। এই অবস্থায় প্রথম স্থিতিতে মানুষ মনে করে পরমাত্মা কর্তা আর তাঁর দ্বারা প্রবর্তিত হয়ে সে কর্ম করে। শেষে বোঝে পরমাত্মাই কর্তা আর সে শুধু সাক্ষী মাত্র।

প্রথম যাত্রায় আত্মা ভগবৎ সত্তায় লীন জ্ঞানহীন অবস্থা থেকে উদ্বুদ্ধ হয়ে, জ্ঞান পেয়ে প্রকৃতির ক্রমবিকাশ অনুসারে ৮৪ লক্ষ যোনি ভ্রমণ করার পর মানবদেহ প্রাপ্ত হয়। মানুষের কর্তৃত্বাভিমান পূর্ণরূপে বিগলিত না হওয়া পর্যন্ত ফলভোগ চলে। মনুষ্যদেহের বৈশিষ্ট্যই সর্বপ্রথম কর্তৃত্বাভিমানের উদয়। ইহাকে নৈতিক জীবন বলে। কর্তৃত্বাভিমান শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নৈতিক জীবনের পরিহার ঘটে। তারপর অধ্যাত্ম জীবনের আরম্ভ, অর্থাৎ স্বয়ং কর্তৃত্বাভিমান থেকে মুক্ত হ'য়ে এবং কর্মসন্ন্যাস লাভ ক'রে দ্রষ্টাভাবে স্থিতিলাভ ঘটে। ইহাই প্রথম যাত্রার অবসান বুঝতে হবে। ভগবান থেকে মানুষ পর্যন্ত (from God to man) প্রথম যাত্রার ইহাই স্বরূপ।

এরপর শুরু হয় দ্বিতীয় যাত্রা যার উদ্দেশ্য মনুষ্যত্ব থেকে ভগবৎসত্তা পর্যন্ত উত্থান (journey from man to God)। এই যাত্রার প্রথমেই বৈরাগ্য আসে—জাগতিক পদার্থের প্রতি আকর্ষণ কেটে যায়—গুরুরূপে ঈশ্বরের কৃপা আসে—বিবেক এবং জ্ঞানের বিকাশ ঘটে। ইহা মানুষ থেকে ভগবান্ পর্যন্ত যাবার আরোহণের পথ। প্রারম্ভিক অবস্থায় এই পথে গুরু নির্দ্দিষ্ট অথবা আপন হৃদয়স্থিত অন্তর্যামীর নির্দিষ্ট প্রণালী নিয়ে চলতে হয়। ক্রমশঃ উর্দ্ধগতি লাভ হয়। স্থূলদেহ তথা স্থূলজগৎ থেকে বিবেকে আলাদা হয়। সূক্ষ্মদেহ তথা সূক্ষ্মজগৎ এবং কারণদেহ তথা কারণজগৎ থেকে আত্মার বিয়োগ ঘটে। সর্বশেষে মন থেকেও বিয়োগ ঘটে। প্রথমে মনোময় কোষ অতিক্রান্ত হয়, তারপর বিজ্ঞানময় কোষ। শেষে ব্যাপক মন থেকে সম্বন্ধ-রূপ বন্ধন কেটে যায়। অপরদিকে ঐশ্বরিক শক্তি তথা ঐশ্বরিক প্রেমের বিকাশ হয়। শেষে মন তথা মহামনের পূর্ণনিবৃত্তির পর ভগবৎস্বরূপের সাক্ষাৎকার হয়। এই অবস্থায় সাধক বা যোগী নিজেকে ভগবদ্‌রূপে বুঝতে থাকে। ইহা ভগবৎপ্রাপ্তির অবস্থা। এই সময় আত্মার অনুভব হয়—'আমিই ব্রহ্ম, আমি ভগবান্—আমি বিশ্বজগতের অধীশ্বর' এই স্থিতিতে ভগবদ্-ভাব প্রাপ্তি পূর্ণ হয়।

মনোময় কোষের পূর্ণবিকাশ হবার পর যখন নৈতিক জীবনের পূর্ণত্ব আসে তখন বিজ্ঞানময় কোষের সঙ্গে সঙ্গে আধ্যাত্মিক জীবনের শুরু হয়। আধ্যাত্মিক জীবনের প্রকাশ পূর্ণ হবার পর আনন্দময় কোষে গিয়ে দিব্য-জীবনের (divine life) আরম্ভ হয়। এই দিব্যজীবনের পূর্ণত্বই ভগবদ্ ভাবের প্রাপ্তি—এখানেই দ্বিতীয় যাত্রা সমাপ্ত। এই দুই যাত্রা পূর্ণ হবার পর আত্মা তথা জীবের ভগবৎপ্রাপ্তি স্থায়ী হয়। কিন্তু এ কথা যেন কেউ না বোঝে ইহাই জীবের স্থায়ী দশা। স্থিতিশীল দশা এ থেকে আলাদা—তার সঙ্গে এর কোনও সম্বন্ধ নেই।

জগৎ গতিশীল। জীবাত্মা জীবভাব ত্যাগ করে ভগবদ্‌ভাব প্রাপ্ত হয় এবং ভগবৎস্বরূপে নিরন্তর চলতে থাকে (journey within God)। প্রথমে ভগবৎস্বরূপ থেকে চ্যুত হয়ে মনুষ্যাদি রূপ নিয়ে আত্মস্বরূপে স্থিতি হয়। এর পর মনুষ্যস্বরূপ থেকে ভগবৎস্বরূপে পুনরাবর্তন ঘটে। শেষে ভগবৎ-স্বরূপে প্রবিষ্ট হয়ে অনন্তকাল পর্যন্ত তাঁহাতে সঞ্চরণ করতে থাকে।

মানুষ স্বয়ং ভগবত্তা লাভ করে উহার আস্বাদন করে। এই বৈচিত্র্যই ভগবানের মহিমা। ইহাকে স্থিতিদৃষ্টিতেও দেখা যায়, আবার গতিশীল দৃষ্টিতেও দেখা যায়। গতিশীল দৃষ্টিতে দেখলে অনন্তস্থিতিতে অনন্ত

গতির অনুভব হয়। ইহাই তৃতীয় যাত্রার রহস্য। সাধারণতঃ প্রচলিত দার্শনিক সম্প্রদায় দ্বিতীয় যাত্রার পর স্থিতি মনে করেন। কিন্তু অদ্বৈত-শাক্ত দার্শনিক মহাশক্তির ভিতরে এই পরিস্থিতিকে পরম গতিরূপে দর্শন করেন।

অধ্যাত্মমার্গে কৃপা এবং কর্মের স্থান

মানবজীবনের পরম লক্ষ্য ভগবান্ লাভ বা ভগবৎ প্রাপ্তি। এই প্রাপ্তির জন্য উপায় অবলম্বন প্রয়োজন। সাধকের যতক্ষণ দেহাভিমান প্রবল এবং কর্তৃত্ববোধ কাজ করে ততদিন কর্ম ছেড়ে অন্য কোন উপায় অবলম্বন করা কঠিন। কাম প্রবৃত্তি আসে অভিমান থেকে। প্রত্যেক দেহধারীই প্রতিক্ষণ কর্ম করছে। অভিমানের রাজ্যে থেকে অভিমান থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব নয়। এই জন্য কর্মের কৌশলের সাহায্য প্রয়োজন—এই কৌশল হচ্ছে যোগ—"যোগঃ কর্মসু কৌশলম্"। কর্মে যে বন্ধনের আশংকা আছে তা থেকে মুক্ত হয়ে কর্ম করতে হবে। বন্ধনের কারণ চিত্তের মালিন্য—এ মালিন্য আসে ফলাকাঙ্ক্ষা থেকে। এই কামনাই চিত্তকে মলিন করে। ফল মিলুক আর নাই মিলুক উহার প্রাপ্তির আশাই চিত্তকে কলুষিত করে। এজন্য কর্তৃত্ববোধ ত্যাগ করে কর্ম করা উচিত। ইহারই নাম যোগস্থ কর্ম। ইহাতে আসক্তি থাকে না—সিদ্ধি তথা অসিদ্ধিতে সমভাব থাকে। এই সমত্বই যোগ। এই-ভাবে কর্ম করতে করতে চিত্ত প্রায় শুদ্ধ হয়ে যায়। এই অবস্থায় অভিমান শিথিল হয়ে যাবার জন্য নানাপ্রকার কর্ম করার সামর্থ্য থাকে না। আত্মা অসমর্থতা অনুভব করে। এই অবস্থায় অভিমান শিথিল হলেও তার কিছু লেশ থাকে। উহাকে নিঃশেষ করবার জন্য কর্মের আবশ্যকতা থাকে। ঐ সময় অন্য কিছু করার কথা না ভেবে পরমেশ্বর তথা ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করাই সর্বোৎকৃষ্ট কর্ম। ইহাকেই শরণাগতি বলে। যথার্থ সন্ন্যাসও ইহাই।

কোন প্রকার বিশিষ্ট কর্মে লিপ্ত না হয়ে একমাত্র পরমাত্মার প্রতি দৃষ্টি রেখে তাঁকেই ধরে থাকা শরণাগতি ধর্মের নিত্য লক্ষণ। এরকম হলে ধীরে ধীরে কর্ম ছেড়ে যায়। যতদিন হৃদয়ে অভিমানের আভাস থাকে ততদিন করতেই হয়। শরণাগত সাধক ভগবানকে সর্বতোভাবে আশ্রয়রূপে বরণ করার জন্য মনকে নিয়োজিত করলে কর্তৃত্ববোধ নিবৃত্ত হয়। এই অবস্থায় পরমাত্মা স্বয়ং প্রয়োজ্য কর্তা হন্—"ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোস্মি তথা করোমি"। তখন সাধক বোঝেন বাস্তবিক প্রেরক এবং কর্তা অন্তর্যামী ভগবান্। এরপর কর্তৃত্বও থাকে না, তখন সাধক নিশ্চিন্ত হয়। স্বয়ং ভগবান্ কর্তৃত্ব নিয়ে স্ফুরিত হন। তখন সাধকের এ ভানও থাকে না যে

অন্যের দ্বারা প্রেরিত হয়ে কর্ম করছে। সে তখন সাক্ষী এবং দ্রষ্টা—ভগবান স্বয়ং কর্তা। এ অবস্থায় সাধকের অনুভূতি হয় যে তার শরীর, মন, বুদ্ধি প্রভৃতি দিয়ে যে কার্য হচ্ছে তা শ্রীভগবানই করছেন। এ সময় সে ধর্মাধর্ম থেকে মুক্ত হয়—শ্রীভগবানের চরণে আশ্রিত হয় তাঁর অনন্ত লীলা দর্শনের অধিকারী হয়। সুতরাং সাধারণ দৃষ্টিতে কর্মের স্থান প্রথমে আর কৃপার স্থান তার পরে। কিন্তু মনে রাখতে হবে কর্মের মূলেও কৃপাই আছে। তবে সে কৃপা গৌণ। মুখ্য কৃপার প্রকাশ তখনই হয় যখন সাধক নিশ্চিন্ত শিশুর মত দ্রষ্টাভাব নিয়ে শ্রীভগবানের চরণে স্থিতি লাভ করে।

এই প্রসঙ্গে আগমের দৃষ্টিও বিচারণীয়। আগমের দৃষ্টি অনুসারে প্রাচীন তান্ত্রিকগণ নির্দেশ করেন, সামান্য দৃষ্টিতে উপায়কে অবলম্বন করে উপেয়কে পেতে হবে। এই অভিমানেরও প্রকারভেদ আছে যেমন দেহাভিমান, প্রাণাভিমান, ইন্দ্রিয়াভিমান, বুদ্ধির অভিমান এবং মনের অভিমান প্রভৃতি। এই অভিমানের জন্যই কর্মের আবশ্যক। সেই সেই কর্ম থেকে সেই সেই অভিমান শান্ত হয়ে যায়। অভিমান শান্ত হলে প্রেরণামূলক কর্মও শান্ত হয়। তখন সাধকের জন্য বিধিনিষেধের প্রয়োজন থাকে না। প্রশ্ন উঠে এ অবস্থা কিরূপ?—এ সেই অবস্থা যে অবস্থায় জীবের অন্তঃস্থ চিৎশক্তির অনাদিকালের নিদ্রা থেকে জাগরণ ঘটে। ইহাই প্রবুদ্ধভাবের পূর্বাবস্থা। লৌকিক ভাষায় ইহার নাম কুণ্ডলিনীর জাগরণ। সংবিৎ শক্তির জাগরণ ঘটলে সাধককে নিজের দিক থেকে পরমার্থ লাভের জন্য আর কিছু করতে হয় না। অবশ্য কিঞ্চিৎ দেহাভিমান থাকার জন্য আভাসস্বরূপ কর্ম থাকে, কিন্তু তাহা নামমাত্র। শক্তি জাগরিত হয়ে ঊর্ধ্বমুখে প্রবাহিত হয় এবং সেই প্রবাহের সঙ্গে অচিৎসত্তা চিদাত্মকরূপ ধারণ করে চিৎসত্তার সঙ্গে মিলে যায়। গোমুখী থেকে গঙ্গা বরফের দুর্গ ভেদ করে যখন জলরূপে প্রবাহিত হতে সুরু করে তখন সে আপন বেগে মহাসমুদ্রের দিকে অগ্রসর হয়। সাধক জীবও তেমনি মহাশক্তির আশ্রয় নিয়ে সমুদ্রের দিকে যাত্রা করতে পারে—এইজন্য তাহাকে আলাদা চেষ্টা করতে হয় না—অর্থাৎ শক্তির ক্রিয়াতেই তখন সে ক্রিয়াশীল। এইরূপ শক্তির সঙ্গে যুক্ত হয়ে জীবরূপী আত্মা শিব অথবা ব্রহ্মরূপী সমুদ্রে পৌঁছায়—জীব শিবত্ব লাভ করে ঠিক যেমন গঙ্গা সমুদ্রে গিয়ে সমুদ্রভাবাপন্ন হয়। যেমন কনিষ্ঠ অধিকারীর জন্য আণব উপায় অবলম্বন প্রয়োজন তেমনি মধ্যম অধিকারীর জন্য শাক্ত উপায়। এই ভাব প্রকাশ করে গীতায় বলা হয়েছে—

"সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥

কিন্তু এইখানেও পূর্ণত্ব লাভ হয় না—এজন্য শাম্ভব উপায় প্রয়োজন। শিব হলেও ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণত্ব আসে না যতক্ষণ শিব হওয়ার বোধ না আসে। বোধ এলেই পূর্ণত্বে স্থিতি লাভ হয়—এখানে সত্তাও থাকে, বোধও থাকে। সত্তা বোধ হবার পর আনন্দ আসে। তাই সরল ভাষায় বলা হয় প্রথমে গুরু অথবা শাস্ত্রবিধান অনুযায়ী কর্ম করা উচিত। নিষ্কাম কর্মে এভাবে চিত্ত নির্মল হলে পরমেশ্বরী শক্তিকে আশ্রয় করে চলা উচিত। ইহারই নাম কৃপা। পরিশেষে আপন স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়ে স্বরূপবোধে স্থিত থাকতে হবে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য কৃপা এবং কর্ম—দুইই পরস্পরসাপেক্ষ। কিন্তু মনে রাখা উচিত সুরুতে কর্মের প্রাধান্য থাকে আর শেষে কৃপার। পূর্ণ স্থিতিতে কর্মেরও না কৃপারও না। কোন কোন সাধকের কর্মের পর কৃপারও অনুভব হয়, আবার কাহারও বা কৃপার প্রভাবেই কর্মে প্রবৃত্তি হয়। এই তারতম্য জন্মান্তরীণ সংস্কারের প্রভাবে ঘটে। কৃপাতেও বহুরকম তারতম্য আছে। কিন্তু মহাকৃপার ইহাই বৈশিষ্ট্য, ভগবান স্বয়ং আকৃষ্ট হয়ে ভক্তের কাছে আসেন। ছেলে কাঁদলে মাকে আসতেই হয়।

মায়া এবং প্রকৃতি ও সৃষ্টির রহস্য

পরমেশ্বরের অনন্ত শক্তি—এই শক্তি সংখ্যাহীন। কিন্তু তত্ত্ববিচারের জন্য এই শক্তির শ্রেণীভেদ মানা হয়--এই শ্রেণীভেদ হচ্ছে অন্তরঙ্গ, বহিরঙ্গ এবং তটস্থ। পরমেশ্বরের স্বরূপ সচ্চিদানন্দময় আর তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তি সচ্চিদানন্দরূপা—সদংশকে নিয়ে সন্ধিনীশক্তি, চিদংশ নিয়ে সংবিৎশক্তি এবং আনন্দাংশের সঙ্গে হ্লাদিনী শক্তি সম্বন্ধযুক্ত। এর মাঝখানে তটস্থ শক্তির স্থান। মায়া বহিরঙ্গ শক্তি। দুইয়ের মাঝখানে তটস্থ শক্তির সঙ্গে জীবের, বহিরঙ্গ শক্তির সঙ্গে জগতের আর অন্তরঙ্গ শক্তি থেকে চিদানন্দময় ধামের আবির্ভাব হয়। ইহাই মায়ার স্থূল পরিচয়।

এই প্রসঙ্গে মহামায়া এবং যোগমায়াও আলোচনীয়। যোগমায়া বস্তুত চিৎশক্তি—ইহাতে পরমেশ্বরের নিত্য লীলার ব্যাপার চলে। ইহা বিশুদ্ধরূপা। মায়ার উপরে এক মহামায়াও আছে। মায়ার নীচে প্রকৃতি। এইজন্য পরমেশ্বরের অচিৎ শক্তিকে এক দৃষ্টিকোণ থেকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়—মহামায়া, মায়া এবং প্রকৃতি। যদিও কোন কোন শ্রৌত গ্রন্থে বিশেষতঃ উপনিষদে মায়া এবং প্রকৃতিকে এক মানা হয়, কিন্তু ইহা স্থূলদৃষ্টিপ্রসূত। প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিকা। মায়াকে প্রকৃতি থেকে বিলক্ষণ মানলেও—মায়া নির্গুণ হওয়া

সত্ত্বেও মলিন। মহামায়া মায়া অপেক্ষা শুদ্ধ কিন্তু মহামায়াও অচিৎ। মহামায়াকে ভেদ করলেই মায়া থেকে মুক্তি মেলে। এই সময় দুই প্রকার পরিস্থিতি সম্ভব—এক হচ্ছে আত্মার বিশুদ্ধ কৈবল্য অবস্থা যার সঙ্গে চিৎশক্তির কোন প্রকার সম্বন্ধ নাই—ইহা চিৎস্বরূপাবস্থা। ইহার পর পরমেশ্বরের পরম অনুগ্রহ থাকলে দ্বিতীয় অর্থাৎ উন্মনী অবস্থার উদয় হয়—যে অবস্থায় আত্মা শিবরূপী হয়ে পরম শিবের স্থিতিতে অবস্থান করে। উন্মনী শক্তির আবির্ভাব হবার পর স্বতঃই তিরোভাব হয়। এর পরে আত্মার পরমেশ্বরত্ব প্রাপ্তি ঘটে।

বিবেকমার্গ অবলম্বনকারী সাধক প্রকৃতি থেকে মুক্ত হয়ে কৈবল্যাবস্থা প্রাপ্ত হন। কিন্তু মায়া এবং মহামায়ার ভেদ না হওয়ার দরুণ এই কৈবল্য ত্রিগুণাতীত হলেও নিম্নতম অবস্থা। বিবেকমার্গে যখন আত্মা মায়া থেকেও মুক্ত হয় তখন উচ্চতর কৈবল্যাবস্থা লাভ হয়। এই আত্মা প্রকৃতি এবং মায়া থেকে মুক্ত—জন্ম-মৃত্যু চক্র থেকেও মুক্ত, কিন্তু চিৎশক্তির বিকাশ না থাকার দরুণ ইহা উচ্চকোটির কৈবল্য নয়। এই অবস্থায় চিৎশক্তির উন্মেষ না থাকার জন্য আত্মার স্বরূপভূত শিবভাব অভিব্যক্ত হয় না। বিবেকমার্গের পরম লক্ষ্য উত্তম কৈবল্য লাভ যাহাতে মহামায়ারও অতিক্রমণ ঘটে। কিন্তু ইহাও পূর্ণত্ব নয়। তবে এ অবস্থায় আত্মা থেকে অচিৎ সম্বন্ধ পূর্ণরূপে বিগলিত হয়ে যায়। চিৎশক্তির উন্মেষ না থাকা সত্ত্বেও ইহা এক প্রকার নির্বাণের অনুরূপ অবস্থা। যোগমার্গ এ থেকে ভিন্ন। যথার্থ যোগমার্গ পরমেশ্বরের শক্তিলাভ ব্যতীত অর্থাৎ শুদ্ধ বিদ্যার বিনা উদয়ে পাওয়া যায় না। যোগমার্গে যোগী গুরুদত্ত মহামায়া দেহ অর্থাৎ বৈষ্ণব দেহ পায়। শুদ্ধবিদ্যা বিশুদ্ধ অহমাত্মক জ্ঞান। মায়িক জীবের জ্ঞান এই প্রকার নয় কেননা ভেদ জ্ঞানের মূলে রয়েছে মায়া। এইজন্য প্রত্যেক মায়িকজ্ঞানে ইদং ভাবের অনুপ্রবেশ থাকে। বিবেকমার্গে ইদং থেকে অহং পৃথক হয়ে যায়। ইদং অচিৎ আর অহং চিৎ। অজ্ঞানে অচিৎ অর্থাৎ দেহেন্দ্রিয় মন-বুদ্ধি প্রভৃতিতে অহং অর্থাৎ আত্মার তাদাত্ম্য বোধ হয়। বিবেক পূর্ণ হলে অচিৎভাব থেকে শুদ্ধ চিৎভাব আলাদা হয়ে যায়। এই স্থিতিতে চিদ্‌ভাবাত্মক আত্মায় অহং প্রতীতির উদয় হয় না—বোধে ইদং প্রতীতির লোপ ঘটে। কিন্তু অহং প্রতীতির উদয় হয় না। ইহাই কৈবল্য। যোগমার্গে এরূপ হয় না। ইহাতে অহং প্রতীতির ক্রমশ বিকাশ এবং ঐ ক্রমে ইদং প্রতীতির তিরোধান ঘটে। অর্থাৎ ইদং অহং-এ অনুবৃত্ত হয়। পরিশেষে যখন অহংভাব পূর্ণ হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে ইদংভাব শূন্য হয় তখন ঐ অবস্থাকে পূর্ণ-অহন্তা বলে। অর্থাৎ একমাত্র অহংই থাকে, ইদং থাকে না। ইহাই পরমেশ্বরত্বে স্থিতি। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে এই অবস্থাকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে "একৈবাহহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা।" এই

সময় বিশ্ব ইদংরূপে প্রতীয়মান হয় কিন্তু আত্মস্বরূপের সহিত অভিন্ন-রূপে এবং অহংরূপে প্রকাশমান হয়। ইহাই পূর্ণ অহংভাব—আত্মার অখণ্ড শক্তি স্বাতন্ত্র্যরূপে এবং অভেদে বিদ্যমান—ইহাই পূর্ণত্ব। যোগমার্গে এই পর্যন্ত পেঁাছানো যায়, বিবেকমার্গে নয়। এই দৃষ্টিতে দেখলে প্রতীতি হয় কি প্রকৃতি, মায়া তথা মহামায়া এই তিনের পর্যবসান পূর্ণ অহন্তারূপী সংবিৎ শক্তিতে হয়।

মায়া ভগবানের অচিন্ত্য শক্তি। ইহা অঘটনঘটন-পটীয়সী পরমেশ্বরের আপন শক্তি। ইহাই জীবরূপী আত্মাকে বিমোহিত করে রাখে। পশুরূপী জীব এই মায়ারূপ স্বশক্তিতে মোহিত হয়ে সংসারে বিচরণ করে। কিন্তু শুদ্ধ বিদ্যার প্রভাবে স্বরূপ জ্ঞান খুলে গেলে এই মায়া নিজে অধীন হয়ে আত্মার স্বাতন্ত্র্যের স্ফুরণ করে। আত্মার স্বাতন্ত্র্যশক্তি খেচরী, গোচরী, দিক্‌চরী তথা ভূচরীরূপে উহার অনুগমন করে। এই আত্মা শিবরূপী আত্মা কিন্তু পশু অবস্থায় এই স্বাতন্ত্র্যশক্তি খেচরীচক্র, গোচরীচক্র, দিক্‌চরীচক্র তথা ভূচরীচক্র হয়ে পশুরূপী আত্মাকে শৃঙ্খলিত করে রাখে। বস্তুত আত্মা আপন শক্তি থেকে (আন্তর অথবা বাহ্য) অন্য কিছুর দ্বারা অভিভূত হয় না। স্বশক্তি-তেই বিমোহিত হয়। প্রশ্ন এইঃ আত্মা স্বশক্তিতে কেন বিমোহিত হয়? ইহাই আত্মার বিশ্ব নাট্যলীলার রহস্য। আত্মা নিজেকে সঙ্কুচিত করে পশু হয় এবং মায়ার অধীন হয়ে কর্মে সংশ্লিষ্ট হয় এবং তদনুসারে সুখ-দুঃখাদি ভোগ করে। কর্ম থেকেই কারণদেহ গ্রহণ এবং ভোগ সম্পাদন দুইই হয়। অতএব কর্মের মূলে আছে মায়া এবং মায়ার মূলে আত্মার সংকোচ। আর ইহার মূলে আবার স্বাতন্ত্র্যশক্তির খেলা।

ভগবানের আনন্দ স্বরূপ থেকেই সৃষ্টি হয়। উপনিষদে বলা হয়েছে—

"আনন্দাদ্ধি খলু ইমানি ভূতানি জায়ন্তে।"

ভগবানে অনন্ত শক্তি আছে কিন্তু তার মধ্যে পাঁচ শক্তিই প্রধান। তন্ত্রের দৃষ্টিতে এই পাঁচ শক্তির মধ্যে চিৎ এবং আনন্দশক্তি অন্তরঙ্গ, ইচ্ছা, জ্ঞান এবং ক্রিয়াশক্তি বহিরঙ্গ। অন্তরঙ্গ শক্তির মধ্যেও আবার অন্তরঙ্গ এবং বহিরঙ্গ হিসেবে ভাগ করা যায়—চিৎ অন্তরঙ্গ শক্তি আর আনন্দ বহিরঙ্গ। সৃষ্টির আবশ্যকতা হলে ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ করা হয়। ইচ্ছা আনন্দশক্তিকে অবলম্বন ক'রে বীজরূপে আপন বিষয়ের রূপ ধারণ করে। ধরা যাক যোগীর ইচ্ছাশক্তি আমকে নিয়ে উৎপন্ন হয়েছে। আমের ইচ্ছার উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে অখণ্ড আনন্দ ক্ষুব্ধ হয়ে বীজরূপ আমের রূপ ধারণ করে। এই ক্ষোভ আনন্দেই হয়—চিৎ শক্তিতে নয়। এইজন্য চিৎ থেকে সৃষ্টি হয় না, আনন্দ

থেকে হয়। ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে এই বীজরূপ আম ভাবরূপে প্রকট হয়। যোগীর জ্ঞানই আমরূপ আকার ধারণ করে। কিন্তু এই জ্ঞানাত্মক আম যোগীই কেবল দেখতে পারেন, সবাইয়ের দৃষ্টিগোচর হয় না। ইহার পর জ্ঞানের থেকে ক্রিয়ার উদয় হলে জ্ঞানাত্মক আম অজ্ঞান অথবা ভাবে অর্থাৎ ক্রিয়াশক্তিতে প্রকট হয়। ইহাই বাহ্য সৃষ্টি—যাহা ইন্দ্রিয়গোচর। ইহাকে যেমন যোগী দেখেন তেমনি সবাই দেখতে পারে এবং সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে গ্রহণ করতে পারে। ইহাই পরোক্ষ সত্য—ইহাই মায়িক সৃষ্টি। ইহাতে জাগতিক দৃষ্টিকোণ থেকে কোন কোন উপাদান বিশেষরূপে বিদ্যমান থাকে তা জানবার আবশ্যকতা নেই। প্রকৃতির নিয়মানুসারে স্বতই হয়। এই প্রকারে উহার তিরোভাবও হতে পারে। ক্রিয়াশক্তির রাজ্য থেকে জ্ঞানশক্তিতে নিয়ে গেলেই তিরোভাব হয়। তিরোভাবের এই প্রক্রিয়া জ্ঞান থেকে ইচ্ছা এবং ইচ্ছা থেকে আনন্দে ক্রমশ হতে পারে। ইহাই সম্যক তিরোভাব। জ্ঞানের রাজ্যে থাকলেও যোগীর সামনে ইহা জ্ঞেয়রূপে থাকে। প্রয়োজন হলে উহা যোগী পুনরায় সৃষ্টি করতে পারেন জ্ঞান থেকে জ্ঞেয়তে নিয়ে এসে। ইচ্ছায় সংহার হলেও পদার্থের পুনরায় সৃষ্টি সম্ভব—উহাকে প্রকট করে' প্রত্যক্ষ করানো যায়। কিন্তু সংহারের এই প্রক্রিয়া ইচ্ছা থেকে আনন্দে এবং আনন্দ থেকে চিৎ পর্যন্ত যদি পৌঁছে যায় তাহলে পুনরুত্থানের সব সম্ভাবনার সমাপ্তি ঘটে।

সাধকদীক্ষা এবং যোগীদীক্ষায় পার্থক্য

অধ্যাত্মসাধনায় গুরুর স্থান অন্যতম। মাতার গর্ভে যেমন বীজরূপে সন্তান নিহিত থাকে এবং ক্রমশ বিকশিত হয়ে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পুষ্টতার সঙ্গে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, তারপর প্রসবক্রিয়া দ্বারা ভিতর থেকে বাইরে আসে এবং ইন্দ্রিয়গোচররূপে প্রকাশিত হয়, ঠিক তেমনি গুরুদত্ত বীজমন্ত্র সাধকের হৃদয়ক্ষেত্রে দীক্ষার মাধ্যমে স্থাপিত হয় এবং শিষ্য দ্বারা যথাবিধি শোধিত এবং রক্ষিত হয়ে অঙ্কুরিত হয় এবং আকার ধারণ করে, আগামী দিনে অর্থাৎ ভবিষ্যতে ঐ সাকার দেবতাময় সত্তা ইষ্ট দেবতা রূপে প্রকট হয়। ইহা প্রসবের অনুরূপ ব্যাপার—ইষ্টসাধনার ফল। দীক্ষার পর গুরুর প্রদত্ত কর্ম যথাশক্তি সম্পাদনে ক্রমশ জ্ঞান এবং জ্ঞান থেকে ভক্তির আবির্ভাব হয়। সাধারণ জগৎ-প্রসিদ্ধ শুষ্ক জ্ঞানের সঙ্গে ভক্তির কোন সম্বন্ধ হয় না, কেবল শাস্ত্রজনিত জ্ঞানেরও বিশেষ মূল্য নেই—উহা থেকে অপরোক্ষ জ্ঞানের উদয় হয় না। প্রকৃত জ্ঞানের উপলব্ধি গুরুপ্রদত্ত কর্ম থেকেই হয়।

সদ্‌গুরু শিষ্যের আধার বুঝে দীক্ষা দেন। তিনি শিষ্যের আধারের যোগ্যতা এবং প্রকৃতিগত বিলক্ষণতা দেখে যোগশিক্ষা প্রদান করেন। আধার দুর্বল হলে দীক্ষাদান হয় না। যোগী তথা সাধকের অধিকার নির্ণয় জন্ম থেকেই হয়। জীব ক্ষণে জন্মালে যোগী আর কালে জন্মালে সাধক হয়। ক্ষণে জন্মালেও অধিকারের তারতম্য থাকে।

সাধকদীক্ষা আর যোগদীক্ষায় পার্থক্য আছে। দুই দীক্ষারই ফলে কুণ্ডলিনীর জাগরণ ঘটে। শিষ্যের আপন প্রচেষ্টায়ও কুণ্ডলিনীর জাগরণ হতে পারে কিন্তু তাহা বড় কঠিন। সাধকের দীক্ষায় এতখানি শক্তির সঞ্চার হয় যার সঙ্গে পুরুষকারের যোগ হলে কুণ্ডলিনী জাগে, কুণ্ডলিনী এক শক্তিময় জ্যোতি। এই শক্তিময় জ্যোতি সাধকের জন্য এক স্থিতিতে থাকে আর যোগীর জন্য ভিন্ন স্থিতিতে। দীক্ষার পরে গুরুপ্রদত্ত নিত্যকর্ম করতে করতে জাগ্রত শুদ্ধ তেজ ক্রমশ প্রজ্বলিত হয় এবং সাধকের সত্তায় বাসনা সংস্কারাদির মায়িক আবরণ ভস্ম করে দেয়। এইপ্রকারে সাধকের ক্রমশ উৎকর্ষ লাভ ঘটে। পরিশেষে সিদ্ধাবস্থায় সমস্ত বাসনার ক্ষয় হয় এবং পূর্বোক্ত জাগ্রত কুণ্ডলিনী শক্তি ইষ্টদেবতারূপে অপরোক্ষভাবে প্রকট হন। কিন্তু ঐ সময় সাধকের দেহ থাকে না, দেহাবস্থায় সিদ্ধি প্রাপ্ত হয় না। সিদ্ধির আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে দেহান্ত হয়।

যোগীর আধার ইহা থেকে বিলক্ষণ বা ভিন্ন। সদ্‌গুরু দীক্ষাক্রমেই কুণ্ডলিনী জাগিয়ে দেন। কিন্তু এই স্থিতিতে কেবলমাত্র জ্যোতিরূপে প্রকাশিত হয় না যেমন সাধকের ক্ষেত্রে ঘটে। কুণ্ডলিনী শক্তি সাকার পরি-নিষ্পন্ন রূপ নিয়ে আবির্ভূত হয়। সাধক সমস্ত সাধনজীবনের শেষে যে ইষ্টরূপ সাক্ষাৎকার করেন যোগীর ক্ষেত্রে উহা শুরুতেই হয়। ইহার অতিরিক্ত সাধকের কর্ম থেকে যোগজাগত কর্মেও বিলক্ষণতা বা বিশেষতা থাকে। সাধক জ্যোতিকে ইষ্টরূপে আপন কর্ম দ্বারা পরিণত করে নেন কিন্তু যোগী আপন কার্য দ্বারা সাকার ইষ্টরূপের আরাধনা শুরু করেন। সাধকের বাসনাও দগ্ধ হয়ে যায়। এই কারণে নিরাকার জ্যোতির উপাসক থাকে কিন্তু যোগীর সামর্থ্য অধিক। তাই তাকে বাসনাদি ত্যাগ করতে হয় না। যোগী বাসনাদিকে নির্মল করে' আপন স্বরূপের সঙ্গে যুক্ত করে' নেন ইহাই যোগ। এইজন্য তিনি দেহে থেকেও সাকার ইষ্টরূপের দর্শন করতে পারেন। যোগী পূর্ণ যোগসিদ্ধ হলে মহাজ্ঞানের অধিকার পান। ঘর্ষণে যেমন অগ্নি উৎপন্ন হয় তেমনি যোগকর্মরূপ ঘর্ষণে চিদগ্নি উৎপন্ন হয়। ইহাই জ্ঞানাগ্নি। এই জ্ঞানে শুষ্কতা থাকে না, কেননা ইহার প্রভাবে পূর্ণ ভগবৎ সত্তার প্রকাশ হয় এবং জীব পরাভক্তির স্তরে উন্নীত হয়। জ্ঞান থেকে ভক্তির উৎপত্তির ইহাই রহস্য।

সংসারে প্রচলিত ভক্তি উন্মাদিনী ভক্তি। যোগী যে ভক্তিকে মানে তার সঙ্গে জ্ঞানের কোন বিরোধ নেই। এই ভক্তির পরিপক্ক অবস্থাই প্রেম—ইহাই সাধন জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশ। এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত এই যে যোগী গুরু কৃপার প্রভাবে সাধন ক্রিয়ার ফলরূপে বিভিন্ন প্রকারের বিভূতি প্রাপ্ত হন, ইহাকে যোগবিভূতি বলে। যথার্থ যোগী ঈশ্বর—যাঁর অধীনে অচিন্ত্য শক্তি-স্বরূপিনী মায়া। এইজন্য ঈশ্বরত্ব লাভ করলে যোগীর আদর্শ পূর্ণ হয়। তখনই তিনি অলৌকিক শক্তির অধিকারী হন। এর মধ্যে তিন শক্তিই প্রধান—ইচ্ছা, জ্ঞান এবং ক্রিয়া। জ্ঞানশক্তি পূর্ণ হলে যোগী সর্বজ্ঞ তথা ক্রিয়ার প্রভাবে সর্বকর্তা হয়ে যান। জ্ঞান এবং ক্রিয়ার সমন্বয়ে বিজ্ঞানশক্তির আবির্ভাব হয়। এই বিজ্ঞানশক্তির সাহায্যে যোগী সৃষ্টি প্রভৃতি কার্য করতে পারেন। বিজ্ঞানশক্তির মূলে প্রকৃতির প্রাধান্য স্বীকার, কেননা প্রকৃতি থেকে কার্য উৎপন্ন করার জন্য উহার ক্রম জ্ঞানশক্তি থেকে ক্রিয়াশক্তি দ্বারা অনুসরণ করতে হয়। কিন্তু ইচ্ছাশক্তি এইপ্রকারের নয়—ইচ্ছার প্রভাবে যোগী যে কোন প্রকার কার্য করতে পারেন, যে কোন প্রকার জ্ঞেয় (জিনিষ) জানতে পারেন। এজন্য সেখানে জ্ঞানশক্তির আবশ্যকতা থাকে না। ইচ্ছাশক্তির উদয়ে জ্ঞানের প্রয়োজন থাকে না কিন্তু কার্য হয়। ক্রিয়ার প্রয়োজন থাকে না কিন্তু কার্য হয়। ইহার পরে যোগী ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন হয়ে সমস্ত ঐশ্বরিক কার্য প্রয়োজন অনুসারে করেন এবং করতে পারেন। ইহার পর এক সময় আসে যখন ইচ্ছা-শক্তি মহাইচ্ছায় অর্পণ করতে হয় তখন সমস্ত অপরিচ্ছিন্ন আনন্দস্বরূপে স্থিতি হয়। সেই স্থিতিতে যোগীকে কোন কার্যের জন্য ইচ্ছা করতে হয় না—সব কার্যই মহাইচ্ছায় হয়ে যায়, যোগী নিরন্তর পরমানন্দে ডুবে থাকেন। কিন্তু আনন্দেও এক প্রকারের তরঙ্গ থাকে, কেননা অনুকূল ভাবে আনন্দ এবং প্রতিকূল ভাবে দুঃখ হয়। যোগী যখন অনুকূল-প্রতিকূলের দ্বন্দ্ব পরিত্যাগ করেন তখন চিৎশক্তিতে আরূঢ় হন, ইহাই পরাশক্তির বাহ্যস্বরূপ যাহাকে অবলম্বন করলে সমগ্র বিশ্বের ভান হয়। এই অবস্থায় স্থিত হবার পর কোন কর্ত্তব্য অবশিষ্ট থাকে না। তখন যোগী নিত্যলীলায় মগ্ন থেকেও একদিকে নিত্য উদাসীন আর অন্যদিকে পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য এবং কর্তৃত্বশক্তিসম্পন্ন থাকেন।

কৌলিক দৃষ্টিতে শক্তির বিকাশক্রম

শাক্ত সম্প্রদায় অদ্বৈতবাদী। শাক্তদের মধ্যে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ আছে, কিন্তু তার মধ্যে কুলাম্নায় দৃষ্টিই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই দৃষ্টি অনুসারে বিশ্বের ঊর্ধ্বে যে পরম সত্তা আছে উহা অকুল নামে প্রসিদ্ধ। ইহা অনন্ত মহাসমুদ্র। ইহাতে তরঙ্গের উন্মেষ না থাকাকালীন অবস্থায় বিশ্ব তিরোধান দশায় অবস্থান করে। পরমেশ্বরের মুখ্য পঞ্চকৃত্যের মধ্যে তিরোধান আর অনুগ্রহই প্রধান। তিরোধান অবস্থায় আপন স্বরূপ গোপন থাকে আর উহার পৃষ্ঠভূমিতে প্রমাতা-প্রমেয়াদি সমন্বিত সমগ্র বিশ্বের উদ্ভব হয়। ইহার পর যতদিন বিশ্বের উপসংহার না হয় ততদিন বিশ্বলীলা চলে। পরিশেষে অনুগ্রহশক্তির সঞ্চার হবার পর তিরোধান শক্তির কার্য সমাপ্ত হয় এবং বিশ্ব পূর্ণস্বরূপে প্রত্যাহৃত হয়।

এই অকুল সমুদ্র অনন্ত অপার বোধরূপ বুঝতে হবে। ইহাতে যতদিন তিরোধান শক্তির খেলা চলে ততদিন তরঙ্গের উন্মেষ হয় না। কিন্তু যখন ঊর্মি অথবা তরঙ্গের উন্মেষ হয় তখন বুঝতে হবে তিরোধানশক্তি নিবৃত্তির মুখে। এই ঊর্মি তরঙ্গ অনুগ্রহাত্মক। ইহা স্পন্দরূপ। যে জীব অথবা পশু আত্মা ইহার সংস্পর্শ পায় উহার অনাদি সংসার জীবনে পরিবর্তন আরম্ভ হয়। এই পরিবর্তন ক্রমশ সংঘটিত হতে হতে উহাকে পূর্ণ এবং পরমস্থিতিতে পৌঁছে দেয়। এই স্পন্দ বোধসমুদ্রের এক তরঙ্গমাত্র—ইহা চিৎশক্তির উন্মেষ বুঝতে হবে। এই চিৎশক্তি জাগ্রত হয়ে সমগ্র সংসার এবং উহার মূলীভূত অবিদ্যার কার্য বিকল্পের অবসান (নাশ) ঘটায়।

জীব অথবা পশু অনাদিকাল থেকে বিকল্প রাজ্যে বাস করছে। যখন উন্মেষপ্রাপ্ত চিৎশক্তি অনুগ্রহের সময় জীবকে স্পর্শ করে তখন জীবের বিকল্প দৃষ্টি বদলাতে আরম্ভ করে আর (উহার) সত্তায় পরিবর্তন সংঘটিত হতে থাকে। চিৎশক্তি জাগ্রত হয়ে সর্বপ্রথম কালকে গ্রাস করতে আরম্ভ করে কেননা কালই জীবে বিকল্পের জনক। এইজন্য এই শক্তিকে কালসংকর্ষিণী নামে বর্ণনা করা হয়। কালের গ্রাস সম্পন্ন হয়ে গেলে জীব বিকল্পের অধীন থাকে না। কিন্তু এই ব্যাপার সাধারণত ক্রমশ ঘটে। এই ক্রমিক শুদ্ধি ব্যাপারে জীব সর্বপ্রথম প্রমেয় শুদ্ধি অনুভব করে। যতদিন প্রমেয় শুদ্ধি না হয় ততদিন জীবের রূপান্তর হওয়া সম্ভব নয়। প্রমেয় শুদ্ধির সাধারণ লক্ষণ এই যে বিরাট বিশ্ব তখন আপনার বাহিরে প্রতীত হয় না। দেহ থেকে আত্মা পৃথক এই বোধ এলে বিশ্ব বাহ্যরূপে প্রতীত হয় না—ইহারই নাম প্রমেয়-শুদ্ধি। বাহ্য আভাসের নিবৃত্তিই ইহার লক্ষণ।

প্রমেয়শুদ্ধি হলে বাহ্য জগৎ থাকে না। ইহার অর্থ এই নয় যে বাস্তবে বাহ্য জগতের অস্তিত্ব থাকে না—জগৎ থাকে, উহার বোধও থাকে—বাহ্যরূপে নয়, আপন অন্তরে এইরূপ মনে হয়। যেমন দর্পণে প্রতিভাসমান পদার্থ দর্পণ থেকে অতিরিক্ত মনে হলেও বস্তুত উহার অতিরিক্ত নয়—দর্পণেই বিদ্যমান, তেমনি চিৎশক্তির প্রথম উন্মেষ অথবা জাগরণে জগতের বাহ্য আভাস নিবৃত্ত হয়ে যায়। প্রমেয়ের বোধ থাকে কিন্তু বাহ্যরূপে নয়। জাগ্রত চিৎ-শক্তি বুভুক্ষুস্বরূপ—সর্বপ্রথম বাহ্যজগৎকে আত্মসাৎ করে। ইহা অনুগ্রহ শক্তির প্রথম নিদর্শন, যে বিষয়ে ভগবান শংকরাচার্য বলেছেন—

"বিশ্বং দর্পণদৃশ্যমাননগরীতুল্যং নিজান্তর্গতম্
মায়য়া বহিরিব উদ্ভূতম্।"

অতএব সিদ্ধান্ত এই যে, চিৎশক্তি বাহ্যজগৎকে গ্রাস করে' আপন অন্তরে নিয়ে আসে, প্রমেয়রূপী জগতের লোপ ঘটে না পরন্তু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়রূপে প্রতিভাত হয় না—আত্মার স্বরূপের অন্তর্গতরূপে প্রতিভাত হয়।

বিসর্গ শক্তিতে বিশ্ব আত্মস্বরূপের বাহিরে প্রতিভাসমান হয়, আর বিন্দুর প্রভাবে ভিতরে আসে। এইপ্রকারে চিৎশক্তি বিষয়রূপে বাহ্যজগৎকে গ্রহণ করে' তৃপ্ত হয়। এই প্রক্রিয়ায় বিষয়ের বিষয়ত্ব নিবৃত্ত হয়ে যায়। উহার ফলে বিষয়ভোগ আর থাকে না। তখন বিষয়জ্ঞান রাগাত্মকরূপ ধারণ করে। এই স্থিতিতে বিষয়জ্ঞান রাগরূপ হয়ে যায় অর্থাৎ বিষয়ভোগই রাগরূপ হয়ে যায় যাকে পরাশক্তি নির্বিকল্পভাবে অনুভব করে। জাগ্রত চিৎশক্তির বিকাশে ইহাই প্রথম স্তর। ইহারই নাম প্রমেয়শুদ্ধি। ইহা পশু অথবা বদ্ধজীবের ভোগ নয়। তান্ত্রিক দৃষ্টিতে ইহা বীরের ভোগ—ইহাই যথার্থ ভোগ। ইহা তুরীয় দশার স্বরূপ। জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি—তিন স্থিতিতে এই ভোগের নিবৃত্তি হয় না। এই ভোক্তার নাম 'বীরেশ্বর' অথবা 'মহাবীর'। শিবসূত্রে এই কারণে বীরেশ্বরকে 'ত্রিত্রয় ভোক্তা' বলা হয়েছে। আর পৃথক পৃথক দশার ভোক্তার নাম 'পশু'। ইহাই যথার্থ ভগবদ্ অর্চনা। এই সময় প্রত্যেক ইন্দ্রিয় দিয়ে ভগবানের পূজা হয়। অর্থাৎ জাগতিক স্থূলদৃষ্টিতে যাহার নাম চক্ষুর দ্বারা রূপদর্শন অথবা শ্রোত্র দ্বারা শব্দশ্রবণ এই সবই ভগবদ্ উপাসনাস্বরূপ—পূজাস্বরূপ। বীরেশ্বর অথবা বীরেন্দ্রের ভোগ যথার্থ ভগবদ্ উপাসনা যা সর্বাবস্থায় অবিচলিত থাকে।

শংকরাচার্য এই স্থিতিকে লক্ষ্য করে বলেছেন—

"যদ্যৎ কর্ম করোমি তত্তদখিলং শম্ভো তবারাধনম্।"

এই অবস্থায় প্রতি কর্ম আরাধনাস্বরূপ।

এই বীরভোগ সমাপ্ত হবার পর তৃপ্তির উদয় হয়। এর পরে অন্তর্মুখ-দশার আবির্ভাব হয়। ইন্দ্রিয়বর্গ বিষয়ভোগের পর তৃপ্ত হয় এবং চিদাকাশ-রূপী ভৈরবনাথের সঙ্গে আলিঙ্গিত হয়ে অভিন্নতা প্রাপ্ত হয়। (ইন্দ্রিয়বর্গে যতদিন বিষয়ভোগের আকাঙ্ক্ষা বিদ্যমান থাকে ততদিন এইপ্রকার আলিঙ্গিত দশার উদয় হতে পারে না।) এইসময় বিষয়ভোগ তো থাকেই না এবং তার আকাঙ্ক্ষাও থাকে না। করণবর্গ প্রমাতৃস্বরূপে প্রবিষ্ট হয় অর্থাৎ প্রমাতার সঙ্গে পৌঁছে যায়। এই পরিস্থিতিতে প্রাণায়ামের ক্রিয়া থাকে না অর্থাৎ শ্বাসপ্রশ্বাস থাকে না। পক্ষান্তরে প্রমাণ এবং প্রমেয়ের সম্বন্ধ থাকে না। প্রকারান্তরে বলা যায় সেই সময়ের জন্য মন তথা প্রাণের ক্রিয়া নিবৃত্ত হয়ে যায়।

প্রমাতা মূলে একই—ঐ পরপ্রমাতা। পরাসংবিৎ উহারই স্বরূপ। পূর্বে যে স্থিতির বর্ণনা করা হয়েছে প্রাচীন আচার্যগণ উহাকে মহাযোগের স্থিতি বলেন যে স্থিতিতে সূর্য তথা চন্দ্র দুইই অস্তমিত। চন্দ্র (মন) অর্থাৎ প্রমাণ-প্রমেয়ের সংঘর্ষ, সূর্য (প্রাণ) অর্থাৎ প্রাণাপানের সংঘর্ষ। তৎকালের জন্য জ্ঞান এবং ক্রিয়া দুইই অস্তমিত হয়ে যায়। ইহা সাময়িক স্থিতি। এই স্থিতিতে প্রমাণ-প্রমেয় মিশে এক হয়ে যায় এবং প্রমাণ প্রমাতায় গিয়ে লীন হয় অর্থাৎ ত্রিপুটির ভেদবোধ থাকে না। এই প্রকার ৭২ হাজার নাড়ী থেকে শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া নিবৃত্ত হয়ে যায় এবং প্রাণাপান সে সময় সাম্য প্রাপ্ত হয়। ইহারই নাম আধ্যাত্মিক শিবরাত্রি। শিবরাত্রিতে জাগবার নিয়ম আছে। এই অবস্থায়ও যোগীকে জেগে থাকা উচিত অর্থাৎ স্বরূপানুসন্ধানে লেগে থাকা উচিত। ইহা যোগীর পরীক্ষার স্থান। পূর্ণস্থিতি থেকে অভিন্ন হয়েও ইহা অভিন্ন নয়। কেননা ইহা থেকে চ্যুতি ঘটতে পারে। স্বরূপানু-সন্ধান না থাকলে এই অবস্থায় মহামায়ায় পতন হয়ে যায় কিন্তু স্বরূপানু-সন্ধান অক্ষুণ্ণ থাকলে যোগী নিরাবরণ প্রকাশরূপ পরাসংবিৎ পর্যন্ত উঠতে পারেন। নিরাবরণ প্রকাশের উদয়ই জীবের পরম লক্ষ্য। যে অবস্থাকে আধ্যাত্মিক শিবরাত্রি বলা হয়েছে উচ্চকোটির যোগীগণ তাহাকে 'অনাখ্যা দশা' বলে বর্ণনা করে থাকেন। এই অবস্থায় নিরাবরণ প্রকাশ পর্যন্ত বিকাশ হলে ইহা 'ভাসা'রূপে আত্মপ্রকাশ করে।

অনাখ্যা থেকে ভাসায় যাবার জন্য কয়েকটি ভূমি আছে। সর্বপ্রথম প্রমেয়ের সংস্কার নিবৃত্তি হওয়া উচিত। কিন্তু প্রমেয়শূন্য প্রমাণভাবে স্থিতি হয়। এই স্থিতিতে পূর্ণ সিদ্ধ হলে প্রমাতৃভাবে প্রবেশ হয়। প্রমাতৃভাবেও অবান্তর বিশেষ আছে। অন্তিম স্থিতিতে পরপ্রমাতৃভাবের উদয় হয়। ইহাই পরম-শিবের দশা। এই উর্দ্ধ্বগতিতে প্রমাতা উত্তরোত্তর বিভিন্ন অবস্থা লাভ করে। আদিত্যাবস্থা, রুদ্রাবস্থা, ভৈরবাবস্থা ক্রমশ উদিত হয়। ইহার অর্থ প্রমেয়-

নিবৃত্তির পর করণরূপী প্রমাণে প্রবেশ এবং অন্তে কর্তৃরূপী প্রমাতায় প্রবেশ। এই ঊর্দ্ধ্বগতির প্রভাবে যখন রুদ্রাবস্থার পরে ভৈরবাবস্থার আবির্ভাব হয় তখন প্রথমে মহাকাল ভৈরবের উদয় হয়। ইহার পর কালসংকর্ষণ ব্যাপার পূর্ণ হবার পর বিশ্বজননী তথা জগদম্বা পরাসংবিতের আবির্ভাব হয়। ইহাই পরপ্রমাতৃরূপাবস্থা। পরম শিবাবস্থা ইহারই নামান্তর। পরাসংবিতের দুই প্রকার স্থিতি—এক কৃশ আর দ্বিতীয় পূর্ণ। যেমন কালচক্রে প্রতিমাসে শুক্ল-পক্ষ এবং কৃষ্ণপক্ষের আবর্তন হয় তেমনি পরমস্থিতিতেও এক কৃষ্ণপক্ষরূপ অবস্থা আছে। ইহা মহাশক্তির কৃশদশা তথা শুক্লপক্ষের অনুরূপ পূর্ণ দশা। কৃশ অবস্থায় কলারূপ মহাশক্তি প্রায় নিবৃত্ত হয়ে যায়, একমাত্র অমাকলা থাকে। শেষে সব কলার অবসান হয়। পূর্ণাবস্থায় সব কলার পূর্ণরূপে বিকাশ হয়। চিৎকলা অথবা চিৎশক্তির পূর্ণ বিকাশ হবার পর মহাশক্তির পূর্ণ জাগরণ হয়েছে বুঝতে হবে।

প্রমেয়শুদ্ধির পরে প্রমাণশুদ্ধি এবং তারপরে প্রমাতৃশুদ্ধি সম্পন্ন হবার পর এই পূর্ণদশার আবির্ভাব ঘটে। জ্ঞানমার্গীর বিভিন্ন প্রকার সাধক শক্তি-হীন ব্রহ্মস্বরূপের প্রাপ্তির জন্য আকাঙ্ক্ষা করেন। এই শক্তিহীন ব্রহ্ম জাগতিক দৃষ্টিতে শক্তিহীন হলেও বস্তুত নিষ্কল নয় কেননা অমাকলা উহাতে নিত্য বর্তমান থাকে। কৌলমার্গীয় অদ্বৈত শক্তিসাধক ব্যতীত মহাশক্তির পূর্ণ-দশার বিবরণ অন্য কেহ দিতে পারেন না। জাগরণের পূর্ণদশায় সবকিছু চিন্ময় হয়। প্রমেয়শুদ্ধি থেকে বাহ্যজ্ঞানের চিন্ময়ত্বের সূচনা মেলে। এই-প্রকার প্রমেয়ের অনুরূপ প্রমাণ তথা প্রমাতার ভেদও যখন শুদ্ধ হয় তখন পূর্ণ জাগ্রত দশার উদয় ঘটে। ইহাই মহাশক্তির পূর্ণাবস্থা। (জাগরিত)

ইহা বুঝবার পর মহাকালের সঙ্গে মহাশক্তির সম্বন্ধ জানা যায়। কালের উপরে মহাকাল, মহাকালের উপরে সংবিৎ স্বয়ং আছেন। শেষে কালের নিবৃত্তি হয়, এমনকি মহাকালেরও নিবৃত্তি হয়—ইহাই পূর্ণত্ব।

ধ্যানযোগ এবং প্রেমসাধনা

স্থূল দৃষ্টিতে যোগ দুই প্রকার—ক্রিয়াযোগ আর সমাধিযোগ। ধ্যান-যোগও সমাধিযোগের অন্তর্গত। ক্রিয়াযোগের তিন অংশ—তপস্যা, স্বাধ্যায় আর ঈশ্বরপ্রণিধান। সংক্ষেপে তপস্যার তাৎপর্য এইঃ যথাসম্ভব সাবধান-তার সঙ্গে শরীর, মন প্রভৃতির কষ্ট সহ্য করার অভ্যাস—উদ্দেশ্য দেহ, মন প্রভৃতিকে শুদ্ধ করা যাতে অন্তর্মুখ হয়ে ধ্যান-সমাধির উপযোগী হয়। কষ্ট সহ্য করা তপস্যা নিশ্চয়ই কিন্তু এত অধিক কষ্ট হওয়া উচিত নয় যা দেহের

সহ্যের বাইরে যায়। তপস্যার প্রভাবে শরীর শুদ্ধ হয়, মনও শুদ্ধ হয়। স্বাধ্যায়ের অর্থ সদ্‌গ্রন্থসমূহের অধ্যয়ন, বিশেষ করে গুরুদত্ত মন্ত্রের জপ। সব মন্ত্রই মূলে প্রণব থেকে উদ্‌ভূত, প্রণব ঈশ্বরবাচক। ইহা যথাবিধি জপ করলে ঈশ্বর সাক্ষাৎকার হয়। ঈশ্বরপ্রণিধানের অর্থ ঈশ্বরে চিত্ত লাগিয়ে রাখা। ব্যবহারভূমিতে ইহার দুইটি রূপ—প্রথম কর্তব্য কর্ম করা এবং তার ফল জগদ্‌গুরুরূপী পরমেশ্বরে অর্পণ করা। অধিকার প্রাপ্ত হলে ইহার স্বরূপ কিছু বদলে যায়—ঐ সময় ঈশ্বরপ্রণিধানের তাৎপর্য পরমাত্মাতে কর্মফল অর্পণ না করে স্বয়ং কর্মকে অর্পণ করা—ইহা দ্বিতীয়রূপে শ্রেষ্ঠ ক্রিয়াযোগ। ক্রিয়াযোগ প্রারম্ভিক সাধন। ইহা অভ্যাসের ফলে চিত্ত অন্তর্মুখ হয় এবং ক্লেশের পাক হয়।

ধ্যানযোগ অথবা সমাধিযোগ ইহার উপরের অবস্থা। সমাধি ধ্যানের পরিপক্ক অবস্থা। এখানে স্মরণ রাখা উচিত, সমাধি হলেই যোগ হয় না। অর্থাৎ সমাধিমাত্রই যোগপদবাচ্য নয়। চিত্ত যতক্ষণ একাগ্রভূমিতে প্রতিষ্ঠিত না হয় ততক্ষণ সমাধি যোগ অবস্থা পর্যন্ত পেঁাছতে পারে না; ক্ষিপ্ত, বিক্ষিপ্ত এবং মূঢ়ভূমিতে সমাধির আধ্যাত্মিক উপযোগ হয় না। ইহার কারণ এই ঐ সকল ভূমিতে রজোগুণ এবং তমোগুণের প্রাধান্য থাকে। বিক্ষিপ্ত ভূমিতে লেশমাত্র সত্ত্বগুণ থাকে অবশ্য কিন্তু উহা যোগের উপযুক্ত নয়। চিত্তের ভূমি যখন একাগ্র থাকে তখন বৃত্তিও যদি একাগ্র হয় ঐ অবস্থাকে যোগের সংজ্ঞা দেওয়া চলে। বৃত্তির একাগ্রতা নানাপ্রকার হতে পারে। আমেরিকা প্রভৃতি দেশে ওষুধ দিয়ে চিত্তকে একাগ্র করার ব্যবস্থা হয়েছে। গাঁজা, ভাংগ খেলেও চিত্ত বৃত্তিশূন্য তথা স্তব্ধ হয়ে যায়। দ্রব্যগুণে আকস্মিকভাবে বৃত্তি একাগ্র হয়ে যায়। কিন্তু ইহা যোগ নয়, কেননা ভূমিতে একাগ্রতা নেই। যোগের প্রাপ্তির পূর্বে অযোগ অথবা পৃথকত্ব এবং পরে বিয়োগজন্য আকুলতার অনুভব অনিবার্য। যান্ত্রিক সাধনায় নিয়োজিত ভূমির একাগ্রতা কুযোগ মাত্র—যোগ নয়। কারণ ঐ স্থিতিতে একাগ্রতার প্রাপ্তিভাব না হয়ে দ্রবীভূত মাত্র হয়। এই দশায় অভাববোধ না থাকায় সর্বব্যাপক হলেও পরমতত্ত্বের সাক্ষাৎকার হয় না। ইহার জন্য আধারের শুদ্ধতা প্রয়োজন। ক্রিয়াযোগের দ্বারা ক্লেশাদি সংস্কারের 'তনূকরণ' অর্থাৎ ক্ষীণকরণ অথবা পাক হয়—তারপর প্রসংখ্যান যোগলব্ধ জ্ঞানে ক্লেশ দগ্ধ হয়ে যায়। ক্রিয়াযোগের লক্ষ্য পূর্ণ না হলে সমাধিযোগের পূর্ণ ফল লাভ সম্ভব হয় না।

প্রত্যেক সাধনার যে স্বাভাবিক পথ তাহাই শ্রেষ্ঠ। কৃত্রিম উপায়েও কর্ম, জ্ঞান এবং প্রেম অথবা ভক্তির সাধনা হয়। কিন্তু তাহা আভাসরূপ মাত্র।

যথার্থ প্রেমসাধনার জন্য প্রথমে ভাব-সাধনা আবশ্যক। ভাব-সাধনা স্বভাবের সাধনা। শাস্ত্রের কোন বিধি-নিষেধ ইহাতে থাকে না। যতদিন মায়িক দেহে অভিমান থাকে ততদিন প্রেমসাধনা তো দূরের কথা, ভাবসাধনাও সম্ভব নয়। ভাব মানে স্বভাব। মায়ার আবরণে আমাদের স্বভাব আচ্ছন্ন হয়ে আছে। সর্বপ্রথম এই আচ্ছাদন তথা আবরণকে সরাতে হবে। ইহার জন্য নানা উপায় বিদ্যমান—তার মধ্যে মন্ত্রশক্তিই প্রধান। প্রথমে নামসাধন অথবা অন্য প্রকারের কোন সাধনা করে চলা উচিত যতদিন সদ্‌গুরু প্রাপ্তি না হয়। এই প্রারম্ভিক সাধনা যথার্থ সাধনা নয় কেননা যতদিন সদ্‌গুরুর কৃপা না হয় ততদিন অন্তরাত্মাতে প্রবেশ হয় না। নিরন্তর নাম জপে অথবা প্রকারান্তরেও সদ্‌গুরুর কৃপা হয়। গুরুপ্রাপ্তি হলে মন্ত্রাদির কোন ক্রমে দীক্ষা হয়। দীক্ষার পরে কোন কোন প্রকারের উপাসনার কার্য চলে। উপাসনায় ভৌতিক দেহের শুদ্ধি হয়, চিত্তেরও। ঐ শুদ্ধির প্রভাবে মায়ার আবরণ সরে যায়। এই আবরণে প্রত্যেক আত্মার আপন ভাব অথবা 'স্বভাব' ঢাকা আছে। আবরণ সরলেই 'নিজভাব' খুলে যায়। ইহারই নাম স্বভাবপ্রাপ্তি। গুরু, শাস্ত্র, উপদেশ, দৃষ্টান্ত প্রভৃতি সবই এই আবরণ অপসারণের জন্য। আবরণ সরলে কি হবে? এর উত্তর গুরুর নিকট অথবা শাস্ত্রে পাওয়া যায় না। ইহা অভাবাত্মক ব্যাপার আর নিজভাব খুলে যাওয়া ভাবাত্মক। এই ভাব প্রত্যেক আত্মার আলাদা আলাদা।

ভাবের বৈশিষ্ট্য দুই প্রকারের—এক ভাবের আশ্রয় অথবা আধার (সাব্‌জেক্ট) এবং দ্বিতীয় বিষয় (অব্‌জেক্ট)। ভাব আশ্রয়ে বিষয়কে অবলম্বন করে স্ফুরিত হয়। ভাবের যে আশ্রয় উহারই নাম ভক্ত। এই ভক্ত দেহধারী আত্মা। কিন্তু এই দেহ মায়িক দেহ নয়, স্থূল দেহ নয়, সূক্ষ্ম দেহ নয় এবং কারণ দেহও নয়। এই জন্য বলা হয় বস্তুত এই ভাবদেহ মায়িক নয়।

দেহ থাকলে আত্মার উহাতে অভিমান হয়। যেমন আত্মার স্থূলদেহে অভিমান থাকে তেমনি ভাবের জাগরণের পরে ভাবদেহে অভিমান হয়। এই স্থিতিতে সাধকের স্থূলদেহ কোন প্রকার বিক্ষেপ সৃষ্টি করতে পারে না। যদি করে তবে বুঝতে হবে জাগতিক ভাব শুদ্ধ হয়নি। উদাহরণস্বরূপ একজন অশীতিবর্ষ বৃদ্ধের ভাবদেহ ১০ বৎসরের বালকের অনুরূপ হতে পারে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা চলে, বৃদ্ধ যখন মায়ের উপাসনা করে তখন ভাবরূপে শিশু হয়ে যায়। এ ভাবদেহ অমূর্ত নয়, আকারবিশিষ্ট। এই আকারে আত্মার অহংরূপে অভিমান হয়। যতদিন ভাবদেহে অভিমান না হয় ততদিন ভাবসাধনা সম্ভব নয় কেননা ইহা বিচারের বিষয় নয়। ভাবদেহ প্রাপ্ত হলে যেমন একপক্ষে ভাবুক তথা ভক্তের স্বাভাবিক স্ফুরণ হয় তেমনি কোন না কোন সময় পক্ষান্তরে ভাবের বিষয়ও আবির্ভাব হয়। ভাবের আশ্রয়রূপে ভাবদেহ প্রকট হলে সঙ্গে সঙ্গে ধাম প্রভৃতিরও প্রাকট্য ঘটে। কিন্তু ভাবের পরিপক্কতা না হলে বিষয় প্রকটিত হয় না। ভাবের পরিপক্কতার উপায় ভাব-সাধনা।

ভাব পরিপক্ক হলে প্রেমে পরিণত হয়। ইহার স্থিতি ফুলের সুগন্ধের সঙ্গে তুলনীয়। এই সুগন্ধ যখন রসের রূপ ধারণ করে মকরন্দ মধুতে পরিণত হয়, তখনই প্রেমপদবাচ্য হয়। ফুলের মধুর আবির্ভাব হলে মৌমাছিকে আকর্ষণ করতে হয় না, আপনাআপনি আসে, তেমনি ভাব প্রেমে পরিণত হলে ভগবৎ স্বরূপ স্বতই আবির্ভূত হয়, তাঁকে আবাহন করতে হয় না। ক্রিয়াত্মিকা ভক্তি থেকে ভাবভক্তির ইহাই বৈশিষ্ট্য ক্রিয়াত্মিকা ভক্তিও যতক্ষণ ভাবরূপে পরিণত না হয় এবং ভাবের যতক্ষণ পরিপাক না হয় ততক্ষণ ভাবের বিষয় শ্রীভগবানের দর্শন মেলে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ যদি মাতৃভাব নেওয়া যায় তবে বুঝতে হবে ভাবদেহরূপী শিশু ভাবের পরিপক্কতার প্রভাবে প্রেমদেহ প্রাপ্ত হওয়ার পরই মাতৃস্বরূপ বিষয়ের আবির্ভাব হয়, পূর্বে নয়। ইহা এক প্রকারে প্রেমের সিদ্ধি কেননা প্রেমাধার আর প্রেমাশ্রয় সমানাধিকরণ হয়ে গেছে। অর্থাৎ মায়ের কোলে শিশু উঠে বসেছে। কিন্তু ইহা প্রেমের চরম বিকাশ নয়। যেমন ভাবের বিকাশ প্রেমে তেমনি প্রেমের বিকাশ রসে। ভাব-দেহে দ্বৈত থাকে—সন্তান আর মায়ের যুক্ত অনুভব হয়। কিন্তু মায়ের সঙ্গে সন্তানের, সন্তানের সঙ্গে মায়ের অভেদ উপলব্ধি হয় না। প্রেম গাঢ় হলে 'গলনাত্ দ্রুতিং'। পরে যখন রসরূপে পরিণত হয় তখন সন্তান তথা জননী দুজনই রসময় হয়ে যায়। এই রসময় তনু পরমেশ্বরের দিব্যলীলায় প্রবেশ করার যোগ্য হয়। ক্রিয়াত্মিকা ভক্তির প্রভাবে ইহা সম্ভব নয়। ভাব-ভক্তিরও রস পর্যন্ত বিকাশ না হলে এই অবস্থা প্রাপ্তি অসম্ভব। তনু রসময় হলেই ভগবানের নিত্যলীলায় পরিকর হওয়া যায়। ইহা ভক্তি সাধনার মাধুর্য বিকাশের চরম স্থিতি।

ইহার অতিরিক্ত ভক্তি-সাধনায় ঐশ্বর্য বিকাশের জন্য অন্য এক ধারাও আছে। উহার বিকাশের সময় ভক্ত আর ভগবান অথবা সন্তান আর জননীতে ব্যবধান থাকে। ইহা ভেদভক্তি। যেজন্য ভক্ত ভগবানের অনন্ত ঐশ্বর্যে

অভিভূত হয়ে যায়। মাধুর্যের পূর্ণ আস্বাদনে এই পদ্ধতি বাধক হয়। এই প্রসঙ্গে ভক্তের দৃষ্টি অনুসারে চৌষট্টি (৬৪) গুণের পরিচয় আবশ্যক। ইহাকে গুণ অথবা কলা যে নামেই অভিহিত করা যাক কথা একই। এই দৃষ্টিতে জীবস্বরূপের চরম বিকাশ প্রাপ্ত হবার পর মনুষ্যত্বের পূর্ণ অভিব্যক্তির অধিকারী হয়। ৪৯ সহায়কে গুণ আর এক মহাগুণ মিলে পূর্ণ মানুষের স্বরূপের নির্দেশ করে। ইহাই নরোত্তম সংজ্ঞা। আত্মা মনুষ্যদেহে উত্তম কোটিতে অবস্থান করলেও পরমাত্মার স্তরে উত্থিত হতে পারে না। পরমাত্মা আর আত্মা স্বরূপত একই, কিন্তু গুণের অভিব্যক্তির দৃষ্টিতে পরমাত্মা উপরে আর আত্মা নীচে। কোন কোন ভক্ত ভক্তিমার্গে চলতে চলতে পঞ্চাশ গুণের বিকাশ প্রাপ্ত হলও নরোত্তমরূপে পরিগণিত হবার যোগ্য হন না—উত্তম হলেও জীবকোটিতেই থাকেন। ৫১ থেকে ৫৬ পর্যন্ত গুণের বিকাশ হলে আত্মা পরমাত্মারূপে পরিগণিত হবার যোগ্যতা লাভ করে। এই দুইয়ের মধ্যে ভেদ নেই—মায়াশক্তি পরমাত্মার অধীন আর জীবাত্মা মায়ার অধীন—স্বরূপে একই আত্মা, কেবল বিকাশের তারতম্য। ৫৬ থেকে ৬০ পর্যন্ত গুণের বিকাশ ঘটলে পরমাত্মা ভাবেরও ঊর্দ্ধে উঠে জীব ভগবদ্‌ভাব প্রাপ্ত হয়। যেমন জীবাত্মা-পরমাত্মা একই বস্তু, কিন্তু এক হয়েও জীবাত্মা অধীন আর পরমাত্মা অধীশ, তেমনি পরমাত্মা আর ভগবান তত্ত্বত একই কিন্তু ভগবানের অবস্থায় মায়ার সম্বন্ধ থাকে না। অধিষ্ঠাতৃরূপেও ভগবানের মায়ার সঙ্গে সম্বন্ধ থাকে না। অর্থাৎ ভগবদ্ ভূমিতে মায়ার স্পর্শ বা ক্ষোভ তো দূরের কথা তাকে দেখাই যায় না। ইহাই ভগবদবস্থা, ঈশ্বরাবস্থা কিন্তু মায়াধিষ্ঠাতা পরমাত্মার ঊর্দ্ধে। ভগবান স্বরূপশক্তির সঙ্গে তাদাত্ম্য সম্বন্ধ রাখেন। সন্ধিনী আর সংবিতের পূর্ণ অভিব্যক্তি ভগবদবস্থায় হয় কিন্তু হ্লাদিনী শক্তির আভাস-মাত্র ঐ অবস্থায় পাওয়া যায়। ভগবদ্‌ভক্তগণ এই আভাসকে অনুভব করেন এবং ইহাকে ঐশ্বর্যভক্তি নামে প্রকাশ করেন। ভগবানে অনন্ত যোগশক্তি বিদ্যমান। ঐশ্বর্যময়ী হ্লাদিনীপ্রধান ভক্তির দ্বারা ভগবৎস্বরূপের ঐশ্বর্য অনুভব করা যায়। এখানে ভগবান ঊর্দ্ধে আর ভক্ত নীচে অবস্থিত কেননা এই প্রকারের সম্বন্ধ ব্যতীত ঐশ্বর্য উৎপন্ন হয় না অর্থাৎ যুক্তিযুক্ত হয় না।

আত্মায় যখন ৬১ থেকে ৬৪ পর্যন্ত গুণের বিকাশ হয় তখন ভগবদ্-ভাবেরও ঊর্দ্ধে অথবা অন্তরঙ্গ প্রদেশে স্বয়ং-ভগবান অবস্থার উদয় হয়। উহাতে মাধুর্যের প্রাধান্য থাকে। এই অবস্থায় ঐশ্বর্য পূর্ণভাবে থাকলেও মাধুর্যে অভিভূত থাকে। সাধারণ মানুষের সমভাব ভগবানে প্রকাশিত হয়। ব্রহ্মভাব এই তিন থেকে অভিন্ন। আত্মভাব থেকেও কিন্তু উহাতে গুণের প্রকাশ থাকে না—ইহাই বৈশিষ্ট্য। এইজন্য স্বয়ং-ভগবানাবস্থাকেই পূর্ণব্রহ্ম বলা হয়।

স্বরূপে ব্রহ্ম তথা স্বয়ং-ভগবানে ভেদ না থাকলেও স্বরূপশক্তির মহিমার জন্য স্বয়ং-ভগবানকে চরম উৎকর্ষ মানা হয়। প্রেমের আশ্রয় ব্যতীত, বিশেষ করে রাগময়ী ভক্তির প্রভাবসংপ্রসূত প্রেম ছাড়া স্বয়ং-ভগবান পর্যন্ত পরম তত্ত্ব হৃদয়ে পৌঁছায় না।

আত্মার পূর্ণস্থিতি তথা পূর্ণস্বরূপ প্রাপ্তির উপায়

আত্মার স্বরূপ স্বাতন্ত্র্যময় অখণ্ড মহাপ্রকাশ---ইহার প্রাপ্তির জন্য প্রথমে নিরাকার নির্গুণস্বরূপ গ্রহণ করতে হয়, তারপর সাকার সগুণ। নিরাকার-স্বরূপ বিশ্বাতীত আর সাকার বিশ্বাত্মক। এই দুই স্বরূপ প্রাপ্তির পর পরম-স্বরূপের সাক্ষাৎকার ঘটে—যেখানে সাকার—নিরাকার, সকল—নিষ্কল, সগুণ—নির্গুণ, সবিশেষ—নির্বিশেষ প্রভৃতি সকল দ্বন্দ্বের সমাধান হয়। ইহার পর যোগের পথ খুলে যায়। যোগেও ক্রমশঃ ঘনীভূত ভাব সিদ্ধ হবার পর অর্থাৎ সাযুজ্য প্রতিষ্ঠিত হবার পর উহার ঊর্দ্ধ্বে অদ্বয় অবস্থার আবির্ভাব ঘটে।

এই দৃষ্টি অনুসারে সর্বপ্রথম বিশ্বকে ভেদ করতে হয়--ইহার প্রাপ্তি দক্ষিণাবর্ত পরিক্রমা থেকে হয়। যোগী আত্মা সম্মুখ দৃষ্টি করে ধীরে ধীরে স্বীয় জ্ঞানশক্তিকে নির্মল করতে করতে অগ্রসর হন। জ্ঞান যতক্ষণ মলিন থাকে ততক্ষণ জ্ঞেয়ের ভান হয়। জ্ঞানের নির্মলতা প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞেয়ের তিরোধান ঘটে এবং সর্বশেষে জ্ঞান পূর্ণরূপে স্বচ্ছ হবার পর বাইরে জ্ঞেয়ের ভান থাকে না। যোগীরাজ পতঞ্জলি এই স্থিতিকে লক্ষ্য করে বলেছেন—"জ্ঞানস্য আনন্ত্যাদ জ্ঞেয়মল্পম্"—অর্থাৎ জ্ঞান অনন্ত হয়ে যাবার পর পূর্ণ স্বচ্ছ এবং নির্মল হবার পর বিশ্বরূপে ভাসমান 'জ্ঞেয়' তিরোহিত হয়।

ইহার তাৎপর্য এই, যোগমার্গের প্রারম্ভিক স্থিতিতে ঊর্দ্ধ্বগতির সাথে সাথে জ্ঞান যেমন নির্মল হয় ঠিক ঐ মাত্রায় জ্ঞেয়ের সঙ্গে একাকার হয়ে যায়। ক্রমশ বিশ্ব আকাররহিত হয়ে নিরাকার আত্মসত্তায় তাদাত্ম্যলাভ করে। ইহারই নাম 'বিশ্বভেদ'।

বিশ্ব, ব্যষ্টি এবং সমষ্টি—সব আকার নিয়ে তৈরী। ইহা বিকাশের ক্রমানুসারে ভাসমান হয়। কিন্তু অগ্রগতিতে যোগীর জ্ঞান নির্মল হওয়ার প্রভাবে সাকার বিশ্ব জ্ঞানরূপে আভাসমান হয়ে অন্তে নিরাকার আত্মসত্তায় পর্যবসিত হয়। এই সময় জ্ঞাতা আত্মা জ্ঞেয়রূপে নিজেকে পায় অর্থাৎ জ্ঞাতা স্বয়ং নিরাকাররূপে জ্ঞেয় হয়ে যায়। বহু সাধক এই নিরাকার আত্মদর্শনকে

সাধনার পরম লক্ষ্য মনে করে এখানেই থেমে যায়। কিন্তু ইহা আত্মার 'পৃষ্ঠ-দর্শন' মাত্র। ইহা দক্ষিণাবর্ত গতির চরম নিষ্কর্ষ—সাধনার অনুলোম গতি।

সদ্‌গুরুর কৃপা থাকলে এইখানে না থেমে যোগী ঘুরে বামাবর্ত গতিতে চলতে শুরু করে এবং আপন স্বরূপের নিকট পৌঁছায়। এই বিলোম গতির দুইটি সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। দক্ষিণাবর্তে যে জ্ঞেয়রূপী বিশ্ব জ্ঞানে লয় হয়ে গিয়েছিল তার পুনরুত্থান ঘটে। মনে রাখতে হবে এই পুনরুত্থান চিন্ময়-স্বরূপে হয়। প্রথমে বিশ্ব মায়িক অচিৎ অর্থাৎ জড়ভাবাপন্ন ছিল। বিলোম-গতি না হলে জড়বিশ্বের নিবৃত্তি হয়ে নিরাকার আত্মস্বরূপে স্থিতি হয়। কিন্তু গুরুকৃপায় পুনর্গতিলাভ হলে অস্তগত বিশ্বের পুনরুদ্ধার হয়। কিন্তু ইহা জড় না হয়ে চিন্ময় হয়। লয় হওয়ার পথ সমাপ্ত হয়ে যায়। এই অবস্থায় সমস্ত অন্তর্গত বিশ্বের ক্রমশঃ পুনরুদ্ধার হয়। পরিশেষে যখন সমস্ত বিশ্বের চিন্ময় রূপ, রঙের পুনরুত্থান ঘটে তখন বিশ্বাত্মক আত্ম-স্বরূপের দর্শন হয়। ইহাই আত্মার 'সম্মুখদর্শন'। ইহাই সমস্ত বিশ্বাত্মক আত্মার সাকার দর্শন। প্রথমে আত্মাকে নিরাকাররূপে পাই তখন বিশ্বও নিরাকার ছিল। এখন আত্মাকে নিত্যসাকাররূপে পাওয়া গেল। কিন্তু এই দুইই পরস্পর নিতান্ত ভিন্ন—এক অনুলোম গতির ফল, আত্মার পৃষ্ঠরূপ এবং দ্বিতীয় বিলোম গতির ফল, আত্মার সম্মুখরূপ।

এই দুই স্বরূপই একই আত্মার অখণ্ড স্বরূপের অন্তর্গত যার দর্শন মেলে সরলগতির অনুসরণে। এই সময় গতির আবর্তন থাকে না—না দক্ষিণা-বর্ত, না বামাবর্ত। গতির আবর্তন না থাকলেই সরলগতি প্রকট হয়। ইহাতে কেন্দ্রস্থ বিন্দুর অখণ্ডরূপে দর্শন পাওয়া যায়। ঠিক যোগমার্গে যেমন ইড়া এবং পিঙ্গলার আবর্তগতি এবং মধ্যস্থিত সুষুম্নার সরলগতি যাহাতে আত্মার পূর্ণরূপে সাক্ষাৎকার ঘটে। ইহাতে সাকার-নিরাকার, সগুণ-নির্গুণ প্রভৃতি দ্বন্দ্বের ক্ষোভ থাকে না। এই প্রকারে সরল গতিতে পূর্ণসত্তার দর্শন তো হয়, কিন্তু প্রাপ্তি হয় না, কেননা দ্রষ্টা এবং দৃশ্য, উপাসক এবং উপাস্যের মধ্যে ব্যবধান তখনও থাকে। বক্রগতির নিবৃত্তিতে পূর্ণসত্যের সাক্ষাৎকারের বাধা নিবৃত্ত হয়। কিন্তু এই ব্যবধানের অপসরণ না ঘটলে দুইয়ে যোগ স্থাপিত হওয়া সম্ভব নয়। পূর্ণস্বরূপের অনিমেষভাবে নিরন্তর দর্শন করতে করতে এই ব্যবধানও কেটে যায় তখন পূর্ণ আত্মস্বরূপের সঙ্গে আত্মার যোগের সূচনা হয়—উপাসক এবং উপাস্যের মধ্যে যোগের আরম্ভ হয়। ইহার পর যোগপ্রক্রিয়ার গাঢ়ত্ব ঘটলে উপাসক উপাস্যে অনুপ্রবিষ্ট হয় এবং উপাস্য ও উপাসকে। তখন দুই সমরস প্রাপ্ত হয়। এইজন্য শাস্ত্রে বলে—"শিবস্য অভ্যন্তরে শক্তিঃ শক্তেরভ্যন্তরে শিবঃ"—ইহাই সমরসতা। শিব বললে

দুইই শিব, শক্তি বললে দুইই শক্তি। এই সামরস্যকে পৌরাণিকগণ সাযুজ্য নামে বর্ণনা করে থাকেন। ইহাই যোগের পরাকাষ্ঠা। ইহার পর সামরস্যও থাকে না—ইহার অতিক্রম ঘটে—ইহাই আত্মার পূর্ণ স্থিতি। এখানে সব কিছুই আছে অথচ কিছুই নাই। এই স্থিতিকে লক্ষ্য করে গীতায় বলা হইয়াছে—"যদ্ গত্বা ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম।" ইহাতে পরিপক্কতা লাভ করলে আত্মা অচল হয়ে যায়।

মানবজীবনের পূর্ণতা

'মানব জীবন দুর্লভ'—একথা সব দেশের ধর্মসম্প্রদায় সমবেত কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন। কবি চণ্ডীদাস গেয়েছেন 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।' প্রকৃতির ক্রমবিকাশ অনুসারে চুরাশী লক্ষ স্থাবর তথা জঙ্গম দেহ ভেদ করে মনুষ্যদেহের প্রাপ্তি ঘটে। এই চুরাশী লক্ষতে অন্নময় তথা প্রাণময় কোষেই বিকাশ সম্পন্ন হয়। মনোময় কোষের রচনা এবং মানবদেহের সূচনা প্রকৃতির নিয়মানুসারে একই সঙ্গে অভিন্নরূপে সম্পন্ন হয়। যদিও মনোময় দেহের পূর্বাভাস মনুষ্যদেহ বা যোনি প্রাপ্তির পূর্বেই হয়, তথাপি যথার্থ মনোময় কোষের আবির্ভাব পশু অবস্থায় কখনই সম্ভব নয়। মানবদেহের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির নিয়মানুসারে মনের আবির্ভাব হয়। প্রাণময় কোষের বিকাশের চরম দশায় মনের সত্তার পূর্বাভাস অবশ্য পাওয়া যায়। কিন্তু ইহা যথার্থ মন নয়। প্রাণের মনোন্মুখ অবস্থামাত্র। যথার্থ মন বিবেক এবং বিচারধর্মী। এই বিবেক এবং বিচারশক্তির প্রাথমিক স্তরে প্রাণের প্রভাবই বেশী দেখা যায়—তথাপি উহাকে মনোময়স্তরের নিম্নরূপ বলা চলে। যোগীরা যাকে ষট্চক্রের সংস্থানরূপে বর্ণনা করেছেন এবং যা ভেদ করে বিজ্ঞানময় কোষে প্রবেশ করা মানবজীবনের প্রাথমিক উদ্দেশ্য বলে বলা হয়েছে—একমাত্র মানব শরীরেই উহার অস্তিত্ব সম্ভব—অন্য শরীরে নয়।

প্রথম অবস্থায় আকৃতিতে মানুষ বলে প্রতীত হলেও প্রকৃতিতে সে পশুই থাকে। ইহার একমাত্র কারণ মন পেয়েও মনকে সে প্রাণের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত করতে পারে না। বাসনা, কামনা, সংস্কার তথা নানা প্রকার অবচেতন শক্তির প্রবাহ—এমনকি চেতন শক্তির প্রবাহও প্রাণময় কোষের প্রাধান্যের জন্য ঘটে। প্রচলিত ভাষায় চিত্তশুদ্ধির অভাব ইহাতে লক্ষিত হয়। জন্মজন্মান্তরের যাবতীয় সংস্কার এই অবচেতন শক্তিবর্গের অন্তর্গত। এই সংস্কারের মূলে

আছে ইন্দ্রিয়সমূহের অতৃপ্ত কামনা এবং বাসনা। এই সমস্ত বাসনাসমষ্টিকে কাম অথবা আত্মেন্দ্রিয় তৃপ্তি নামে বর্ণনা করা চলে। প্রথম অবস্থায় এই কামনা-মূলক সংস্কার থেকে চিত্তকে শুদ্ধ করা একান্তভাবে প্রয়োজন। এজন্য বিভিন্ন প্রকারের উপায় অবলম্বন করা যায়। কিন্তু মনে রাখতে হবে কর্ম ত্যাগ উপায় নয়। কামনার ত্যাগও উপায় নয়। কেননা বাস্তবে এসব করা মানুষের পক্ষে অসম্ভব। একমাত্র উপায় হচ্ছে কর্ম করা এবং সঙ্গে সঙ্গে মনে রাখা কর্মের সঙ্গে নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থ এবং কামনার কোন সম্পর্ক থাকবে না। নিজেকে ছেড়ে বিশ্বের জন্য যে কামনা তাহা কামনা পদবাচ্য নয়। ইহারই নাম নিষ্কাম কর্ম। আপন ব্যক্তিগত স্বার্থ তৃপ্ত করা দূষণীয়। যোগস্থ থেকে ব্যক্তিগত সফলতা এবং নিষ্ফলতার প্রতি দৃষ্টি না রেখে কর্ত্তব্যবোধে কর্ম করলে চিত্ত-শুদ্ধি ঘটে এবং ইহাই চিত্তশুদ্ধির প্রকৃষ্ট উপায়। চিত্তশুদ্ধির পর কর্মের বন্ধন পূর্ণরূপে না কাটলেও উহার গ্রন্থি শিথিল হয়। চিত্তশুদ্ধি কিছু-মাত্রায় প্রকৃষ্টরূপে সম্পন্ন হলেই উহার প্রভাবে ভূতশুদ্ধি সুরু হয়। এই সময় অভিন্নপ্রকার অবচেতন জড়স্তর থেকে আপন চিত্তসত্তাকে পৃথকরূপে অনুভব করা যায়। বিষয়াত্মক জড়জগৎ, ইন্দ্রিয়বর্গ, প্রাণ, মন, অহংকার, বুদ্ধি প্রভৃতি থেকে চিৎসত্তাকে আলাদা করে পাওয়া যায়। এই চিৎসত্তাই আত্মসত্তা। অচিতের সম্বন্ধ থেকে মুক্ত হলেই এই ব্রহ্মসত্তা হয়।

এই অবস্থায় অবিশেষভাবের উদয় হয়। যে সমস্ত সাধকের সাক্ষাৎ অথবা অসাক্ষাৎরূপে পরমেশ্বরের অনুগ্রহলাভ ঘটে না তাঁহারা এই অখন্ড চিৎসত্তাকে আত্মস্বরূপ ব্রহ্মসত্তারূপে অনুভব করেন এবং এক হয়ে যান। পরমেশ্বরের বিশেষ অনুগ্রহমূলক পরমপদ প্রাপ্তি যতক্ষণ না হয় ততক্ষণ পূর্বোক্ত ব্রহ্মই জ্ঞানমার্গে ব্রহ্মজিজ্ঞাসুর প্রাপ্য। এই মার্গে অচিৎ বা জড়সম্বন্ধ থেকে মুক্ত হয়ে আত্মা শুদ্ধ অপরিচ্ছিন্ন চিদ্রূপ প্রাপ্ত হয় এবং পেয়ে পূর্বোক্ত ব্রহ্মস্বরূপে লীন হয়।

কিন্তু যাঁহার উপর বিশেষ ভগবৎকৃপা থাকে তিনি ব্রহ্মস্বরূপকে লাভ করে' স্বরূপশক্তি তথা চিৎশক্তিকে প্রাপ্ত হন—নিজেকে তখন কেবল ব্রহ্মরূপেই অনুভব করেন না বরং ঐ চিদ্রূপা স্বরূপশক্তির ক্রমিক বিবর্ত্তনের প্রভাবে বিশ্বাত্মক-রূপেও অনুভব করতে থাকেন।

ব্রহ্মভাব বিশ্বাতীত—কিন্তু চিৎ-শক্তি প্রাপ্তির পর তথাকথিত চৈতন্য-শক্তির দ্বারা তথাকথিত অচিৎ সত্তার চিন্ময়ত্ব সম্পাদনরূপ ক্রমিক বিবর্তন হয়। ইহাই প্রেমের পথ যাহাতে সমস্ত বিশ্ব আপন রূপ পরিগ্রহ করে। ইহার সব অবস্থাই বিশ্বাত্মক। চিৎশক্তি সন্ধিনী, সংবিৎ তথা হ্লাদিনীরূপে পৃথক অনুভূত হলেও উহার মূলে একই শক্তি বর্তমান। ইহার প্রধান কার্য অচিৎ

সত্তাকে চিদ্রূপে এবং নিরানন্দ দুঃখময়ী সত্তাকে আনন্দরূপে পরিবর্তিত করা। এই পরিবর্তন সর্বপ্রথম সত্তাঅংশে সম্পন্ন হয়--এইজন্য চিৎসত্তা সম্বলিত ব্রহ্মসত্তাকে প্রথম সাক্ষাৎকারের পর মহাশূন্য কেটে যায় এবং মহাকাশের বক্ষে অখন্ড অনন্ত সত্তা নিত্যসিদ্ধ বিশ্বরূপে প্রতীতিগোচর হয়। এই বিশ্ব পরিণামশীল কালের অধীন নয়—ইহাতে অতীত, অনাগত এবং বর্তমানরূপে কোন আবর্ত নেই। ইহাতে খন্ডকাল থাকে না এবং উহা মহাকালরূপে আভাসিত হয়। এইপ্রকারে ইহাতে খন্ডদেশ না থাকাতে কোনপ্রকার দিক্‌বন্ধন থাকে না। একই বিন্দুতে সব দেশ সব কালের সত্তা বিদ্যমান থাকে। এখন পর্যন্ত এই আত্মস্বরূপে অংশঅংশিভাব স্ফুরণ হয়নি। যখন শক্তির বিকাশ অধিক মাত্রায় স্পষ্ট হয় তখন নিরংশ আত্ম-সত্তায় তথা নিষ্কল ব্রহ্ম-সত্তায় অখন্ড ব্রহ্মভাবের সাক্ষাৎকারের সঙ্গে সঙ্গে অংশঅংশিরূপে আত্মস্ফুরণ অনুভূত হয়। এখানে আত্মা পরমাত্ম-রূপ এবং জীব উহার অভিন্ন অংশ। জীব পরমাত্মার অংশ হয়েও স্বরূপত অভিন্ন। পরমাত্মা বিশ্বের অধিষ্ঠাতা আর জীব নিজ দেহের অধিষ্ঠাতা। ব্রহ্মাবস্থায় জীব থাকে না--জীবের স্বকীয় দেহ থাকে না। কিন্তু জাগ্রত চিৎশক্তির বলে বিশ্বের উদয় হয় এবং আত্মা পরমাত্মারূপে উহার অধিষ্ঠাতা এই ভান হয়। সঙ্গে সঙ্গে দেহ প্রকট হয় এবং অভিমানী জীব পরমাত্মার স্বাংশ, ইহার অনুভূতি হয়। ব্রহ্মোপলব্ধি হওয়ার পূর্বে মায়িক জগতে এ অবস্থা ছিল না, কেননা ঐ সময় জীব পরমাত্মার ভিন্নাংশ ছিল। তখন মায়াশক্তির প্রভাব ছিল আর এখন চিৎশক্তির প্রভাব। এই অবস্থায়ও চিৎশক্তির ক্রমবিকাশ চলতে থাকে। ইহার প্রভাবে জীব অভিন্নাংশ হয়ে ক্রমশ অধিক মাত্রায় অভেদ উপলব্ধি করতে থাকে, এবং শেষে পরমাত্মার সঙ্গে যোগযুক্ত হয়ে যায়। এই যোগযুক্ত অবস্থা ব্রহ্মলয়ের সদৃশ কোন স্থিতি নয়। কেননা তখন চিৎশক্তি ছিল না কিন্তু এখন চিৎশক্তির জাগরণ হয়েছে। চিৎশক্তির বিকাশ এতদূর সম্পন্ন হবার পর মন, বুদ্ধি, চিত্ত প্রভৃতি সবই চিন্ময় হয়ে যায় এবং সবই অপ্রাকৃতরূপ ধারণ করে। মনোময়ভূমি শান্ত পূর্ণরূপে চিন্ময় হয়ে গেলে ইন্দ্রিয় রাজ্যের পরিবর্তন আরম্ভ হয়। এদিকে চিৎশক্তির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে হ্লাদিনী শক্তির বিকাশ শুরু হয়। চিৎশক্তির বিকাশ মনোময় ভূমি থেকে উচ্ছ্বসিত হয়ে প্রাণ ইন্দ্রিয়াদি ভূমিতে অবতরণ করে। ইহারই নাম উল্লাস।

মনোময় জগতের পূর্ণ বিকাশের পর বিজ্ঞানময় তথা আনন্দময় কোষের বিকাশের বিষয়ে শাস্ত্রে উল্লেখ আছে। ব্যষ্টিরূপে দেখলে প্রথমেই উল্লিখিত প্রণালীর বিজ্ঞানময় তথা আনন্দময় কোষের বিকাশ জানতে হবে। সমষ্টিরূপে ইহাকেই পূর্ণব্রহ্মের অবতরণ বলা যায়। বাস্তবিক পক্ষে অবতরণ নামে কোন শব্দ নেই—অবরোহকেই অবতরণ বলে।

মনোময় স্তরে যে পরিণাম হয় উহা কেবল চিন্ময় আর স্থূল স্তরের পরিণাম চিদানন্দময়। এই সময় চিৎশক্তি নিরন্তর হ্লাদ-যুক্ত থাকে। ইন্দ্রিয়েরও শোধন তথা পরিবর্তন সাধিত হয়। এখানে জড়তত্ত্বের নিবৃত্তি হয়--শরীরেও ঐ রকমই ঘটে। জড় ইন্দ্রিয় এবং জড় দেহ তখন থাকে না। ইন্দ্রিয়ের চিন্ময়ত্ব প্রাপ্তি এবং হ্লাদিনী শক্তির প্রবাহের দরুণ উহার বিষয়ীভূত সত্তায় চিদানন্দস্বরূপ প্রকাশিত হয় অথচ সত্তা স্থূলই থাকে। উহার বিশেষত্ব এই যে একই সত্তায় একই সঙ্গে পাঁচ কল্যাণ গুণের প্রকাশ ঘটে অর্থাৎ একই সঙ্গে রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ তথা শব্দের আবির্ভাব হয়।

ইহারই নাম ভগবদ্ অনুভব। এইরূপ অনুভবে দিব্যরস, দিব্যগন্ধ প্রভৃতি সর্বপ্রকারের অন্তর্ভাব হয়। ইহা অপ্রাকৃত এবং নিত্য সিদ্ধ বস্তু। এই ভগবৎ অনুভূতিকে কেন্দ্র করে বিশ্বজগৎ ঐ সময় উন্মুখ অবস্থার প্রভাবে ঠিক ঐ প্রকার স্থিতিপ্রাপ্ত হয়। ঐ সময় কালের সংকোচ থাকে না, পরিণাম তথা মৃত্যুর লীলা সমাপ্ত হয়ে যায়—অখণ্ড প্রেমে সমস্ত বিশ্ব প্লাবিত হয়ে ওঠে। তখন অখণ্ড অদ্বৈতের ভিতরে সূক্ষ্ম দ্বৈতময় ভাবজগৎ এবং স্থূল দ্বৈতময় অভাবের জগৎ অখণ্ড মহাযোগ থেকে মুক্ত হয়ে প্রকাশিত হয়। এক ব্যক্তির এই অবস্থা প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র বিশ্বে ইহার প্রাপ্তি অবশ্যম্ভাবী। ইহাই পূর্ণব্রহ্মের আত্মপ্রকাশ অথবা প্রেমময় ভগবানের আবির্ভাব। এখানে কালের ক্রমধর্মী কোন বস্তু নেই। ইহার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে কাল সর্বদার জন্য শান্ত হয়ে যায় এবং কাম বাসনা প্রভৃতি অখণ্ড মহা প্রেমে উজ্জীবিত হয়ে ওঠে। ইহার প্রাথমিক বিবর্তনে আরোহ তথা অবরোহ উভয়ের স্থান আছে। পরিণামে আরোহও নেই অবরোহও নেই। চিৎ-কে অচিৎ থেকে মুক্ত হবার জন্য আরোহক্রমের প্রয়োজন। চিৎ যখন মুক্ত হয়ে যায় তখন আপন শক্তির দ্বারা অচিতের রূপান্তরের জন্য অবরোহ অপেক্ষিত। সেবাকার্যের পর যখন সমস্ত বিশ্বের অভাব দূর হয়ে যায় তখন সরল গতির প্রকাশ হয়। ইহার সঙ্গে অনাদি অনন্ত দিব্যধামের অনুভব হয় আর বাইরে কালজগৎ অনন্ত দুঃখমগ্ন প্রতীত হয়। এই দুইয়ের পরিণামস্বরূপ পূর্ণানন্দের বিকাশ হয়। এই বিকাশে যেমন একই সত্তা আছে তেমনি এই সৃষ্টির অন্তর্গত অনন্ত বৈচিত্র্যের প্রতি কণারও সার্থকতা আছে। আরোহ তথা অবরোহ, অনুলোম তথা প্রতিলোম ক্রম, কালের বামাবর্তিনী এবং দক্ষিণাবর্তিনী দুই গতি মাত্র। ইহার পর আবর্তগতি থাকে না। কেননা কালের অভাব এবং দিব্য জীবনের আবির্ভাব হয়। তখন থাকে শুদ্ধ সরলগতি আর নিত্যলীলা —ইহারই একপ্রান্তে থাকে সর্বসাক্ষীস্বরূপ কালাতীত মহাবিন্দু। কোন ব্যক্তি-বিশেষের এই অবস্থা প্রাপ্তি হলে সমস্ত বিশ্বের জন্য ইহার প্রাপ্তি সহজ হয়।

কারণ তখন উন্মুখভাব থাকলে বাধা দেবার মত কোন বিরুদ্ধ শক্তি থাকে না। সমস্ত বিশ্বের কল্যাণ ইহার মধ্যেই নিহিত আছে।

প্রাচীনকালের মহাপুরুষ তথা ধর্মাচার্যগণ যে কল্যাণের কথা বলেছেন তা আংশিক কল্যাণমাত্র, কেননা তাতে কালের পরাভব ঘটেনি। কালসংকর্ষিণী শক্তির ইহাই খেলা।

বর্তমান সৃষ্টির মূলে আছে কাম, তার সমাপ্তি হবে প্রেমে। ইহাই রাস-লীলা মহারাস, যা আজ পর্যন্ত হয়নি। ইহারই ফলে প্রতিষ্ঠিত হবে সত্যি-কারের আধ্যাত্মিক সাম্যবাদ।

অখন্ড মহাযোগ এবং তার উদ্দেশ্য

পরমারাধ্য আচার্যদেবের তিরোধানের পর 'অখন্ড মহাযোগের' তাৎপর্য জানবার ঔৎসুক্য সুধীসমাজে দেখা দিয়েছে। তাঁর রচিত এবং প্রকাশিত 'অখন্ড মহাযোগ' বইখানা এখন দুষ্প্রাপ্য। তারই সংক্ষিপ্ত সার এই প্রবন্ধে পরিবেশনের চেষ্টা করছি। তিনি অবশ্য বলেছিলেনঃ 'অখন্ড মহাযোগ এক গুহ্য বিষয়—ইহা সর্বত্র প্রকাশযোগ্য নয়—অখন্ড মহাযোগ গ্রন্থে শুধু দিক্-দর্শনমাত্র দেওয়া হয়েছে!'

অনন্ত প্রকার অযুক্ত এবং বিক্ষিপ্ত ভাবকে একসূত্রে গাঁথা এবং তাদাত্ম্য স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করাই এই মহাযোগের তাৎপর্য। শিবের সঙ্গে শক্তির, আত্মার সঙ্গে পরমাত্মার, এক আত্মার সঙ্গে অন্য আত্মার, মহাশক্তির সঙ্গে আত্মার যোগ, লোক লোকান্তরের সঙ্গে পরস্পর যোগ ইত্যাদি সবই মহা-যোগের অন্তর্গত। এই যোগ অখন্ড সত্তারূপে সম্পন্ন হলে সর্বপ্রকারের অভাব চিরদিনের জন্য মিটে যাবে।

বাস্তবে আমরা কাল, মহাকাল এবং খন্ডকালের বিভেদ লক্ষ্য করি। মহাকাল অখন্ড কিন্তু নিরন্তর সৃষ্টিশীল। আর খন্ডকাল অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ রূপে ত্রিধা বিভক্ত। এই কালের স্রোত অনাদিকাল থেকে চলে আসছে। কিন্তু এমন স্থিতিও আছে যেখানে ত্রিকাল নেই। শুধু আছে নিত্য বর্তমান, যেখানে সব বস্তু নিত্য প্রকাশমান—পরিণাম সেখানে নেই।

স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে এই মহাযোগ কি জগতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে—

অতীতে অথবা বর্তমানে? এই যোগের জন্য মানুষের প্রচেষ্টার প্রয়োজন আছে কি? উত্তরে বলা যায়, এই যোগ এখনও পর্যন্ত জগতে হয়নি—হলে জগতের অবস্থা বদলে যেত। একের প্রাপ্তিতে সবার প্রাপ্তি নিত্য সম্বন্ধযুক্ত হ'ত। একের মুক্তিতে সবার মুক্তি—একের প্রাপ্তিতে সবার প্রাপ্তি পূর্ণরূপে অথবা অংশরূপে তখনই সম্ভব যখন সমষ্টির দৃষ্টিতে সমস্ত জগতে তাদাত্ম্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এ বিষয়ে বিভিন্ন বিচারধারা আছে।

অখণ্ড মহাযোগের সাধনায় মানুষের আন্তরিক প্রচেষ্টা এবং পরমাত্মার পরম অনুগ্রহ একান্তভাবে প্রয়োজন। পুরুষকার এবং একীকরণ মানুষের জন্য অপরিহার্য। যতদিন কর্তৃত্বাভিমান থাকে ততদিন নিম্নতত্ত্ব থেকে ঊর্ধ্ব-তত্ত্বে যাবার জন্য তত্ত্বভেদের প্রক্রিয়ার আবশ্যকতা আছে! এই সব তত্ত্ব মায়িক জগতে ব্যাপ্য-ব্যাপকরূপে অধোউদ্ধর্ব-ভাবে অবস্থিত। পুরুষকার সাহায্যে তত্ত্বকে জয় করতে হয়। ইহাতে যোগের অধিকার প্রসারিত হয়। নিম্নতত্ত্ব থেকে উদ্ধর্বতত্ত্বে আরূঢ় হবার সঙ্গে সঙ্গে নিম্নতত্ত্বের ব্যাপক মণ্ডল উদ্ধর্ব-তত্ত্বের অধিকতর ব্যাপক মণ্ডলে পরিণত হয়। এইপ্রকার শেষ তত্ত্ব সর্বাধিক ব্যাপক। ব্যাপ্য তত্ত্ব হইতে ব্যাপক তত্ত্বে উত্থানের একমাত্র উপায় কর্মগত কৌশল। পুরুষকার অবলম্বনপূর্বক এই প্রকারে ক্রমশ তত্ত্বভেদ করতে করতে সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করে সমগ্র বিশ্বে অধিষ্ঠান করা সম্ভব। ইহা যোগসাধনার একটি ধারা।

যোগসাধনার দ্বিতীয় ধারায় পরমেশ্বরের মহাকরুণা পেয়ে আপন আশ্রিত সত্তাকে অনুগৃহীত করা। কিন্তু পরমেশ্বরের কৃপা মানুষের কর্মগত এবং জ্ঞানগত যোগ্যতার অপেক্ষা করে না। কর্মের ফল কৈবল্য। জীবের উপর মহাকৃপার স্ফুরণ পরমেশ্বরের স্বাতন্ত্র্য থেকে হয়। মানুষের মলরূপ আবরণ কার্যের প্রভাবে বা অন্য কোন কারণে ধীরে ধীরে শিথিল হয়ে যায় এবং পরমেশ্বরের কৃপার সঞ্চার হয়। এই কৃপার সঞ্চারে মানুষের শিবত্ব আসে। বাস্তবিক দৃষ্টিতে এই সময় পরমেশ্বরের ক্রিয়াশক্তি কার্য করতে শুরু করে। উহার পূর্ণ বিকাশে শিবত্ব পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু এখানে মনে রাখা উচিত পরমেশ্বরের কৃপার পর জীবের কর্তৃত্বাভিমানমূলক কর্মের অভাব ঘটে।

কৃপার প্রভাবে পূর্ণজ্ঞানের সঞ্চার হয় এবং ক্রিয়াশক্তির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে আবরণমুক্ত হয়ে পরম শিবত্বের পূর্ণ অভিব্যক্তি হয়।

অভিমানমূলক কর্মে উৎকর্ষ লাভ না ঘটলেও পরম কৃপার উদয় হওয়া সম্ভব—পক্ষান্তরে পরম কৃপার উদয় না হলেও অভিমানমূলক কর্মের উৎকর্ষ

থেকে তত্ত্ব থেকে তত্ত্বান্তর হয়ে ক্রমিক উদ্ধর্বগতি নিষ্পন্ন হওয়া সম্ভব। কিন্তু মনে রাখা উচিত জীব গুরু হয় না, ঈশ্বরই গুরু।

অভিমানমূলক কর্মগত উৎকর্ষ অনুসারে জীব যত স্থান আপন অধিকারের অন্তর্ভুক্ত করতে পারে ততটা স্থান পর্যন্ত সমগ্র জীবকে গুরুরূপে উদ্ধার করতে পারে, তার বেশী নয়। জগদ্‌গুরু হতে হলে জীবকে মায়া অবধি তত্ত্ব জয় করতে হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে ভগবৎকৃপাশক্তির অধিকারী হওয়া প্রয়োজন। কৃপাশক্তির সমাগম না হলে জগতের উপর ঐশ্বর্য থাকা সত্ত্বেও গুরুত্ব আসবে না। ঐশ্বর্যের জন্য তত্ত্বজয় প্রয়োজন আর জীবোদ্ধারের জন্য ভগবৎকরুণা প্রাপ্তি অত্যাবশ্যক—ইহাই কৃপা এবং কর্মের পরস্পর মিলন। এই কর্ম ব্যষ্টিরূপে হতে পারে এবং সমষ্টিরূপেও হতে পারে। ব্যষ্টিরূপে হলেও যদি করুণার সমাবেশ থাকে তাহলে তার মাত্রানুসারে সমষ্টির সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হতে পারে। কিন্তু সমষ্টিরূপে হলে সমষ্টির প্রগতিতে বৈলক্ষণ্যের অবসর থাকে।

প্রাপ্তি এবং অনভব এক জিনিষ নয়—প্রাপ্তি হলেও প্রাপ্তির অনুভব না থাকতে পারে অথবা প্রাপ্তির অনুভব থাকতে পারে কিন্তু প্রাপ্তি ঘটে না। পূর্ণত্বের জন্য দুইই আবশ্যক সত্তা এবং সত্তার বোধ। সমষ্টির অনুগ্রহের প্রভাবে তাদাত্মমূলক প্রাপ্তি হওয়া সম্ভব। কিন্তু প্রাপ্তির অনুভব তখনও অপেক্ষিত। যতক্ষণ এই অনুভব না হবে ততক্ষণ পূর্ণতা আসবে না।

অখন্ড মহাযোগের উদ্দেশ্য গুরুশক্তির প্রভাবে কালের নিবৃত্তি। খন্ডরূপে ইহা অনাদিকাল থেকে চলে আসছে। কিন্তু ইহাতে সমগ্র বিশ্বের সামূহিক কল্যাণ পূর্ণরূপে নিষ্পন্ন হয়নি। পরার্থপ্রবণ মহাপুরুষ এবং সিদ্ধ পুরুষগণ অতীতে সামূহিক কল্যাণের জন্য চেষ্টা করেছেন কিন্তু তাঁদের এই প্রচেষ্টায় অখন্ড মহাযোগ নিষ্পন্ন হওয়া সম্ভব নয় যতদিন উহার আবশ্যক পূর্বাঙ্গ সম্পূর্ণ না হয়।

পূর্ণব্রহ্ম নিরন্তর অখন্ডরূপে আপন স্বরূপে বিরাজমান। ইহার অনুভবের জন্য যোগীকে কালরাজ্য অতিক্রম করে পূর্ণব্রহ্মে প্রবেশ করতে হবে। ইহা অত্যন্ত কঠিন, কিন্তু সম্ভব। ইহা নিষ্পন্ন হলেও যে মহান কার্যের বিষয়ে বলা হচ্ছে তা সম্পূর্ণ হবে না, কেননা কালচক্র ভেদপূর্বক পূর্ণব্রহ্মে প্রবিষ্ট হয়ে এবং স্বয়ং পূর্ণব্রহ্মের সঙ্গে অভেদ প্রাপ্ত হয়ে যোগী স্থিতি নেন কিন্তু তাঁর অবতরণ হয় না এবং অবতরণ হওয়া সম্ভবও নয়! ইহার জন্য আবশ্যক আরোহণ কার্য সমাপ্ত করে মহাশক্তির সঙ্গে আপন তাদাত্ম্য সিদ্ধ করা এবং স্বয়ং মহাশক্তিসম্পন্ন হয়ে মহাপ্রেমধনের জন্য অবতরণ করা। ইহাতে

গভীর রহস্য আছে যা প্রকাশযোগ্য নয়। মহাশক্তির সঙ্গে যুক্ত হয়ে মহাপ্রকাশরূপ পরব্রহ্মে প্রবিষ্ট হবার উদ্যোগ না করে ফিরতে হয় কেননা তাতে প্রবেশ করে পৃথিবীতে ফিরে আসা সম্ভব নয়—অথচ উহার বিনা প্রাপ্তিতে পৃথিবীতে পূর্ণত্বের অভিব্যক্তি কি ভাবে হবে ইহা এক জটিল প্রশ্ন।

এই অবতরণের উদ্দেশ্য বিশুদ্ধ প্রেমের সাধনা। এই প্রেমের সাধনা পূর্ণ হলেই যোগীর স্বরূপ বদলে যাবে। এই প্রেমসাধনা মনুষ্যলোকেই সম্ভব, দিব্যলোকে নয়। প্রেমসাধনা পূর্ণ হলে মহাশক্তির সঙ্গে যোগ হয়। কিন্তু এই মহাশক্তি মহাশক্তিরস্বরূপ নয়। মানুষ আরোহক্রমে আপন সাধনবলে মহাশক্তির সহিত তাদাত্ম্য লাভ করে। ইহার পর মহাশক্তিভাবাপন্ন সত্তা এবং মহাপ্রেমসিদ্ধ সত্তায় মিলন ঘটে এবং প্রাকৃত বিশ্বে অনুপ্রবেশ হয়। কিন্তু এই অনুপ্রবেশের পূর্বেই মহাকাশরূপ পরব্রহ্মে প্রবেশ ঘটে। প্রথম স্থিতিতে মহাশক্তিতে মহাপ্রেম সিদ্ধির পূর্বে পরব্রহ্মে প্রবিষ্ট হলে জগতের কার্য নির্বাহ হওয়া সম্ভব হয় না। অতীতে বুদ্ধদেব মহাবোধ পেয়েও নির্বাণে প্রবেশ করেন নি, বুদ্ধত্ব গ্রহণ করেছিলেন। প্রাকৃত জগতে প্রবেশের পূর্বেই প্রকাশরূপ ব্রহ্মে প্রবেশ ঘটে।

এখানে একটা প্রশ্ন উঠা স্বাভাবিক—সাক্ষাৎ মহাশক্তি থেকে মহাপ্রকাশে প্রবেশ ঘটলে সত্তার পুনরুন্মেষ কি সম্ভব? উত্তরে বলা যায়, ওখানে অনন্তকালের জন্য বিলয় অবশ্যম্ভাবী—মহাশক্তি অবস্থায় পূর্ণ ঐশ্বর্য থাকা সত্ত্বেও মহাপ্রকাশের সাম্য থাকে না, এজন্য স্বাতন্ত্র্যও থাকে না। এই কারণে পরব্রহ্মে নিমগ্ন হলে পুনরুদ্ধার সম্ভব হয় না। কিন্তু মহাপ্রেমাবস্থা সিদ্ধ হলে মহাপ্রকাশের সঙ্গে সাম্য আসে। সাম্যে আসলে লীন হবার ভয় থাকে না। ছোট আর বড়তে সম্বন্ধ হলে বড় ছোটকে গ্রাস করে। কিন্তু দুই সমান সমান হলে গ্রাসের সম্ভাবনা থাকে না—দুই মিলে এক হয়ে যায়—স্বাতন্ত্র্য থাকার দরুণ তাদের পক্ষে আলাদা হওয়াও সম্ভব। সিদ্ধগণ মহাপ্রকাশের পরিচয় জানেন, স্বরূপকে বোধ করতে পারেন কিন্তু তাঁহাতে প্রবেশ করেন না কেননা প্রবেশ করলে লীন হয়ে যাবেন।

সিদ্ধমণ্ডলীতে ঐশ্বর্যের প্রাচুর্য আছে কিন্তু অভাব আছে প্রেমের। এইজন্য তাঁহারা পিছন থেকে সাহায্য করতে পারেন, সামনে কিছু করতে পারেন না। প্রেমসিদ্ধির পর মহাপ্রকাশে প্রবেশ করতে হয়, তারপর প্রকৃত তত্ত্বে প্রবেশ করে' অন্তিম তত্ত্ব অর্থাৎ নিম্নতম ভূমি পর্যন্ত পেঁছাতে হয়। এর পর স্বাতন্ত্র্য শক্তির উন্মীলন ঘটে এবং জগতে মহাপ্রেমের পূর্ণ বিকাশের পথ উন্মুক্ত হয়। এই সময় কালরাজ্য ক্রমশ গুরুরাজ্যের অন্তর্গত হয়।

কালরাজ্য পূর্ণভাবে নিবৃত্ত হলে গুরুরাজ্যের প্রয়োজন থাকে না, কেননা গুরুর কাজই হচ্ছে কাল থেকে রক্ষা করা। তখন একমাত্র আত্মাই অখণ্ড। অনন্ত, আনন্দরূপে অনন্ত বিচিত্রময় স্বরূপে নিজেই নিজের সঙ্গে লীলা করে—তখন একও থাকে আবার অনন্ত বিশেষময় বহুও থাকে কিন্তু দুইয়ে কোন প্রকার ভেদ থাকে না। কালসংকর্ষিণী শক্তির ক্রিয়া পূর্ণ হয়ে গেলে কাল তো থাকেই না, অবিদ্যা এবং মায়াও থাকে না কিন্তু লীলারূপে সবই থাকে। ইহারই পূর্ণ অদ্বৈত স্বরূপ—পূর্ণব্রহ্মরূপী আত্মার আপন স্বরূপ--অনন্ত প্রকারে আনন্দময় লীলা করে, আবার কালাতীত নিত্য সাক্ষীরূপে প্রতিষ্ঠিত থাকে। ঐ সময় প্রাকৃত জগতের কিছুই থাকে না অথচ সব থাকে। এই মহাযোগকে অখণ্ড বলা হয় এইজন্য যে ইহা খণ্ডিত নয়। প্রত্যেক বস্তুর অভেদত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়—কিন্তু আপন স্বরূপ নষ্ট হয় না। ত্রিকাল থাকে না—একমাত্র নিত্য বর্তমান থাকে। সুতরাং কালকৃত পরিণামও থাকে না।

অবতার এবং বিশ্বকল্যাণ

সাধারণত ভারতবর্ষে যে অবতারবাদ মানা হয় তার বীজ শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌-গীতার চতুর্থ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের নিম্নলিখিত বাক্য বা বাণীতে নিহিত আছেঃ

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

বিশ্বকল্যাণের জন্য ভগবৎসত্তার অবতরণ বিষয়ে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিভিন্ন প্রকারের প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। স্পষ্টরূপে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণের সব বিষয়ের বিবরণ স্বল্প পরিসরে দেওয়া সম্ভব নয়।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের দৃষ্টি অনুসারে (এই দৃষ্টির সঙ্গে সাম্প্রদায়িক অথবা অসাম্প্রদায়িক বিষয়ের বিরোধ নেই) পরমাত্মারই অবতার হয়, যিনি মায়ার অধিষ্ঠাতা। পরমাত্মার সঙ্গে চিৎশক্তি তথা মায়াশক্তি দুইয়েরই সম্বন্ধ কিন্তু চিৎশক্তিতে হ্লাদিনীভাবের প্রাধান্য নেই। চিৎশক্তি তটস্থ হওয়ার জন্য নিরন্তর জীবের আবির্ভাব হয়। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা উচিত মায়াশক্তির অধিষ্ঠাতাও পরমাত্মা। তাঁর থেকেই নিরন্তর প্রাকৃত জগতের উপাদানের সৃষ্টি হয়। জীব উভয় ক্ষেত্রেই পরমাত্মার অংশরূপী। পরমাত্মা দ্বারা অধিষ্ঠিত মায়া থেকে জীবের আবির্ভাব, এইজন্য জীবকে ভিন্নাংশ বলা হয়। কিন্তু পরমাত্মার স্বাংশরূপে অবতরণ হওয়া সম্ভব। মায়ার প্রভাব না থাকলেই

এই স্বাংশকে অবতার মানা যায়। এই নরদেহধারী অবতার—অংশরূপে অথবা পূর্ণরূপে পরমাত্মারই স্বরূপ। সাধারণত পূর্ণরূপে অবতার হয় না, কিন্তু হওয়া সম্ভব। অবতার বিশ্বকল্যাণ তথা ধর্মসংস্থাপন করেন। ধর্মরক্ষার দ্বারা জীবের যে কল্যাণ হয় তাহা তৎকালের জন্য, কেননা এ থেকে জীবের স্বরূপের কোনপ্রকার উৎকর্ষ হয় না—জীবের অন্তঃপ্রকৃতি দন্ড পেলেও শুদ্ধ হয় না এবং এই দন্ডপ্রাপ্তিও সাময়িক। ইহা প্রায়ই কর্মজগতের বিষয়।

জীবও ব্রহ্মজ্ঞানী হয়ে জীবন্মুক্ত অবস্থায় ব্রহ্মজ্ঞান উপদেশ করেন। জীবন্মুক্ত পুরুষ ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারের ফলে অপরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্ত হয়ে তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ দ্বারা জগৎকল্যাণ করতে পারেন। কিন্তু জীবন্মুক্ত অবস্থায় অবিদ্যার লেশ থাকে। জাতি, আয়ু আর ভোগরূপে প্রারব্ধ কর্মের ফল জীবন্মুক্তকেও ভোগ করতে হয়। জীবন্মুক্তের শক্তি সীমিত। তাঁর বিশ্বকল্যাণও তদনুরূপ সীমিত। সমগ্র বিশ্বের কল্যাণ তাঁর দ্বারা সম্ভব নয়। তাছাড়া জীবন্মুক্তের সামর্থ্যও পরিচ্ছিন্ন। নিত্যসিদ্ধমন্ডলে বিরাজমান সিদ্ধপুরুষও বিশ্বকল্যাণ করতে পারেন, কিন্তু আংশিকরূপে। এইজন্য সাধারণ দৃষ্টিতে ঐশ্বরিক শক্তিতেও ব্যাপক কল্যাণ হয় না—যা কিছু হয় তা সেই সেই কাল এবং সেই সেই দেশের জন্য।

ভক্তিমার্গে ভাগ্যবান উচ্চাধিকারী পরমভক্ত প্রেমভক্তি লাভ করেন এবং ভগবানের নিত্যরাসে প্রবেশ করেন কিন্তু তাঁর দ্বারাও সমগ্র বিশ্বের ব্যাপক কল্যাণ হয় না। সিদ্ধমন্ডলী আপন-আপন অধিকার এবং জগতের স্থিতি অনুসারে যথাসম্ভব জগতের সেবা করেন। সমগ্র জগতের ব্যাপক কল্যাণ-সাধন তাঁহাদের সাধ্যাতীত। কেননা ব্যাপক কল্যাণ কাল অথবা বিশ্বমায়ার নিবৃত্তি না হওয়া পর্যন্ত সম্ভব নয়। বৌদ্ধধর্মের প্রাচীন মতে (হীনযান) ব্যক্তিগত নির্বাণই লক্ষ্য ছিল—ব্যাপক বিশ্বকল্যাণ তাঁদের কল্পনার বাইরে ছিল। শ্রাবকরূপী সাধক পুদ্গল, নৈরাত্ম্যসাধন করে নির্বাণের অভিমুখে চলত। উহাদের করুণা এবং সামর্থ্য দুইই পরিচ্ছিন্ন ছিল। শুধু শ্রাবকদের কথা কেন, প্রত্যেক বুদ্ধই বিশ্বকল্যাণের যোগ্য ছিলেন না। মহাযান প্রস্থানে জীবসেবার আদর্শ উন্নত হয়—জ্ঞানের আদর্শও উন্নত হয়, কেননা শ্রুতচিন্তা-ভাবনাত্মক-জ্ঞান ভূমি-প্রবিষ্ট-জ্ঞানরূপে পরিণত হয়। শ্রাবক পরার্থ জীবনে উৎসর্গীকৃত বোধিসত্ত্বরূপে পরিণত হন—জীবনের উদ্দেশ্যই পরার্থ হয়। বিশ্বহিতের আদর্শ অনেক উপরে উঠে যায়। নির্বাণ থেকেও বুদ্ধত্বের আদর্শ অধিকতর শ্রদ্ধার সঙ্গে গৃহীত হয়। এইপ্রকারে বোধিসত্ত্বের আদর্শ বড় হয়, কিন্তু পরাকাষ্ঠা পর্যন্ত যেতে অসমর্থ হয়। পারমিতামার্গে প্রজ্ঞালাভ সম্ভব হয়। এই প্রজ্ঞাই ভগবত্তা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মহাবোধিরূপে পরিণত হয়।

অতএব বুদ্ধ ভগবানের আদর্শ হল—বোধি আর ভগবত্তা দুইয়ের একত্র সমাবেশ। কেবলমাত্র বোধ হলে ভগবত্তা তথা মহাশক্তির সম্বন্ধ থাকে না, আর কেবল ভগবত্তা লাভ হলে বোধির উদয় অনিশ্চিত থাকে। এজন্য একাধারে বোধি এবং ভগবত্তা দুইয়ের মিলন—জ্ঞান এবং ঐশ্বর্যের—দুইয়ের সামঞ্জস্যের সম্বন্ধ আবশ্যক। শৈবাগম এবং শাক্তাগমে যেমন পূর্ণত্বলাভের জন্য শিবশক্তির সামরস্য মানা হয় ঠিক সেইরূপ বুঝতে হবে। কিন্তু বোধিসত্ত্বের দশম ভূমিতে বুদ্ধত্ব লাভ করে জীবসেবায় প্রবৃত্ত হন। বোধিসত্ত্ব অসংখ্য, বুদ্ধও অনন্ত। তাঁহারা অনাদিকাল থেকে প্রযত্নশীল, কিন্তু বিশ্বকল্যাণ কোথায়?

বেদান্তেও সর্বমুক্তির কল্পনা কোথাও কোথাও দেখা যায়। কিন্তু যাকে পরামুক্তি বলা যায়—যেখানে একই সঙ্গে একক মুক্তি এবং সর্বমুক্তি দুইই সম্পন্ন হয়—সেই আদর্শ কার্যরূপে পরিণত হবার পথ দেখা যায় না অথবা দিক্‌দর্শন মেলে না। এজন্য কোন কোন আচার্যের দৃষ্টি ঈশ্বরসাযুজ্যের লক্ষ্যে নিবদ্ধ থাকে। এ সমস্তই অধিকারী পুরুষদের জল্পনা-কল্পনা—তাঁদের পরস্পরের মধ্যে মতভেদ এবং দৃষ্টিগত ভেদও আছে।

কোন কোন মহাত্মা বলেন বা কল্পনা করেন যতদিন ঠিক ঠিক অবতরণ না হচ্ছে ততদিন এ পথে প্রগতির সম্ভাবনা নেই। এখানে অবতরণের তাৎপর্য অনুলোম তথা বিলোমগতির পূর্ণতাপূর্বক সমন্বয়। কেবল অনুলোমগতিতে বিশ্বকল্যাণ সম্ভব নয়—অনুলোমগতিতে আত্মার মায়িক আবরণ ধীরে ধীরে খুলে যায় এবং শেষে ব্রহ্মস্বরূপে প্রবিষ্ট হয়ে তাদাত্ম্যলাভ হয়। পরন্তু ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্ত হবার পর যতদিন ব্রহ্মস্বভাব নিয়ে মূল পর্যন্ত অবতরণ না ঘটে ততদিন নিম্নভূমির হিতসাধন কেমন করে সম্ভব—ইহাই প্রশ্ন। লক্ষ্যস্থলে পৌঁছবার পর যদি ফেরবার বা বহির্গমনের প্রশ্নই না থাকে, তাহলে ঐ পরিস্থিতিতে জগৎকল্যাণ কি করে হবে? লক্ষ্যস্থলে প্রবেশ এবং সেখান থেকে ফেরবার সামর্থ্য দুইই থাকা উচিত। এজন্য লক্ষ্যশোধন আবশ্যক। অর্থাৎ লক্ষ্যে পৌঁছে, লক্ষ্যের শক্তিসম্পন্ন হয়ে শক্তিযুক্তাবস্থায় ক্রমশ অধোভূমি পর্যন্ত অবতরণ।

অতি প্রাচীনকালে এই রহস্যের জ্ঞান কোন কোন মহানুভবের ছিল। এইজন্য ব্রহ্ম, পরমাত্মা, তথা ভগবান, একই মহাসত্তার তিন বিভাগ প্রাপ্তির জন্য জ্ঞান, যোগ তথা ভক্তিমার্গের ধ্যেয়রূপের পরিকল্পনা হয়েছিল। সেই অনুসারে বর্তমান যুগেও কোন কোন মহাপুরুষ ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হয়ে যোগভাব এবং যোগভাব প্রাপ্ত হয়ে ভগবদ্‌ ভাবের সাধনায় তৎপর আছেন। ব্রহ্মভাব থেকে যোগভাব সঞ্চরণের তাৎপর্যজ্ঞানের কার্য সম্পন্ন করে। জ্ঞানদৃষ্টিতে অদ্বৈত

সত্তা সিদ্ধিলাভ করে, যোগমার্গে তাঁহাকেই পরমাত্মারূপে পাওয়া যায়। ব্রহ্ম-ভাবপ্রাপ্ত বিদেহস্থিতিতে আত্মার বাহ্যদেহসম্বন্ধ থাকে না। যদি দেহসম্বন্ধ মানাও যায় তাহলে উহা স্বরূপদেহমাত্র, তান্ত্রিকগণ যাকে শাক্তদেহ বলেন। পরন্তু ইহা শোধিত লক্ষ্যের স্থলেই আছে, অন্যত্র নয়। ওখানে অচিতের কোন সম্বন্ধ নেই—শুদ্ধ চিৎই চিৎ। কিন্তু পরমাত্মভাবে, পরমাত্মা প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা হবার দরুণ উপাসক যোগীর দেহসম্বন্ধ থাকে। ইহাকে একপ্রকার মনোময় দেহ বলা চলে। যোগাবস্থায় আত্মা পরমাত্মার স্বাংশ। যোগের উৎকর্ষ সম্পন্ন হবার সঙ্গে সঙ্গে আত্মাই ক্রমশ পরমাত্মারূপে আত্মপ্রকাশ করে—এই পরমাত্মভাব অভেদে ভেদের স্ফুরণ মনোময় স্তরে। আত্মা পরমাত্মার অংশ হলেও ভিন্নাংশ মানা হয়। যোগের পূর্ণবিকাশ হ'লে আত্মার যোগমার্গে পূর্ণবিকাশ ঘটে এবং আত্মা পরমাত্মারূপে দেখা দেয়। কিন্তু ইহা দেহাধিষ্ঠিত অবস্থা—ব্রহ্মভাবের সদৃশ বিদেহ অবস্থা নয়। ইহা মনোময় রাজ্য পরন্তু ব্রহ্মভূতাত্মা স্বকীয় চিৎশক্তির দ্বারা মনোময় সত্তাকে চিন্ময়রূপে পরিণত করেছেন। ঐ সময় আপন মনও চিন্ময় এবং মনোগম্য বিষয়ও চিন্ময়। ইহা অচিৎ হলেও চিৎশক্তির প্রভাবে চিন্ময় হয়ে যায়। মনের পূর্ণ বিকাশ হ'লে যোগাবস্থা থেকে নির্গমন হয় এবং ভক্তিরাজ্যে প্রবেশ ঘটে। মাতৃগর্ভ থেকে সন্তান যেমন অধোদর দিয়ে বের হয়, ঠিক উহারই বিপরীতক্রমে এখানে যোগী যোগভূমিতে পূর্ণ হয়ে হৃদয়ের উর্দ্ধোদর দিয়ে বের হন। যেমন শিশু মাতৃগর্ভে অবস্থান করে, পুষ্টিলাভ করে এবং গর্ভ থেকে বের হবার যোগ্য হয়, ঠিক সেইরূপ আত্মা যোগাবস্থায় পরমাত্মগর্ভে থেকে বিকাশপ্রাপ্ত হয় এবং সেখান থেকে বের হবার যোগ্যতালাভ করে। ব্রহ্মাবস্থায় একই সত্তা—যে আত্মা সেই ব্রহ্ম। পরমাত্মাবস্থায় সত্তা এক হলেও অংশাংশিভাব থাকে—আত্মা অংশ পরমাত্মা অংশী। যোগাবস্থা থেকে বের হবার পরই আত্মা ব্রহ্মাবস্থায় আবির্ভূত হয়—এই ব্রহ্মাবস্থা ইন্দ্রিয়গোচর দৃশ্য জগতের স্থিতি। আত্মা যোগাবস্থায় পরমাত্মার সঙ্গে যুক্ত থাকে। কিন্তু যোগাবস্থা থেকে বের হবার পর আত্মা ভগবদ্ভূমিতে প্রবিষ্ট হয়। জ্ঞানীর নিকট যে আপন থেকে অভিন্ন ব্রহ্ম ছিল, যোগীর নিকট তিনিই পরমাত্মা—যিনি অভিন্ন নন্, ভিন্নও নন্, আপন অংশিরূপ। যোগভূমি থেকে বের হয়ে ভক্তিরাজ্যে প্রবেশ করলে ভগবদ্রূপ আপন স্বরূপ থেকে ভিন্ন। আত্মা ঐ অবস্থায় জ্ঞানীও নয়, যোগীও নয় কিন্তু ভক্ত। যিনি প্রথমে ব্রহ্ম ছিলেন, তিনি পরে পরমাত্মভাবে প্রকাশমান হন—আবার তিনিই ভগবদ্রূপে প্রকট হন। আত্মা ভক্ত, ভগবান তার উপাস্য। আত্মা ভক্তির আশ্রয় অবলম্বন এবং ভগবান ঐ ভক্তিরই বিষয় অবলম্বন—কিন্তু দুইই নিত্য সম্বন্ধযুক্ত। দুই আলাদা হলেও একে অন্যকে ছেড়ে থাকতে পারে না।

এই অবস্থায় জগতের অচিৎভাব থাকে না, মনোময়ত্বও নয়। চিন্ময়ত্ব তো থাকেই। সঙ্গে সঙ্গে আনন্দময়ত্বও। সে সময় তাঁর নিকট সমগ্র বিশ্বই চিদানন্দময় স্ফুরিত হয়—আপন শরীরও, যা পাঞ্চভৌতিক জড়স্বরূপ ছিল, চিদানন্দময় হয়ে যায়। ঐ সময় দেশকালের বন্ধন থাকে না, কোনপ্রকার নিয়তির শাসনও থাকে না। সবত্র পূর্ণ স্বাতন্ত্র্যময়ের উল্লাস হয়। তাঁর দৃষ্টিতে সমগ্র জগৎ প্রেমময় হয়ে যায়। কিন্তু এ অবস্থায়ও যাঁর প্রাপ্তি তাঁরই থাকে, যা দিব্যস্থূলরূপে প্রকাশমান হয়। তাঁর অভিন্নহৃদয় বন্ধুও তা দেখতে পায় না। কৃপাময়ীর ইচ্ছায় যখন কৃপাপাত্রের দৃষ্টি খুলে যায় তখনই তাঁকে স্থূলরূপে দর্শন করতে পারে। এজন্য সাধন অনাবশ্যক। যতদিন ভক্তির উন্মেষ হয়ে স্থিতি না হচ্ছে ততদিন দর্শন স্থায়ী হয় না। এ অত্যন্ত উচ্চাবস্থা, কিন্তু ইহাতেও বিশ্বকল্যাণ হয় না। কেননা প্রাপ্তি যা ঘটল তা ব্যাপকরূপে স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ এবং তার অতীতকে নিয়ে একজনেরই হ'ল। যার হ'ল তারই হ'ল। অন্যের প্রাপ্তি তার সদৃশরূপে হয় না। অবশ্য তাঁর কৃপায় অন্যের দর্শনাদি হ'তে পারে। এর একমাত্র কারণ ব্রহ্মভাব থেকে ভগবদ্ভাব পর্যন্ত অবতরণমার্গে প্রাপ্তি একজনেরই হয়েছে, অন্যের নয়। কেননা লক্ষ্য শোধনের পরে ব্রহ্মশক্তিরূপে চিৎশক্তি পেয়ে ক্রমশ পরমাত্মভূমি এবং ভগবদ্ভূমিতে উন্নত হয়েছে। পরমাত্মভূমি অর্থাৎ যোগভূমিতে অন্তর্জগৎ তথা মানসজগতে অচিৎভাবকে ত্যাগ করে চিৎভাবকে পায় আর জ্ঞানী আত্মা যোগীরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। তারপরে পরমাত্মভূমি থেকে ভগবদ্ভূমিতে সঞ্চার হবার জন্য সমস্ত ইন্দ্রিয়গোচর স্থূলজগৎ ইন্দ্রিয়রূপী করণবর্গ এবং পাঞ্চভৌতিক দেহ শুধু চিন্ময়মাত্র নয়, চিদানন্দময়রূপে পরিণত হয়। দেশকালের বন্ধন কেটে যায়। নিত্যলীলাভূমিতে নিত্যানন্দের ঢেউ খেলে। সবই হ'ল কিন্তু তাঁর একারই। এ সম্পত্তি তাঁর একার সম্পত্তি। তাঁর কৃপায় অন্যের দর্শন সম্ভব—শুধু একবার নয়—বারে বারে এবং পুনঃ পুনঃ দর্শনের পর দিক্‌কাল স্থিতিও হতে পারে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর নিকট পরকীয়া শক্তিই থেকে যায়। স্বকীয় নয়, কেননা উহা তাঁর আপন বস্তু নয়। যদিও এই অতুল ঐশ্বর্য এবং মাধুর্য তাঁর অনুভবে আসে তবুও তাঁর আপন সম্পত্তি হয় না। এইজন্য সমগ্র বিশ্বের চরম কল্যাণ ইহাতেও পূর্ণ হয় না যতদিন ন্যূনতার পরিহার না করা যায়। এ বিষয়ে কোন কোন মহাপুরুষের সিদ্ধান্ত এই—আত্মার আরোহক্রম শোধিত লক্ষ্য সমাপ্ত হয়ে যাবার পর, অবরোহ তথা অবতরণের প্রথমে সমষ্টিরূপীর সঙ্গে সমষ্টি তথা মহাসমষ্টির সাথে আপন তাদাত্ম্য সম্পন্ন করা আবশ্যক। এই তাদাত্ম্য সম্পন্নতার মূলে আছে প্রেমভাব। এর পরে আত্মার অবতরণ যথাবিধি পূর্ণ হওয়া উচিত অর্থাৎ ভূতত্ত্ব পর্যন্ত হওয়া চাই। এই অবতরণের প্রভাব অত্যন্ত বিশাল। এই অবতরণ পূর্ণ হবার পর যখন স্বাতন্ত্র্যশক্তির

উন্মেষের অবকাশ আসে তখন বিশ্বকল্যাণের পথ উন্মুক্ত হয়। স্বাতন্ত্র্যশক্তির উদ্বোধনক্রম ধীরে হলেও বাস্তবে ক্ষণেই ঘটে। কেননা আরোহণের অন্তে শুদ্ধ লক্ষ্যে স্থিতির সময় সত্ত্বরূপী স্বরূপের অন্তর্ভুক্ত চিৎ এবং আনন্দ অভিব্যক্ত হয়। এরপর ইচ্ছার উন্মেষ হয় এবং জ্ঞানেরও। পরিশেষে ক্রিয়ার উন্মেষ হয় তখন বুঝতে পারা যায় স্বাতন্ত্র্যের উন্মেষ পূর্ণ হয়ে গেছে।

এই অবতরণে মূল আত্মার প্রাপ্তির সঙ্গে বিশ্বের ভিন্ন ভিন্ন আত্মার প্রাপ্তি হয়ে যায়, কারণ ব্যষ্টি আত্মার সমষ্টি অথবা মহাসমষ্টি আত্মার সঙ্গে তাদাত্ম্য ঘটেছে। ইহাতে একের প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে সবারই প্রাপ্তি বুঝতে হবে। কিন্তু প্রাপ্তি সব আত্মার হলেও প্রথমে প্রাপ্তির বোধ অবতরণকারী মূল আত্মাতেই হয়। অন্য আত্মাতে একই সঙ্গে প্রাপ্তি তো হয়ে যায়। কিন্তু বোধ ক্রমশ হয়। মূল আত্মার প্রতি অভিমুখ হয়ে থাকলে ধীরে ধীরে বোধ খুলে যায়। এই বোধের পূর্ণ বিকাশ হলে মূল আত্মা থেকে কোন প্রকার ন্যূনতা থাকে না। তখন সর্বত্র এক অখণ্ড আত্মারই স্ফুরণ থাকে। অসংখ্য অনন্ত আত্মা একই আত্মারূপে স্ফুরিত হয়। দেশকালের সর্বপ্রকার আবরণ উন্মুক্ত হয়। জাগতিক পদার্থসমূহের অনন্ত ভেদ নিবৃত্ত হয়ে যায়। অথচ এক অখণ্ড অনন্ত আত্মস্বরূপে সর্বাত্মার অহংবোধ পরিসমাপ্ত হয় এবং জগতের বিচিত্র অনন্ত রূপে প্রকাশমান থাকে। এই বিচিত্র এবং তন্মূলক লীলা তথা আনন্দবিলাস থাকলেও এক অখণ্ড আত্মস্ফূর্তিই সর্বত্র বিদ্যমান থাকে। ইহারই নাম স্বয়ংপ্রকাশ পূর্ণব্রহ্মের নিত্যব্যক্ত আত্মলীলা।

মঃ মঃ গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের বাংলাভাষায়
প্রকাশিত পুস্তকের তালিকা ঃ—

১। পত্রাবলী (১ম ভাগ)
২। তান্ত্রিক সাধনা ও সিদ্ধান্ত (১ম ও ২য় খণ্ড)
৩। শ্রীকৃষ্ণপ্রসঙ্গ
৪। সাধুসঙ্গ ও সৎপ্রসঙ্গ (১ম ও ২য় ভাগ)
৫। সাহিত্যচিন্তা
৬। ভারতীয় সাধনার ধারা
৭। তন্ত্র ও আগম শাস্ত্রের দিগ্দর্শন
৮। বিশুদ্ধানন্দ প্রসঙ্গ (চার খণ্ড)
৯। বিশুদ্ধ বাক্যামৃত
১০। পূজা
১১। স্বসংবেদন (১ম ও ২য় খণ্ড)
১২। বিজিজ্ঞাসা
১৩। মৃত্যুবিজ্ঞান ও কর্মরহস্য